

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি
দাখিল
নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ব্রহ্মচৰ্য সরকার

তারিক মনজুর

রাফিত আলম মিশু

মোঃ মাইনুল ইসলাম

বিষ্ণু কুমার অধিকারী

মোঃ জয়নাল আবেদীন

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলো আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসম্বৃদ্ধি ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়গুলো সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের নবম ও দশম শ্রেণির জন্য 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বইটি নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অংশে ভাষার উপাদান ও গঠনের বর্ণনা ছাড়াও চেষ্টা করা হয়েছে বাংলা ব্যাকরণের অতি সাম্প্রতিক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর। নির্মিতি অংশ প্রমিত বাংলায় সৃজনশীলতার চর্চা এবং কার্যকর দৈনন্দিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে রচিত হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি, 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বইটি শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

পাঠ্যবই যাতে জ্বরদণ্ডিমূলক ও গ্রাহিক অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দশীল হয়ে উঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বালানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বালানৱাচি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলজটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রাটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পরিচেদ ১	: ভাষা ও বাংলা ভাষা	১
পরিচেদ ২	: বাংলা বাকবরণ	৩
পরিচেদ ৩	: বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন	৫
পরিচেদ ৪	: বাগধার্য	৯
পরিচেদ ৫	: ক্রনি ও বর্ণ	১২
পরিচেদ ৬	: স্বরধ্বনি	১৫
পরিচেদ ৭	: ব্যঙ্গনধ্বনি	১৮
পরিচেদ ৮	: বর্ণের উচ্চারণ	২০
পরিচেদ ৯	: শব্দ ও পদের গঠন	২৬
পরিচেদ ১০	: উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন	২৯
পরিচেদ ১১	: প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন	৩২
পরিচেদ ১২	: সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন	৩৭
পরিচেদ ১৩	: সঙ্কি	৪১
পরিচেদ ১৪	: শব্দস্থিতি	৪৪
পরিচেদ ১৫	: নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ	৪৬
পরিচেদ ১৬	: সংখ্যাবাচক শব্দ	৪৮
পরিচেদ ১৭	: শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৫১
পরিচেদ ১৮	: বিশেষ্য	৫৩
পরিচেদ ১৯	: সর্বনাম	৫৫
পরিচেদ ২০	: বিশেষণ	৫৭
পরিচেদ ২১	: ক্রিয়া	৫৯
পরিচেদ ২২	: ক্রিয়াবিশেষণ	৬২
পরিচেদ ২৩	: অনুসর্গ	৬৪
পরিচেদ ২৪	: ঘোজক	৬৬
পরিচেদ ২৫	: আবেগ	৬৮
পরিচেদ ২৬	: নির্দেশক	৭০
পরিচেদ ২৭	: বচন	৭২
পরিচেদ ২৮	: বিভক্তি	৭৪
পরিচেদ ২৯	: ক্রিয়াবিভক্তি	৭৬
পরিচেদ ৩০	: ক্রিয়ার কাল	৭৯
পরিচেদ ৩১	: বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ	৮৩
পরিচেদ ৩২	: বাক্যের বর্ণ	৮৬
পরিচেদ ৩৩	: উদ্দেশ্য ও বিধেয়	৮৮
পরিচেদ ৩৪	: সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য	৯০
পরিচেদ ৩৫	: কারক	৯৫
পরিচেদ ৩৬	: বাচা	৯৮
পরিচেদ ৩৭	: উকি	১০১
পরিচেদ ৩৮	: যতিচিহ্ন	১০৩
পরিচেদ ৩৯	: বাগধার্য	১০৬
পরিচেদ ৪০	: বাগধারা	১০৯
পরিচেদ ৪১	: প্রতিশব্দ	১১৪
পরিচেদ ৪২	: বিপরীত শব্দ	১১৮
পরিচেদ ৪৩	: শব্দজোড়	১২১

পরিচেদ ৪৪	: অনুচ্ছেদ	১২৬
	: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	১২৬
	: বিশ্ববিদ্যালয়	১২৭
	: বৈশাখী মেলা	১২৭
	: বইমেলা	১২৮
	: জানুয়ার	১২৮
	: সুন্দরবন	১২৯
	: বেলগাড়ি	১২৯
	: ধ্বনিনতা দিবস	১২৯
	: জাতীয় পতাকা	১৩০
	: জাতীয় সংগীত	১৩০
	: কম্পিউটার	১৩১
	: মোবাইল ফোন	১৩১
	: পদ্মা নদী	১৩২
	: জন্মদিনের সঞ্চা	১৩২
পরিচেদ ৪৫	: সারাংশ ও সারমর্ম	১৩৩
	: সারাংশ	১৩৩
	: সারমর্ম	১৩৭
পরিচেদ ৪৬	: ভা-ব-সম্প্রসারণ	১৪২
পরিচেদ ৪৭	: চিটিপত্র	১৫২
	: ব্যক্তিগত পত্র	১৫২
	: আনন্দপত্র	১৫৭
	: সহবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি	১৫৯
	: মালপত্র	১৬২
	: আবেদনপত্র	১৬৪
	: ব্যাবসায়িক পত্র	১৬৮
পরিচেদ ৪৮	: সংবাদ প্রতিবেদন	১৭০
পরিচেদ ৪৯	: প্রবন্ধ	১৭৪
	: বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প	১৭৪
	: বাংলাদেশের উৎসব	১৭৭
	: জগনীশচন্দ্র বন্দু	১৮১
	: রোকেয়া সাখা ওয়াত হোসেন	১৮২
	: লঞ্চ ভূমণের অভিজ্ঞতা	১৮৪
	: একটি কাড়ের রাত	১৮৬
	: কৃষি উদ্যোগ	১৮৮
	: ভাষা আন্দোলন	১৯০
	: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৯৩
	: সময়ানুবর্তিতা	১৯৭
	: ত্রিকেটে বাংলাদেশ	১৯৯
	: বাংলাদেশের ফুটবল	২০১
	: কৃষিকাজে বিজ্ঞান	২০৪
	: মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার	২০৬
	: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	২০৯
	: বিশ্বকোষ	২১১

পরিচ্ছেদ ১

ভাষা ও বাংলা ভাষা

ভাষা

গলনালি, মুখবিবর, কষ্ট, জিভ, তালু, দাঁত, নাক প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ নানা রকম ধ্বনি তৈরি করে। এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয় শব্দ। শব্দের গুচ্ছ দিয়ে বাক্য গঠিত হয়। বাক্য দিয়ে মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদান করে। মনের ভাব প্রকাশক এসব বাক্যের সমষ্টিকে বলে ভাষা।

ভাষা একদিকে মুখে বলার এবং অন্যদিকে কানে শোনার বিষয়। সভ্যতার অগ্রগতিতে মুখের ভাষা ক্রমে লেখার ও ছাপার, সেইসঙ্গে চোখ দিয়ে পড়ার বিষয়েও পরিণত হয়েছে। এছাড়া দৃষ্টি-শক্তিহীনদের জন্য ভাষাকে উচ্চনিচু করে তৈরি করার ও হাত দিয়ে অনুভব করার ব্রেইল পদ্ধতি, আবার বাক্-শক্তিহীনদের বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইশারা ভাষা মানুষ তৈরি করেছে। তবে সাধারণভাবে ভাষা বলতে লিখিত ভাষা বোঝায় না, ইশারা ভাষাও নয়। মুখে উচ্চারিত রূপই ভাষার প্রধান রূপ।

জনগোষ্ঠী ভেদে ভাষার বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়, ভাষাও আলাদা হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা এভাবেই আলাদা ভাষা হিসেবে বিদ্যমান আছে। বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ইংরেজি, হিন্দি, হিঙ্গানি, আরবি, বাংলা, পতুঁগিজ, কুশ, জাপানি, জার্মান, কোরিয়ান, ফরাসি, তামিল, তুর্কি, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি।

বাংলা ভাষা

বাংলালি জনগোষ্ঠী যে ভাষা দিয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ। এর মধ্যে বাংলাদেশে ষোলো কোটি এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দশ কোটি মানুষের বাস। এছাড়া ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রায় তিন কোটি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো প্রায় এক কোটি বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে। মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা।

পৃথিবীর ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয়, চীন-তিব্বতীয়, আফ্রিকীয়, সেমীয়-হেমীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো-এশীয় প্রভৃতি ভাষা-পরিবারে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, হিঙ্গানি, কুশ, পতুঁগিজ, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সিংহলি প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলা ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের সদস্য। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় অহমিয়া ও ওড়িয়া। ফ্রান্সি ভাষা সংস্কৃত এবং পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের আদি ভাষা বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে। এই বিবর্তনে যেসব শুরুত্তপূর্ণ তর বাংলা ভাষাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, সেগুলো হলো: ইন্দো-ইউরোপীয় → ইন্দো-ইরানীয় → ভারতীয় আর্য → প্রাকৃত → বাংলা। আনুমানিক এক হাজার বছর আগে পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নির্দশন 'চর্যাপদ'।

বাংলা ভাষার রয়েছে কালগত ও স্থানগত স্থান্ত্র্য। এক হাজার বছর আগেকার ভাষা, পাঁচশো বছর আগেকার ভাষা, এমনকি উনিশ শতকে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে বর্তমান কালের ভাষা আলাদা। আবার ভৌগোলিক এলাকাভেদে বাংলা ভাষার নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ভাষার এই আঘংলিক বৈচিত্র্যকে বলা হয় উপভাষা।

বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি রয়েছে। এই লিপির নাম বাংলা লিপি। বাংলা লিপিতে মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি – স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঙ্গনবর্ণ ৩৯টি।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উপমহাদেশে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়। ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব-ভারতীয় শাখা দশম শতক নাগাদ কুটিল লিপি নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা লিপি এই কুটিল লিপির বিবর্তিত রূপ। অহমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি প্রভৃতি ভাষাও বাংলা লিপিতে লেখা হয়। সংক্ষত এবং মৈথিলি ভাষা লিখতে এক সময়ে অন্য লিপির পাশাপাশি বাংলা লিপিও ব্যবহৃত হতো।

বাংলাদেশের জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিধয়টি সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক। এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাঙুরিক ভাষা বাংলা।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. বর্ণের সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সম্পর্ক আছে?

ক. চোখ খ. কান গ. নাক ঘ. জিভ

২. ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে –

ক. শব্দ-শক্তিহীনরা খ. দৃষ্টি-শক্তিহীনরা গ. মানসিক-শক্তিহীনরা ঘ. শারীরিক-শক্তিহীনরা

৩. বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় –

ক. ১৫ কোটি লোক খ. ২০ কোটি লোক গ. ২৫ কোটি লোক ঘ. ৩০ কোটি লোক

৪. মাতৃভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর কততম ভাষা?

ক. ৪৬ খ. ৫৮ গ. ৬৪ ঘ. ৭৮

৫. নিচের কোনটি ভাষা-পরিবারের নাম নয়?

ক. ইন্দো-ইউরোপীয় খ. আফ্রিকীয় গ. দ্রাবিড়ীয় ঘ. ইন্দো-ইরানীয়

৬. প্রচলিত ভাষা হিসেবে শীকৃত -

ক. সংস্কৃত ও পালি খ. অহমিয়া ও ওড়িয়া গ. নেপালি ও সিংহলি ঘ. হিন্দি ও উর্দু

৭. নিচের কোনটি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?

ক. কেন্দ্রম খ. সংস্কৃত গ. পূর্ব ভারতীয় প্রাক্ত ঘ. দ্রাবিড়ীয়

৮. বাংলা ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায় –

ক. মহাভারতে খ. চর্যাপদে গ. বৈষ্ণব পদাবলিতে ঘ. মঙ্গলকাব্যে

৯. বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি?

ক. ব্রাহ্মী খ. মণিপুরি গ. বাংলা ঘ. কুটিল

১০. ভারতের কোন প্রদেশের অন্যতম দাঙুরিক ভাষা বাংলা?

ক. কেরালা খ. ওড়িশা গ. ত্রিপুরা ঘ. হরিয়ানা

পরিচ্ছেদ ২

বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার মধ্যকার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা ব্যাকরণের কাজ। ব্যাকরণসমূহে এসব বৈশিষ্ট্যকে সূচের আকারে সাজানো হয়ে থাকে।

যে বিদ্যাশাখায় বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয় তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে পত্রুগিজ ভাষায়। এর লেখক ছিলেন মানোএল দা আসসুম্পসাউ। তাঁর বাংলা-পত্রুগিজ অভিধানের ভূমিকা অংশ হিসেবে তিনি এটি রচনা করেন। এরপর ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত ইংরেজি ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ একটি বাংলা ব্যাকরণ। বইটির নাম ‘এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’। ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরি এবং ১৮২৬ সালে রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের ‘গোড়ীয় ব্যাকরণ’ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

ভাষা হলো বাক্যের সমষ্টি। বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে। আবার শব্দ তৈরি হয় ধ্বনি দিয়ে। এদিক থেকে ভাষার শুন্দরতম উপাদান হলো ধ্বনি। এই ধ্বনি, শব্দ, বাক্য – প্রত্যেকটি অংশই ব্যাকরণের আলোচ্য। এছাড়া শব্দের ও বাক্যের বহু ধরনের অর্থ হয়। সেসব অর্থ নিয়েও ব্যাকরণে আলোচনা করা হয়। ব্যাকরণের এসব আলোচ্য বিষয় বিভক্ত হয় অন্তত চারটি ভাগে, যথা – ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ধ্বনি। লিখিত ভাষায় ধ্বনিকে যেহেতু বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তাই বর্ণমালা সংক্রান্ত আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বাগ্যত্ব, বাগ্যত্বের উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও বাঞ্ছনধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল প্রভৃতি।

রূপতত্ত্ব

রূপতত্ত্বে শব্দ ও তার উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় বিশেষ্য, সর্বলাম, বিশেষণ, ত্রিমা, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি ছান পায়। বিশেষ গুরুত্ব পায় শব্দগঠন প্রক্রিয়া।

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যতত্ত্বে বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাক্যের নির্মাণ এবং এর গঠন বাক্যতত্ত্বের মূল আলোচ্য। বাক্যের মধ্যে পদ ও বর্গ কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, বাক্যতত্ত্বে তা বর্ণনা করা হয়। এছাড়া এক ধরনের বাক্যকে অন্য ধরনের বাক্যে রূপান্তর, বাক্যের বাচ্য, উক্তি ইত্যাদি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কারক বিশ্লেষণ, বাক্যের যোগ্যতা, বাক্যের উপাদান লোপ, যতিচিহ্ন প্রভৃতি বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে।

অর্থতত্ত্ব

ব্যাকরণের যে অংশে শব্দ, বর্গ ও বাক্যের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেই অংশের নাম অর্থতত্ত্ব। একে বাগর্থতত্ত্বও বলা হয়। বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড়, বাগধারা প্রভৃতি বিষয় অর্থতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া শব্দ, বর্গ ও বাক্যের ব্যञ্জন নিয়েও ব্যাকরণের এই অংশে আলোচনা থাকে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. ভাষার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে -

ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ব্যাকরণ গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. রূপতত্ত্ব

২. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক. ১৫৫৩ খ. ১৭৪৩ গ. ১৭৭৮ ঘ. ১৯৪৮

৩. ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে?

ক. উইলিয়াম কেরি খ. রামমোহন রায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

৪. 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর রচয়িতা কে?

ক. দীশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. রামমোহন রায়

৫. ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান -

ক. ধ্বনি খ. অক্ষর গ. শব্দ ঘ. বাক্য

৬. 'বাগ্যস্ত্র' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব

৭. শব্দের অর্থ ও অর্থবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে -

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব

৮. নিচের কোনটি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?

ক. শব্দগঠন খ. প্রতিশব্দ গ. অক্ষর ঘ. কারক

৯. বাচ্য ও উক্তি ব্যাকরণের কোন শাখায় আলোচিত হয়?

ক. অর্থতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব

১০. শব্দগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয় -

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব

পরিচ্ছেদ ৩

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

অধিকাংশ ভাষায় অন্তত দুটি রীতি থাকে: ১. কথ্য ভাষা রীতি ও ২. লেখ্য ভাষা রীতি। বাংলা ভাষায় এসব রীতির একাধিক বিভাজন রয়েছে। যেমন কথ্য ভাষা রীতির মধ্যে রয়েছে মান্য বা প্রমিত কথ্য রীতি ও আঞ্চলিক কথ্য রীতি। আবার লেখ্য ভাষা রীতির মধ্যে রয়েছে প্রমিত রীতি, সাধু রীতি ও কাব্য রীতি। একে একে এসব রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. কথ্য ভাষা রীতি

কথ্য ভাষা রীতি ভাষার মূল রূপ। কথ্য ভাষা রীতির উপরে ভিত্তি করে লেখ্য ভাষা রীতির রূপ তৈরি হয়। ইন ও কালভেদে ভাষার যে পরিবর্তন ঘটে তা মূলত কথ্য ভাষা রীতির পরিবর্তন। তাই কথ্য ভাষা রীতির পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন ভাষা ও উপভাষার জন্য হয়।

আঞ্চলিক কথ্য রীতি

কথ্য রীতির আঞ্চলিক ভেদ সহজে বোধ যায়। এই আঞ্চলিক ভেদ সাধারণত অঞ্চলের নামে পরিচিতি পায়। যেমন নোয়াখালীর ভাষা, চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভাষা, কিংবা সুন্দরবন অঞ্চলের ভাষা। ভাষার এই আঞ্চলিকতা উপভাষা নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। বাঙালি (বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল), পূর্বি (বাংলাদেশের পূর্ব অঞ্চল, ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক অঞ্চল), বরেন্দ্রি (বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল), কামরূপি (বিহারের পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চল), রাঢ়ি (পশ্চিমবঙ্গ), বাড়খণি (পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল ও বাড়খণের পূর্ব অঞ্চল) প্রভৃতি কয়েকটি উপভাষার নাম।

মান্য বা প্রমিত কথ্য রীতি

মান্য বা প্রমিত কথ্য রীতি হলো শিক্ষিত ও নাগরিক বাঙালি জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক কথ্য ভাষা। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বেতার-টেলিভিশনে প্রচারিত আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে, সংবাদ উপস্থাপনায়, সভা-সেমিনারের আলোচনায় ও কবিতা আবৃত্তিতে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। এই রীতিই বাংলা প্রমিত লেখ্য রীতির ভিত্তি। তবে বক্তব্য সামাজিক অবস্থান, জীবিকা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভেদে মান্য বা প্রমিত কথ্য রীতিতে কমবেশি তফাত থাকে।

২. লেখ্য ভাষা রীতি

লিখিত বাংলা ভাষার আদি নির্দশনের নাম 'চর্যাপদ'। প্রায় এক হাজার বছর আগে লেখ্য বাংলা ভাষার কাব্য রীতিতে এটি রচিত। ব্যবহারিক প্রয়োজনে তামে লেখ্য গদ্য রীতির জন্য হয়। উনিশ শতকের সূচনায় লেখ্য ভাষা রীতি হিসেবে সাধু রীতি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বিশ শতকের সূচনায় সাধু রীতির পাশাপাশি চলিত রীতি জনপ্রিয় হয়।

বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেই চলিত রীতি প্রায় সর্বজনীন প্রমিত রীতি হিসেবে স্থান লাভ করে। বর্তমানে বাংলাভাষীরা অন্তত আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের ফেরে প্রমিত বাংলাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

সাহিত্যিক ভাষা রীতি

সাহিত্যিক ভাষার বাক্যরূপ এবং অর্থ প্রায়ই সাধারণ ভাষা রীতি থেকে আলাদা হয়। কবিতার ভাষায় এ পার্থক্যের পরিমাণ খুবই বেশি। বাংলা কাব্য রীতি আবার দুই ভাগে বিভক্ত: পদ্য কাব্য রীতি ও গদ্য কাব্য রীতি। পদ্য কাব্য রীতিতে সাধারণত ছন্দ এবং মিল থাকে। ফলে তা ভাষার সাধারণ বাক্যগঠন থেকে আলাদা হয়। পদ্য কাব্য রীতি বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো রীতি। বাংলা সাহিত্যের বহু অমর কাব্য এই রীতিতে রচিত। পদ্য কাব্য রীতির পাশাপাশি বাংলা ভাষার গদ্য কাব্য রীতিও রয়েছে। গঠন বিবেচনায় গদ্য কাব্য রীতির বাক্যও সাধারণ বাক্যের চেয়ে আলাদা হয়ে সবচেয়ে আলাদা হয়ে থাকে।

সাধু রীতি

দাঙুরিক কাজ, সাহিত্য রচনা, যোগাযোগ ও ডানাচৰ্চার প্রয়োজনে লেখ্য বাংলা ভাষায় সাধু রীতির জন্ম হয়। উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাধু রীতির বিকাশ ঘটে। প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে এই রীতি বাংলা লেখ্য ভাষার আদর্শ রীতি হিসেবে চালু ছিল।

সাধু রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

- (ক) সাধু রীতিতে ক্রিয়ারূপ দীর্ঘতর, যেমন - 'করা' ক্রিয়ার রূপ: করিতেছে, করিয়াছে, করিল, করিলে, করিলাম, করিত, করিতেছিল, করিয়াছিল, করিব, করিবে, করিতে, করিয়া, করিলে, করিবার।
- (খ) সাধু রীতির বহু সর্বনামে 'হ'-বর্ণ যুক্ত থাকে, যেমন - তাহারা, ইহাদের, যাহা, তাহা, উহা, কেহ ইত্যাদি।
- (গ) সাধু রীতিতে তৎসম শব্দ এবং সাধিত শব্দের প্রাধান্য থাকে।

সাহিত্যে সাধু রীতির উদাহরণ (উনিশ শতক):

মহাসম্মুদ্রের শত বৎসরের কল্পে কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘূমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশুদ্ধের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ ত্বর হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অঙ্গরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিষ্ঠন্তা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অঙ্গরের বেড়া দন্ত করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানববন্দয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দাঙুরিক কাজে সাধু রীতির উদাহরণ (বিশ শতক):

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সন্তান সমন্বয় লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঞ্চকার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ফেরে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের

অভিব্যক্তিস্মরণ এই সংবিধানের প্রাথমিক অঙ্গ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পরিচয় কর্তব্য। (বাংলাদেশের সংবিধান)

প্রমিত রীতি

বিশ শতকের সূচনায় কলকাতার শিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষাকে লেখ্য রীতির আদর্শ হিসেবে চালু করার চেষ্টা হয়। এটি তখন চলিত রীতি নামে পরিচিতি পায়। এই রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গ প্রভৃতি শব্দ হ্রস্ব হয় এবং তৎসম শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত করে। প্রথম দিকে চলিত রীতিতে শুধু সাহিত্য রচিত হতো; দাঙ্গরিক কাজ ও বিদ্যাচর্চা ইত্যাদি হতো সাধু ভাষায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ চলিত রীতি সাধু রীতির জায়গা দখল করে। অন্যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধু রীতিকে সরিয়ে চলিত রীতি মান্য লেখ্য রীতিতে পরিণত হয়। এই চলিত রীতিই তখনে বাংলার প্রমিত রীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রমিত রীতি হলো কোনো ভাষার আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত মান্য রীতি। এজন্য এটি 'মান রীতি' নামেও পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় যাবতীয় দাঙ্গরিক কাজ, বিদ্যাচর্চা, সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের ভাষা হিসেবে প্রমিত রীতি লেখ্য বাংলা ভাষার প্রধান রীতিতে পরিণত হয়েছে।

প্রমিত রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

(ক) প্রমিত রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ হ্রস্বতর।

ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেমন - 'করা' ক্রিয়ার রূপ: করছে, করেছে, করল, করলে, করলাম, করত, করছিল, করেছিল, করব, করবে, করতে, করে, করলে, করার।

সর্বনামের ক্ষেত্রে যেমন - তারা, এদের, যা, তা, ও, কেউ ইত্যাদি।

অনুসর্গের ক্ষেত্রে যেমন - থেকে, হতে, সঙ্গে ইত্যাদি।

(খ) প্রমিত রীতিতে শব্দ ব্যবহার আলোচ্য বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। প্রয়োজন অন্যান্য সব ধরনের শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন তৎসম 'বৎসর'-ও লেখা যায় আবার তত্ত্ব 'বছর'-ও লেখা যায়। একইভাবে 'চন্দ'-ও লেখা যায়, 'ঠাঁদ'-ও লেখা যায়।

(গ) প্রমিত রীতিতে কথ্য রীতির বহু শব্দ বজ্ঞানীয়, যেমন - 'ধূলো, তুলো, মূলো, পুজো, সবচে' ইত্যাদি না লিখে 'ধূলা, তুলা, মূলা, পুজা, সবচেয়ে' ইত্যাদি লিখতে হয়।

পূর্বে উল্লিখিত সাধু রীতির সাহিত্যের উদাহরণ প্রমিত রীতিতে নিম্নরূপ হবে:

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্পে কেউ যদি এমন করে বেঁধে রাখতে পারত যে, সে ঘুমিয়ে পড়া শিশুটির মতো চুপ করে থাকত, তবে সেই নীরব মহাশুদ্রের সঙ্গে লাইক্রেরির তুলনা হতো। এখানে ভাষা চুপ করে আছে, প্রবাহ ছির হয়ে আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অকরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়ে আছে। এরা সহসা যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, নিষ্কৃতা ভেঙে ফেলে, অকরের বেড়া দঞ্চ করে একেবারে বের হয়ে আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইক্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যাকে বেঁধে রেখেছে!

পূর্বে উল্লিখিত সাধু রীতির দাঙ্গরিক উদাহরণ প্রমিত রীতিতে নিম্নরূপ হবে:

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, আমরা যাতে স্থান সন্তান সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি, সেজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিযোগ্যিতারপে এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আগামীর পরিব্রত কর্তব্য।

প্রতিটি বাঙালি শিশুর মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা হলো তার আধিলিক ভাষা। প্রমিত কথ্য বা লেখ্য প্রমিত তার কাছে দ্বিতীয় ভাষা। শিক্ষা কার্যক্রম যেহেতু প্রমিত রীতি অনুসরণ করে, তাই পাঠ্যপুস্তকই হলো শিশুর প্রমিত রীতি শেখার প্রধান উপায়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. বর্তমানে লেখ্য ভাষার আদর্শ রীতিকে বলে -

ক. সাধু রীতি খ. লেখ্য রীতি গ. আধিলিক রীতি ঘ. প্রমিত রীতি

২. বাংলা ভাষায় সাধু গদ্য রীতির সূচনা হয় -

ক. প্রাচীন যুগে খ. মধ্যযুগে গ. উনিশ শতকের শুরুতে ঘ. বিশ শতকের শুরুতে

৩. নিচের কোনটি সাধু রীতির ক্রিয়াপদ?

ক. করিল খ. করেছে গ. করত ঘ. করলাম

৪. সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. ক্রিয়াকৃপ দীর্ঘ খ. বিশেষ্যের আধিক্য
গ. অনুসর্গ হ্রস্তর ঘ. সর্বনাম হ্রস্তর

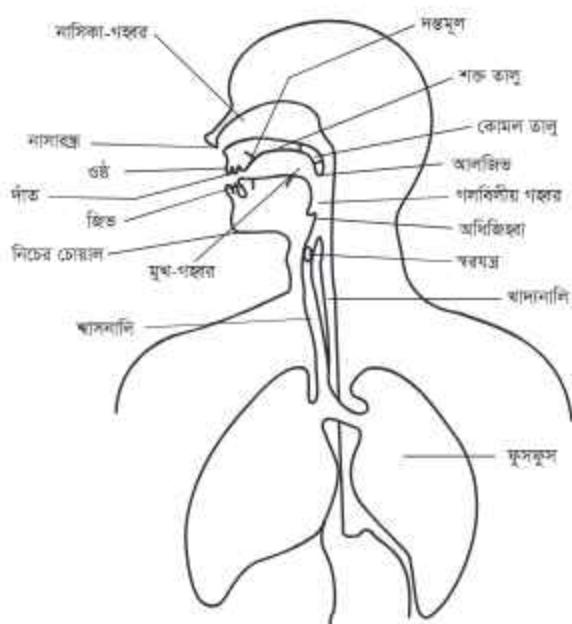
৫. বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে কোন উপভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়?

ক. বরেন্দ্রি খ. রাঢ়ি গ. কামরুপি ঘ. পূর্বি

পরিচেদ ৪

বাগ্যন্ত্র

ধৰনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে, সেগুলোকে একত্রে বাগ্যন্ত্র বলে। মানবদেহের উপরিভাগে অবস্থিত ফুসফুস থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত ধৰনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগ্যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাগ্যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিচের ছবিতে দেখানো হলো এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।



বাগ্যন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ

ফুসফুস

ধৰনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস ফুসফুস। ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। মূলত শ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে ধৰনি উৎপন্ন হয়।

শ্বাসনালি

ফুসফুস থেকে বাতাস শ্বাসনালি হয়ে মুখবিবর ও নাসারক্তি দিয়ে বের হয়ে আসে।

স্বরযন্ত্র

শ্লাসনালির উপরের অংশে স্বরযন্ত্রের অবস্থান। মেরুদণ্ডের ৪, ৫ ও ৬ নং অঙ্গের পাশে থাকা এই অংশটি নলের মতো। বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে বলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অধিজিহ্বা, স্বরক্তু, ধ্বনিদ্বার ইত্যাদি স্বরযন্ত্রের অংশ।

জিভ

মুখগহরের নিচের অংশে জিভের অবস্থান। বাগ্ধযন্ত্রের মধ্যে জিভ সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ। জিভের উচ্চতা অনুযায়ী, সমুখ-পশ্চাত্ অবস্থান অনুযায়ী এবং মুখগহরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জিভের স্পর্শের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনির বৈচিত্র্য তৈরি হয়।

আলজিভ

মুখগহরের কোমল তালুর পিছনে ঝুলত মাংসপিণ্ডের নাম আলজিভ। ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোমল তালুর সঙ্গে আলজিভ নিচে নেমে এলে বাতাস মুখ দিয়ে পুরোপুরি বের না হয়ে থানিকটা নাক দিয়ে বের হয়। এর ফলে নাসিক্য ধ্বনি তৈরি হয়।

তালু

মুখবিবরের ছাদকে বলা হয় তালু। তালুর দুটি অংশ – কোমল তালু ও শক্ত তালু। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে কোমল তালু নিচে নামে। কোমল তালু ও জিভমূলের স্পর্শে কষ্ট্যধ্বনি উচ্চারিত হয়। দন্তমূলের শুরু থেকে কোমল তালু পর্যন্ত বিকৃত অংশকে বলা হয় শক্ততালু।

মূর্ধা

শক্ত তালু ও উপরের পাটির দাঁতের মধ্যবর্তী উভল অংশকে মূর্ধা বলে। কোনো কোনো ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ মূর্ধাকে স্পর্শ করে।

দন্তমূল ও দন্ত

দাঁতের গোড়ার নাম দন্তমূল। উপরের পাটির দন্তমূল ও দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শে বেশ কিছু ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

ওষ্ঠ

বাক্থ্যাঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম ওষ্ঠ বা ঠোঁট। ওষ্ঠের মধ্যকার ফাঁকের কম-বেশির ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে সংবৃত ও বিবৃত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণ করতে ওষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাসিকা

মুখগহ্বরের পাশাপাশি নাসিকা বা নাকের ছিদ্র দিয়ে বাতাস বের হয়েও ধৰনি উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. কোনটি বাগ্যন্ত্র?

- ক. পাকছলী খ. ফুসফুস গ. পিণ্ডকোষ ঘ. যকৃৎ

২. ফুসফুস থেকে তৈরি বাতাস কিসের মাধ্যমে বের হয়?

- ক. নাসারঙ্গ খ. মুখবিবর গ. তালু ঘ. ক ও খ উভয়ই

৩. বাক্ত্বাদের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম -

- ক. তালু খ. মূর্ধা গ. দন্ত ঘ. ওষ্ঠ

৪. বাগ্যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যাস কোনটি?

- ক. দাঁত খ. মূর্ধা গ. দন্তমূল ঘ. জিভ

৫. মুখ-গহ্বরের কোন অংশে তালুর অবস্থান?

- ক. সামনে খ. পিছনে গ. উপরে ঘ. নিচে

৬. নাসিক্য ধৰনি তৈরি হয় কীভাবে?

- ক. আলজিভ নিচে নেমে এলে
 খ. জিভ তালুতে স্পর্শ করলে
 গ. ঠোঁটের ফাঁকা কম-বেশি হলে
 ঘ. জিভ মূর্ধায় স্পর্শ করলে

পরিচ্ছেদ ৫

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি ভাষার শুন্দরতম একক। বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। এই ধ্বনিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি: [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ]; এবং মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি: [প], [ফ], [ব], [ভ], [ত], [থ], [দ], [ধ], [ট], [ঠ], [ড], [চ], [ছ], [জ], [ঝ], [বা], [ক], [খ], [গ], [ঘ], [ম], [ন], [ঙ], [স], [শ], [হ], [ল], [র], [ড়], [চ়]। এখানে তৃতীয় বর্কনী দিয়ে ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে।

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখগহ্বারের কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে। অন্যদিকে যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখের বাইরে বের হওয়ার আগে বাক্প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। এই বর্ণ কালে শোনার বিষয়কে চোখে দেখার বিষয়ে পরিগত করে। ভাষার সবগুলো বর্ণকে একত্রে বলা হয় বর্ণমালা। ধ্বনির বিভাজন অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্বরধ্বনির প্রতীক স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। তবে মূল বর্ণের পাশাপাশি বাংলা বর্ণমালায় রয়েছে নানা ধরনের কারবর্ণ, অনুবর্ণ, যুক্তবর্ণ ও সংখ্যাবর্ণ।

মূল বর্ণগুলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে বিভক্ত।

স্বরবর্ণ: অ আ ই ঈ উ ঊ ঝ এ এ ও ঔ = ১১টি

ব্যঞ্জনবর্ণ:	ক খ গ ঘ ঙ
	চ ছ জ ঝ এঁ
	ট ঠ ড ঢ ণ
	ত থ দ ধ ন
	প ফ ব ত ম
	য র ল
	শ ষ স হ
	ড় ঢ় য় ি
	ঁ :
	= ৩৯টি

কারবর্ণ

স্বরবর্ণের মোট ১০টি সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে, এগুলোর নাম কারবর্ণ: ট, ফী, ল, ল, চ, চৈ, চো, চৌ। কারবর্ণের সঙ্গে ব্যবহার নেই। এগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে বা উভয় দিকে যুক্ত হয়। কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্তিহ না থাকলে ব্যঞ্জনটির সঙ্গে একটি [অ] আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

অনুবর্ণ

ব্যঙ্গনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ।

ফলা: ব্যঙ্গনবর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অন্য ব্যঙ্গনের নিচে অথবা ডান পাশে বুলে থাকে, সেগুলোকে ফলা বলে। যেমন – ন-ফলা (঱), ব-ফলা (ল), ম-ফলা (ঝ), য-ফলা (ঝঁ), র-ফলা (ঢঁ), ল-ফলা (঳)।

রেফ: র-এর একটি অনুবর্ণ রেফ (ঁ)।

বর্ণসংক্ষেপ: যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময়ে বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। এগুলো বর্ণসংক্ষেপ।

যেমন – ঙ, ন, ম, ল, স ইত্যাদি। এছাড়া ৯ বর্ণটি ত-এর একটি বর্ণসংক্ষেপ, যা বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে দ্বীকৃত।

যুক্তবর্ণ

একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। এদিক দিয়ে যুক্তবর্ণ দুই রকম: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।

স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ট, জ্জ, জ্ঞ, ঝঁ, ডড, ট্ট, ঠ্ঠ, দ্দ, দ্ব, দ্ব্ব, ত্ত, ত্ত্ত, স্ট, প্ত, প্প, ক্স, জ্জ, জ্ঞ, দ্ব, শ্ব, ক্ষ, ল্ল, ল্ট, ল্ড, ল্ব, ক্ষ, শ্চ, শ্চ্চ, ট্ট, ফ্ফ, প্প্প, স্ট্ট, ক্ষ্ট ইত্যাদি।

অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ত (ক+ত), ক্ম (ক+ম), ক্র (ক+র), ক্ষ (ক+ষ), ক্ষ্ম (ক+ষ+ম), ক্স (ক+স), গ্গ (গ+উ), ঘ্গ (গ+ধ), ক্ষ্ণ (ঝ+ক), ঙ্ঙ (ঝ+গ), জ্জ (জ+এও), ধ্জ (এও+চ), ঝ্ঝ (এও+ছ), জ্ঞ (এও+জ), ট্ট (ট+ট), ত্ত (ত+ত), থ্থ (ত+থ), ত্ত্ত (ত+র), ও (ণ+ড), দ্ব্ব (দ+ধ), ক্ব (ন+ধ), ক্ব্ব (ভ+র), ক্ষ্ব (ভ+ৰ+উ), ক্ল (ৱ+উ), ক্ল্ল (ৱ+ড), ক্ষ্ল (শ+উ), ষ্ণ (ষ+ণ), হ্ত (হ+উ), হ্ব (হ+ঝ), হ্জ (হ+ন), ক্ষ্জ (হ+ম) ইত্যাদি।

সংখ্যাবর্ণ

বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে। যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক টিক (✓) দাও।

১. বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

ক. ৬ খ. ৭ গ. ১০ ঘ. ১১

২. কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না?

ক. স্বরধ্বনি খ. ব্যঙ্গনবর্ণনি গ. মৌলিকধ্বনি ঘ. যুগ্মধ্বনি

৩. ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় –

ক. শব্দ খ. বাক্য গ. বর্ণ ঘ. ভাষা

৪. ব্যঙ্গনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্তিহ না থাকলে কোন ধরনি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়?

ক. [অ] খ. [আ] গ. [ই] ঘ. [উ]

৫. যে যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি?

ক. এও ও ষ খ. ষ ও এও গ. ষ ও শ ঘ. শ ও ষ

৬. ব্রবর্ণের সংক্ষিঙ্গ রূপকে বলা হয় -

ক. কারবর্ণ খ. অনুবর্ণ গ. ফলা ঘ. রেফ

৭. ব্যঙ্গনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম -

ক. কারবর্ণ খ. অনুবর্ণ গ. ফলা ঘ. রেফ

৮. নিচের কোন জোড়টি যুক্তবর্ণের রূপভেদকে প্রকাশ করে?

ক. স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ খ. কার ও ফলা গ. স্বচ্ছ ও যুক্ত ঘ. অস্বচ্ছ ও উন্মুক্ত

৯. বাংলা কারবর্ণের সংখ্যা -

ক. ৯ খ. ১০ গ. ১১ ঘ. ১২

১০. বাংলা সংখ্যাবর্ণ কয়টি?

ক. ৭ খ. ৮ গ. ১০ ঘ. ১১

পরিচ্ছেদ ৬

স্বরধ্বনি

উচ্চারণের সময়ে জিভের উচ্চতা অনুযায়ী, জিভের সম্মুখ-পশ্চাত্ অবস্থান অনুযায়ী এবং ঠোঁটের উন্মুক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে ভাগ করা হয়। নিচের ছক থেকে স্বরধ্বনির এই উচ্চারণ-বিভাজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে:

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
↓	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাত্	↓
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা	অ		অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

স্বরধ্বনি উচ্চারণের ছক

উচ্চারণের সময়ে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: উচ্চ স্বরধ্বনি [ই], [উ]; উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি [এ], [ও]; নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি [অ্যা], [অ]; নিম্ন স্বরধ্বনি [আ]। উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ উপরে ওঠে; নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ নিচে নামে।

জিভের সম্মুখ-পশ্চাত্ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি তিন ভাগে বিভক্ত: সম্মুখ স্বরধ্বনি [ই], [এ], [অ্যা]; মধ্য স্বরধ্বনি [আ]; পশ্চাত্ স্বরধ্বনি [অ], [ও], [উ]। সম্মুখ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ সামনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়; পশ্চাত্ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ পিছনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্ধাত্ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: সংবৃত [ই], [উ]; অর্ধ-সংবৃত: [এ], [ও]; অর্ধ-বিবৃত: [অ্যা] [অ]; বিবৃত: [আ]। সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে; বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে।

অনুনাসিক স্বরধ্বনি

মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে কোমল তালু আভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে কোমল তালু থানিকটা নিচে নেমে গেলে কিছুটা বায়ু নাক

দিয়েও বের হয়। এর ফলে ধ্বনিগুলো অনুনাসিক হয়ে যায়। স্বরধ্বনির এই অনুনাসিকতা বোঝাতে বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু (‘) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মৌলিক স্বরধ্বনি: [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ]

অনুনাসিক স্বরধ্বনি: [ইঁ], [এঁ], [অ্যঁ], [আঁ], [অঁ], [ওঁ], [উঁ]

অর্ধস্বরধ্বনি

যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি: [ইঁ], [উঁ], [এঁ] এবং [ওঁ]। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না। যেমন -

‘চাই’ শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ইঁ]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [ইঁ] হলো অর্ধস্বরধ্বনি।

একইভাবে ‘লাউ’ শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [উঁ]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [উঁ] হলো অর্ধস্বরধ্বনি।

দ্বিস্বরধ্বনি

পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন - ‘লাউ’ শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উঁ] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ] তৈরি হয়েছে। দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ:

- [আই]: তাই, নাই
- [এই]: সেই, নেই
- [আও]: যাও, দাও
- [আএ]: খায়, যায়
- [উই]: দুই, কুই
- [অএ]: নয়, হয়
- [ওউ]: মৌ, বড়
- [ওই]: কৈ, দই
- [এউ]: কেউ, ঘেউ

বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে, যথা: ঔ এবং ঔঁ। ঔ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ইঁ]। একইভাবে ঔঁ-এর মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ওঁ] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উঁ]।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. উচ্চারণের সময়ে জিভের কোন অবস্থানের কারণে স্বরধ্বনি ভাগ করা হয়?

ক. উচ্চতা খ. সম্মুখ গ. পশ্চাত্ত ঘ. সবগুলোই সঠিক
২. ‘উ’ উচ্চারণের সময়ে জিভের অবস্থান –

ক. উচ্চ-সম্মুখ খ. নিম্ন-সম্মুখ গ. উচ্চ-পশ্চাত্ত ঘ. নিম্ন-পশ্চাত্ত
৩. ‘আ’ উচ্চারণের সময়ে টোটের উন্মুক্তি কেমন?

ক. সংবৃত খ. অর্ধ-সংবৃত গ. বিবৃত ঘ. অর্ধ-বিবৃত
৪. জিভের সম্মুখ বা পশ্চাত্ত অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ
৫. বাংলা স্বরধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয় কী বোঝাতে?

ক. হ্রস্বস্বর খ. দীর্ঘস্বর গ. অনুনামিকতা ঘ. ব্যঞ্জনা
৬. যে সকল স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না তাদের বলে –

ক. হ্রস্বস্বর খ. অর্ধস্বর গ. দীর্ঘস্বর ঘ. পূর্ণস্বর
৭. পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে মিলে হয় –

ক. স্বরধ্বনি খ. মৌলিক স্বরধ্বনি গ. হল্লা স্বরধ্বনি ঘ. দ্বিস্বরধ্বনি
৮. ‘লাউ’ শব্দের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে?

ক. আ+ই খ. আ+ই গ. আ+ এ ঘ. আ+উ

পরিচেদ ৭

ব্যঙ্গনধ্বনি

উচ্চারণের ছান ও প্রকৃতি এবং ধ্বনির কম্পন ও বায়ুপ্রবাহ বিবেচনায় ব্যঙ্গনধ্বনিকে অন্তত চার ধরনে ভাগ করা যায়: ১. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন, ২. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন, ৩. ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন এবং ৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহের মাত্রা অনুযায়ী বিভাজন।

১. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন

বাক্প্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বায়ু বাধা পেয়ে ব্যঙ্গনধ্বনি সৃষ্টি করে সেই জায়গাটি হলো ঐ ব্যঙ্গনের উচ্চারণস্থান। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঙ্গনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়: ১. ওষ্ঠ্য ব্যঙ্গন, ২. দন্ত্য ব্যঙ্গন, ৩. দন্তমূলীয় ব্যঙ্গন, ৪. মূর্ধন্য ব্যঙ্গন, ৫. তালব্য ব্যঙ্গন, ৬. কঠ্য ব্যঙ্গন, ৭. কঠনালীয় ব্যঙ্গন।

ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোন বাক্প্রত্যঙ্গের অংশহণ মুখ্য এবং কোন বাক্প্রত্যঙ্গের অংশহণ গৌণ, নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো:

ধ্বনি	মুখ্য বাক্প্রত্যঙ্গ	গৌণ বাক্প্রত্যঙ্গ
ওষ্ঠ্য ব্যঙ্গন	নিচের ঠোঁট	উপরের ঠোঁট
দন্ত্য ব্যঙ্গন	জিন্ডের ডগা	উপরের পাটির দাঁত
দন্তমূলীয় ব্যঙ্গন	জিন্ডের ডগা	দন্তমূল
মূর্ধন্য ব্যঙ্গন	জিন্ডের ডগা	দন্তমূলের পিছনের উঁচু অংশ (মূর্ধা)
তালব্য ব্যঙ্গন	জিন্ডের সামনের অংশ	শক্ত তালু
কঠ্য ব্যঙ্গন	জিন্ডের পেছনের অংশ	নরম তালু
কঠনালীয় ব্যঙ্গন	ধ্বনিদ্বারের দুটি পালা	ধ্বনিদ্বার

ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা

ওষ্ঠ্য ব্যঙ্গন

যেসব ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ওষ্ঠ্য ব্যঙ্গন বলে। এগুলো দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি নামেও পরিচিত। পাকা, ফল, বাবা, ভাই, মা প্রভৃতি শব্দের প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্য ব্যঙ্গনধ্বনির উদাহরণ।

দন্ত্য ব্যঙ্গন

যেসব ব্যঙ্গনধর্মনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্ত্য ব্যঙ্গন বলে। তাল, খালা, দাদা, ধান প্রভৃতি শব্দের ত, থ, দ, ধ দন্ত্য ব্যঙ্গনধর্মনির উদাহরণ।

দন্তমূলীয় ব্যঙ্গন

যেসব ব্যঙ্গনধর্মনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্তমূলীয় ব্যঙ্গন বলে। নানা, রাত, লাল, সালাম প্রভৃতি শব্দের ন, র, ল, স দন্তমূলীয় ব্যঙ্গনধর্মনির উদাহরণ।

মূর্ধন্য ব্যঙ্গন

দন্তমূল এবং তালুর মাঝখানে যে উচু অংশ থাকে তার নাম মূর্ধা। যেসব ব্যঙ্গনধর্মনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে মূর্ধন্য ব্যঙ্গন বলে। টাকা, ঠেলাগাড়ি, ডাকাত, ঢেল, গাড়ি, মৃচ্ছ প্রভৃতি শব্দের ট, ঠ, ড, চ, ড, চ মূর্ধন্য ব্যঙ্গনধর্মনির উদাহরণ।

তালব্য ব্যঙ্গন

যেসব ব্যঙ্গনধর্মনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঙ্গন বলে। চাচা, ছাগল, জাল, বাড়, শসা প্রভৃতি শব্দের চ, ছ, জ, বা, শ তালব্য ব্যঙ্গনধর্মনির উদাহরণ।

কষ্ট্য ব্যঙ্গন

যেসব ব্যঙ্গনধর্মনি উচ্চারণের সময়ে জিভের পিছনের অংশ উচু হয়ে আলজিভের কাছাকাছি নরম তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে কষ্ট্য ব্যঙ্গন বলে। কাকা, খালু, গাধা, ঘাস, কাঙ্গাল প্রভৃতি শব্দের ক, খ, গ, ঘ, ঙ কষ্ট্য ব্যঙ্গনধর্মনির উদাহরণ।

কষ্টনালীয় ব্যঙ্গন

কষ্টনালীয় ব্যঙ্গন উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বার থেকে বায়ু কষ্টনালি হয়ে সরাসরি বের হয়ে আসে। হাতি শব্দের হ কষ্টনালীয় ব্যঙ্গনধর্মনির উদাহরণ।

২. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঙ্গনধর্মনি উচ্চারণের সময়ে ঠোট, জিভ, জিভমূল ইত্যাদি বাকপ্রত্যন্দের আকৃতিগত পরিবর্তন হয়। এতে বায়ুপথে সৃষ্টি বাধার ধরন আলাদা হয়ে উচ্চারণের প্রকৃতি বদলে যায়। উচ্চারণের এই প্রকৃতি অনুযায়ী

ব্যঙ্গনধ্বনিকে করোকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: স্পৃষ্ট ব্যঙ্গন, নাসিক্য ব্যঙ্গন, উঘ ব্যঙ্গন, পার্শ্বিক ব্যঙ্গন, কম্পিত ব্যঙ্গন, তাড়িত ব্যঙ্গন ইত্যাদি।

স্পৃষ্ট ব্যঙ্গন

যেসব ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্থ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংসর্ষে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঙ্গন বলে। এগুলো স্পর্শ ব্যঙ্গনধ্বনি নামেও পরিচিত। পথ, তল, টক, চৰ, কল শব্দের প, ত, ট, চ, ক স্পৃষ্ট ব্যঙ্গনধ্বনি। উচ্চারণছান অনুযায়ী এগুলোকে ওঠ স্পৃষ্ট, দন্ত স্পৃষ্ট, মূর্ধা স্পৃষ্ট, তালু স্পৃষ্ট এবং কঠ স্পৃষ্ট – এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা –

ওঠ স্পৃষ্ট ব্যঙ্গন: প, ফ, ব, ভ
দন্ত স্পৃষ্ট ব্যঙ্গন: ত, থ, দ, ধ
মূর্ধা স্পৃষ্ট ব্যঙ্গন: ট, ঠ, ড, ঢ
তালু স্পৃষ্ট ব্যঙ্গন: চ, ছ, জ, ঝ
কঠ স্পৃষ্ট ব্যঙ্গন: ক, খ, গ, ঘ

নাসিক্য ব্যঙ্গন

যেসব ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে বাধা পায় এবং নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঙ্গন বলে। মা, নতুন, হাঙর প্রভৃতি শব্দের ম, ন, ঙ নাসিক্য ব্যঙ্গনধ্বনি।

উঘ ব্যঙ্গন

যেসব ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্থ্রত্যঙ্গ কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে উঘ ব্যঙ্গন বলে। সালাম, শসা, হঞ্চার প্রভৃতি শব্দের স, শ, হ উঘ ধ্বনির উদাহরণ। উচ্চারণছান অনুসারে উঘ ব্যঙ্গন ধ্বনিগুলোকে দন্তমূলীয় (স), তালব্য (শ), এবং কঠনমূলীয় (হ) – এই তিনি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোর মধ্যে স এবং শ-কে আলাদাভাবে শিস ধ্বনিও বলা হয়ে থাকে। কারণ স, শ উচ্চারণে শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায় এবং শিসের মতো আওয়াজ হয়।

পার্শ্বিক ব্যঙ্গন

যে ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা দন্তমূল স্পর্শ করে এবং ফুসফুস থেকে আসা বাতাস জিভের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে পার্শ্বিক ব্যঙ্গন বলে। লাল শব্দে ল পার্শ্বিক ব্যঙ্গনধ্বনির উদাহরণ।

কম্পিত ব্যঙ্গন

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ একাধিক বার অতি দ্রুত দন্তমূলকে আঘাত করে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে কম্পিত ব্যঙ্গন বলে। কর, ভার, হার প্রভৃতি শব্দের র কম্পিত ব্যঙ্গনধ্বনির উদাহরণ।

তাড়িত ব্যঙ্গন

যে ধরনি উচ্চারণের সময়ে জিভের সামনের অংশ দন্তমূলের একটু উপরে অর্থাৎ মূর্ধায় টোকা দেওয়ার মতো করে একবার ছাঁয়ে যায়, তাকে তাড়িত ব্যঙ্গন বলে। বাড়ি, মৃঢ় প্রভৃতি শব্দের ড়, ঢ তাড়িত ব্যঙ্গনধনির উদাহরণ।

৩. ধরনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঙ্গনধনি উচ্চারণের সময়ে স্বরঘনের ধরনিদ্বারে বায়ুর কম্পন কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঙ্গনধনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ঘোষ ও অঘোষ।

ঘোষ ব্যঙ্গন

যেসব ধরনি উচ্চারণের সময়ে ধরনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি, সেসব ধরনিকে বলা হয় ঘোষধনি। যথা: ব, ভ, ম, দ, ধ, ন, র, ল, ড, ঢ, ড়, চ, জ, ঝ, গ, ঘ, ঙ, হ।

অঘোষ ব্যঙ্গন

যেসব ধরনি উচ্চারণের সময়ে ধরনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম, সেসব ধরনিকে বলা হয় অঘোষধনি, যথা: প, ফ, ত, থ, স, ট, ঠ, চ, ছ, শ, ক, খ।

৪. ধরনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঙ্গনধনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঙ্গনধনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ব্যঙ্গন

সেসব ধরনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধরনি। যেমন – প, ব, ত, দ, স, ট, ড, ড়, চ, জ, শ, ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ব্যঙ্গন

সেসব ধরনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধরনি। যেমন – ফ, ভ, থ, ধ, ঠ, চ, ছ, বা, খ, ঘ, হ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. বাক্প্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বাতাস বাধা পেয়ে ব্যঙ্গনধনি সৃষ্টি হয়, সেই জায়গাটি হলো ব্যঙ্গনের –
 ক. উচ্চারণ স্থান খ. উচ্চারণ প্রকৃতি গ. ধ্বনি সৃষ্টি ঘ. ধ্বনি প্রকৃতি
২. দন্ত্য ব্যঙ্গনধনির মুখ্য বাক্প্রত্যঙ্গ কোনটি?
 ক. নিচের ঠোঁট খ. জিভের ডগা গ. আলজিড ঘ. দাঁত
৩. কোন ব্যঙ্গনধনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা
 সৃষ্টি করে?
 ক. ওষ্ঠ্য ব্যঙ্গন খ. দন্ত্য ব্যঙ্গন গ. দন্তমূলীয় ব্যঙ্গন ঘ. মূর্ধন্য ব্যঙ্গন
৪. তালব্য ব্যঙ্গনধনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে?
 ক. শসা খ. ঘাস গ. কল ঘ. দল
৫. পার্শ্বিক ব্যঙ্গনধনির উদাহরণ কোনটি?
 ক. ল খ. ম গ. ন ঘ. থ
৬. কোনটি তাড়িত ব্যঙ্গনের উদাহরণ?
 ক. র খ. শ গ. ড় ঘ. ণ
৭. কোনগুলো ঘোষ ব্যঙ্গন?
 ক. ব, ড খ. ট, ঠ গ. চ, ছ ঘ. ত, দ
৮. ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ কম থাকলে সেগুলোকে বলে?
 ক. ঘোষ ধ্বনি খ. অঘোষ ধ্বনি গ. অঞ্চলিক ধ্বনি ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
৯. কম্পিত ব্যঙ্গনের উপস্থিতি আছে কোন শব্দে?
 ক. বড়ো খ. গাঢ় গ. চানাচুর ঘ. হঠাৎ
১০. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী 'শ' কেমন ধ্বনি?
 ক. দন্ত্য খ. মূর্ধন্য গ. তালব্য ঘ. কঠ্য

পরিচ্ছেদ ৮

বর্ণের উচ্চারণ

বাংলা ভাষায় ৩৭টি মূল ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য রয়েছে ৫০টি মূল বর্ণ। এর মধ্যে অধিকাংশ বর্ণের উচ্চারণ মূল ধ্বনির অনুরূপ। কয়েকটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ রয়েছে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণের উচ্চারণ অভিন্ন। ধ্বনিগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি হওয়ার সময়ে পাশের ধ্বনির প্রভাবে বর্ণের উচ্চারণ অনেক সময়ে বদলে যায়। এখানে বাংলা বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

স্বরবর্ণ

অ

অ বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম: [অ] এবং [ও]। সাধারণ উচ্চারণ [অ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে [অ] কখনো কখনো [ও]-এর মতো উচ্চারিত হয়।

অ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ: অনেক [অনেক], কথা [কথা], অনাথ [অনাথ]।

অ বর্ণের [ও] উচ্চারণ: অতি [ওতি], অণু [ওনু], পক্ষ [পোক্ষো], অদ্য [ওদ্দো], মন [মোন]।

আ

আ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ [আ]: আকাশ [আকাশ], রাত [রাত], আলো [আলো]।

[আ] জ্ঞ-এর সঙ্গে থাকলে [আ]-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন - জ্ঞান [গ্যান], জ্ঞাত [গ্যাতো], জ্ঞাপন [গ্যাপন]।

ই, ঈ

[ই] ধ্বনির ত্বরিতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে: ই এবং ঈ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম: দিন [দিন], দীন [দিনো], বিনা [বিনা], বীণা [বিনা], হীন [হিনো]।

উ, উ

[উ] ধ্বনির ত্বরিতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে: উ এবং ঊ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম: উচিত [উচিত], উষা [উশা], উনিশ [উনিশ], উনবিংশ [উনোবিংশো]।

ঝ

ঝ বর্ণের উচ্চারণ [঱ি]-এর মতো: ঝতু [঱িতু], ঝণ [঱িন], কৃঝক [ক্ৱিশক], দৃঝ্য [দ্ৱিশ্যো]।

ঞ

ঞ বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম: [ঞ] এবং [ঞ্যা]। সাধারণ উচ্চারণ [ঞ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে এ কখনো কখনো [ঞ্যা] উচ্চারিত হয়।

ঞ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ: একটি [একটি], দেশ [দেশ], এলো [এলো]।

এ বর্ণের [অ্যা] উচ্চারণ: একটা [অ্যাকটা], বেলা [ব্যালা], খেলা [খ্যালা]।

ঐ

ঐ বর্ণের উচ্চারণ [ওই]: ঐকিক [ওইকিক], তৈল [তোইলো]।

ও

ও বর্ণের উচ্চারণ [ও]: ওল [ওল], বোধ [বোধ]।

ঔ

ঔ বর্ণের উচ্চারণ [ওউ]: ঔষধ [ওউশধ], মৌমাছি [মোউমাছি]।

ব্যঙ্গনবর্ণ

ব্যঙ্গনবর্ণগুলো সাধারণত নিজ নিজ ধৰনি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। যেমন - কলা, খর, বল, নাচ শব্দের ক, খ, ব, ন ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে [ক], [খ], [ব], [ন] ইত্যাদি।

তবে কয়েকটি ব্যঙ্গনবর্ণের উচ্চারণ নিজ নিজ ধৰনি থেকে আলাদা। এ ধরনের কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ঝ

ঝ বর্ণের নিজস্ব কোনো ধৰনি নেই। যতক্ষণ ব্যবহারে [ঝ]-এর মতো আর সংযুক্ত ব্যঙ্গনে [ঝ]-এর মতো উচ্চারিত হয়: মিএঝা [মিয়া], চঞ্চল [চন্চল], গঞ্জ [গন্জো]।

ঞ

ঞ বর্ণের উচ্চারণ [ঞ]: কণা [কনা], বাণী [বানি], হরিণ [হোরিন্]।

ঝ

ঝ বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ঝ]। তবে ফলা হিসেবে এই বর্ণের উচ্চারণে স্থাত্ত্ব্য আছে।

শব্দের আদিতে ব-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন - তৃক [তক্], শুশুর [শোশুর], সাধীন [শাধিন]।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলে সেই ব্যঙ্গনের দ্বিতীয় উচ্চারণ হয়: অশ্ব [অশ্বশো], বিশ্বাস [বিশ্বশাশ], পক্ষ [পক্ষকো]।

ঝ

ঝ বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ঝ]। শব্দের প্রথম বর্ণে ম-ফলা থাকলে সেই বর্ণ উচ্চারণের সময়ে ম-এর উচ্চারণ [ঝ]-এর মতো হয়, যেমন - শৃঙ্খল [শৰ্খাল], অরণ [শৰ্ণোনু]। শব্দের মধ্যে ম-ফলা থাকলে সেই বর্ণ উচ্চারণে দ্বিতীয় এবং সামান্য অনুনাসিক হয়, যেমন - আত্মীয় [আত্মিয়ো], পদ্ম [পদ্মো]। কিছু ক্ষেত্রে ম-ফলায় ম-এর উচ্চারণ বজায় থাকে, যেমন - ঘৃণ্য [জুগ্নমো], জন্ম [জন্মো], গুল্য [গুল্মো]।

ঝ

ঝ বর্ণের উচ্চারণ [ঝ]: যদি [জোদি], যিনি [জিনি], সূর্য [গুরংজো]। তবে য-ফলা থাকলে স্থারের উচ্চারণে পরিবর্তন হয়, যেমন - যেমন - ব্যতীত [বেতিতো], ব্যাথা [ব্যাথা]। শব্দের মাঝামাঝি বা শেষে য-ফলা বর্ণের

সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ বর্ণের উচ্চারণ দ্বিতীয় হয়, যেমন - উদ্যম [উদ্যম], গদ্য [গোদ্যদো]। কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঙ্গনের সঙ্গে থাকা 'ঁ'-এর ক্ষেত্রে উচ্চারণ হয় না, যেমন - সক্ষ্য [শোন্ধা], স্বাঞ্জ্য [শাস্থো], অর্ধ্য [অৱঘো]।

ৱ

ব বর্ণের উচ্চারণ [ব]। তবে ব-ফলা হিসেবে এর উচ্চারণে বৈচিত্র্য আছে। শব্দের মধ্যে বা শেষে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব-ফলা থাকলে দ্বিতীয়সহ ব-ফলা উচ্চারিত হয়, যেমন - মাত্র [মাত্রো], বিদ্রোহ [বিদ্রোহো], যাত্রী [জাত্রি]। কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঙ্গনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে দ্বিতীয় উচ্চারণ হয় না, যেমন - কেন্দ্র [কেন্দ্ৰো], শাস্ত্র [শাস্ত্ৰো], বস্ত্র [বস্ত্ৰো]।

শ, ষ, স

শ কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। স কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, আবার কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। ষ বর্ণের উচ্চারণ সব সময়ে [শ]।

শ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: শত [শতো], শসা [শশা]।

শ বর্ণের [স] উচ্চারণ: শ্রমিক [শ্ৰমিক], শৃগাল [শ্ৰিগাল]।

ষ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: ভাষা [ভাষো], ঘোলা [শোলো]।

স বর্ণের [শ] উচ্চারণ: সাধাৰণ [শাধাৰোন], সামান্য [শামান্নো]।

স বর্ণের [স] উচ্চারণ: আস্তে [আস্তে], সালাম [সালাম]।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. ব-ফলার উচ্চারণ নেই কোন শব্দে?

ক. অশ্ব	খ. পক্ষ	গ. বিশ্বাস	ঘ. শশুর
---------	---------	------------	---------

২. 'অদ্য' শব্দের উচ্চারণ -

ক. ওদ্দো	খ. অদ্দো	গ. অদ্দো	ঘ. ওইদ্দো
----------	----------	----------	-----------

৩. 'ঝ'-'ঁ'-এর উচ্চারণ -

ক. রিন্	খ. রিণ্	গ. ঝন্	ঘ. ঝণ
---------	---------	--------	-------

৪. কোন বর্ণটির নিজস্ব কোনো ধরণি নেই?

ক. ক্ষ	খ. গ	গ. ৎ	ঘ. এৰ
--------	------	------	-------

৫. 'আ' কখনো আঝা-এর মতো উচ্চারিত হয়, যেমন -

ক. রাত	খ. কাতুকুত	গ. জ্ঞান	ঘ. একা
--------	------------	----------	--------

৬. 'এ' বর্ণের বিবৃত উচ্চারণের উদাহরণ -

ক. একটি	খ. এবার	গ. দেশ	ঘ. খেলা
---------	---------	--------	---------

পরিচ্ছদ ৯

শব্দ ও পদের গঠন

এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দের মূল অংশকে শব্দমূল বলে। শব্দমূলের এক নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি দুই ধরনের: নামপ্রকৃতি ও ক্রিয়াপ্রকৃতি। ক্রিয়াপ্রকৃতির অন্য নাম ধাতু। নামপ্রকৃতি ও ধাতুর সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়। নামপ্রকৃতির উদাহরণ: মা, গাছ, শির, লতা ইত্যাদি। ধাতুর উদাহরণ: কর, যা, চল, ধূ ইত্যাদি।

নামপ্রকৃতি ও ধাতুর সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোর নাম উপসর্গ ও প্রত্যয়:

উপসর্গ: যেসব শব্দাংশ শব্দমূলের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।

‘পরিচালক’ শব্দের ‘পরি’ অংশ একটি উপসর্গ।

প্রত্যয়: যেসব শব্দাংশ শব্দমূলের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে।

‘সাংবাদিক’ শব্দের ‘ইক’ অংশ একটি প্রত্যয়।

উপসর্গ ও প্রত্যয় দিয়ে তৈরি শব্দকে সাধিত শব্দ বলা হয়। উপসর্গ ও প্রত্যয় ছাড়া শব্দ গঠনের আরো কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রক্রিয়া হলো সমাস, যার মাধ্যমে একাধিক শব্দ এক শব্দে পরিণত হয়। যেমন ‘হাট’ ও ‘বাজার’ শব্দ দুটি সমাসবক্ত হয়ে হয় ‘হাটবাজার’। এছাড়া কোনো শব্দের দ্বিতীয় ব্যবহারে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে বলে শব্দাবিত্তু, যেমন ‘ঠক’ ও ‘ঠক’ মিলে গঠিত হয় ‘ঠকঠক’, একইভাবে ‘অঙ্ক’ ও অনুরূপ ধ্বনি ‘টঙ্ক’ মিলে হয় ‘অঙ্কটঙ্ক’।

শব্দ যখন বাকের মধ্যে থাকে, তখন তার নাম হয় পদ। পদে পরিণত হওয়ার সময়ে শব্দের সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়, এগুলোর নাম লঘুক। লঘুক চার ধরনের:

বিভক্তি: ক্রিয়ার কাল নির্দেশের জন্য এবং কারক বোঝাতে পদের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত থাকে, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দুই প্রকার: ক্রিয়া-বিভক্তি ও কারক-বিভক্তি। ‘করলাম’ ক্রিয়াপদের ‘লাম’ শব্দাংশ হলো ক্রিয়া-বিভক্তি এবং ‘কৃষকের’ পদের ‘এর’ শব্দাংশ কারক-বিভক্তির উদাহরণ।

নির্দেশক: যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদকে নির্দিষ্ট করে, সেগুলোকে নির্দেশক বলে।

‘লোকটি’ বা ‘ভালোটুকু’ পদের ‘টি’ বা ‘টুকু’ হলো নির্দেশকের উদাহরণ।

বচন: যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদের সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে বচন বলে। ‘ছেলেরা’ বা ‘বইগুলো’ পদের ‘রা’ বা ‘গুলো’ হলো বচনের উদাহরণ।

বলক: যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, সেগুলোকে বলক বলে। ‘তখনই’ বা ‘এখনও’ পদের ‘ই’ বা ‘ও’ হলো বলকের উদাহরণ।

বাক্যের যেসব পদে লম্বক থাকে সেগুলোকে সলম্বক পদ এবং যেসব পদে লম্বক থাকে না সেগুলোকে অলম্বক পদ বলে। 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে' – এই বাক্যের 'ছেলেরা' ও 'খেলে' সলম্বক পদ আর 'ক্রিকেট' অলম্বক পদ।

শব্দ ও পদের মধ্যকার কয়েকটি পার্থক্য নিচে দেখানো হলো:

শব্দ	পদ
১. প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শব্দভাষার থাকে। সাধারণত অভিধানে তা সংকলিত হয়।	১. শব্দ যখন বাক্যে ছান পায়, তখন তার নাম হয় পদ।
২. অভিধানের শব্দগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন।	২. বাক্যের মধ্যে পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
৩. শব্দের অংশ উপসর্গ ও প্রত্যয়।	৩. পদের অংশ বিভক্তি, নির্দেশক, বচন ও বলক।
৪. গঠনগতভাবে শব্দ দুই শ্রেণির: মূল শব্দ ও সাধিত শব্দ।	৪. গঠনগতভাবে পদ দুই রকমের: অলম্বক পদ ও সলম্বক পদ।
৫. শব্দ শুধু ক্রপতন্ত্রের আলোচ্য।	৫. পদ একইসঙ্গে ক্রপতন্ত্র ও বাক্যতন্ত্রের আলোচ্য।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক টিক (✓) দাও।

১. শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে কী বলে?

ক. পদাধু খ. পদ গ. বাক্যাংশ ঘ. প্রকৃতি

২. পদের লম্বক কৃত ধরনের?

ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. কোনটি শব্দের শেষে যুক্ত হয় না?

ক. প্রত্যয় খ. বিভক্তি গ. বলক ঘ. উপসর্গ

৪. যেসব শব্দাংশ পদের যষ্টে যুক্ত হয়ে বক্তব্য জোরালো করে তাকে কী বলে?

ক. বলক খ. প্রত্যয় গ. বিভক্তি ঘ. উপসর্গ

৫. কোনটি সাধিত শব্দ?

ক. গাছ খ. পরিচালক গ. মাছ ঘ. চাঁদ

৬. কোনটি মৌলিক শব্দ?

ক. চাদ খ. বঙ্গুত্ত গ. প্রশাসন ঘ. দায়িত্ব

৭. শব্দের কোথায় প্রত্যয় যুক্ত হয়?

ক. প্রথমে খ. শেষে গ. মধ্যে ঘ. যে কোনো ছানে

৮. কোনটি নির্দেশক?

ক. রা খ. পরি গ. টুকু ঘ. ই

৯. কোনটি লগ্নক নয়?

ক. প্রত্যয় খ. নির্দেশক গ. বলক ঘ. বচন

১০. 'নৌকার ছইয়ে নীল মাছরাঙাটি বসে আছে' বাক্যে অলগ্নক পদ কোনটি?

ক. নৌকার খ. ছইয়ে গ. নীল ঘ. মাছরাঙাটি

পরিচ্ছেদ ১০

উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন

যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে। আজানা (অ+জানা), অভিযোগ (অভি+যোগ), বেতার (বে+তার) প্রভৃতি শব্দের ‘অ’, ‘অভি’, ‘বে’ হলো উপসর্গ।

অনেক সময়ে শব্দের শুরুতে একসঙ্গে একাধিক উপসর্গ বসতে পারে। যেমন, ‘সম্প্রদান’ শব্দে ‘দান’-এর আগে ‘সম্’ এবং ‘প্র’ – এই দুটি উপসর্গ যুক্ত হয়েছে। একইভাবে ‘বিনির্মাণ’ শব্দে ‘মান’-এর আগে বসেছে ‘বি’ এবং ‘নির্’ উপসর্গ।

উপসর্গের নিজের অর্থ নেই; কিন্তু নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরিতে উপসর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য বলা হয় – উপসর্গের অর্থ নেই, কিন্তু অর্থের দ্যোতনা তৈরি করার ক্ষমতা আছে।

বাংলা ভাষায় অর্ধশাস্তাধিক উপসর্গ রয়েছে।

উপসর্গের কাজ

নতুন শব্দ তৈরি করা উপসর্গের কাজ। যেমন – সম+বাদ = সংবাদ, বি+বাদ = বিবাদ। ‘বাদ’ শব্দের সঙ্গে ‘সম্’ এবং ‘বি’ উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ ‘সংবাদ’ ও ‘বিবাদ’ তৈরি হলো।

উপসর্গের আর একটি কাজ শব্দের অর্থ পরিবর্তন করা। যেমন – সু+নজর = সুনজর (অর্থের সংকোচন); সম+পূর্ণ = সম্পূর্ণ (অর্থের সম্প্রসারণ); গর+হাজির = গরহাজির (বিপরীত অর্থ) ইত্যাদি।

নিচে কয়েকটি সুপরিচিত উপসর্গের অর্থদ্যোতনা, সাধিত শব্দ ও বিশ্লেষণ দেখানো হলো।

উপসর্গ	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	দ্যোতনা
অ-	অ+কাজ	অকাজ	অনুচিত
	অ+বোধ	অবোধ	অন্তি
অতি-	অতি+কায়	অতিকায়	বৃহৎ
	অতি+আচার	অত্যাচার	অতিরিক্ত
অধি-	অধি+কার	অধিকার	কর্তৃত
	অধি+বাসী	অধিবাসী	মধ্যে
অনা-	অনা+বৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অভাব
	অনা+সৃষ্টি	অনাসৃষ্টি	বাজে
অনু-	অনু+গমন	অনুগমন	পিছনে
	অনু+রূপ	অনুরূপ	তুল্য
অপ-	অপ+কর্ম	অপকর্ম	মন্দ
	অপ+সংকৃতি	অপসংকৃতি	বিকৃত

অব-	অব+দান	অবদান	বিশেষ
	অব+গৃষ্টন	অবগৃষ্টন	অঙ্গ
অভি-	অভি+জ্ঞ	অভিজ্ঞ	সম্যক
	অভি+জাত	অভিজাত	উন্নত
আ-	আ+রক্ত	আরক্ত	চীমৎ
	আ+খাদ্য	আখাদ্য	সদৃশ
উৎ-	উৎ+ক্ষেপণ	উৎক্ষেপণ	উর্ধ্বে
	উৎ+বাস্তু	উদ্বাস্তু	পরিত্যক্ত
উপ-	উপ+কূল	উপকূল	নিকট
	উপ+ভোগ	উপভোগ	সম্যক
কদ-	কদ+বেল	কদবেল	গৌণ
কু-	কু+কাজ	কুকাজ	নিন্দনীয়
	কু+পথ	কুপথ	অসৎ
গর-	গর+হাজির	গরহাজির	বিপরীত
	গর+ঠিকানা	গরঠিকানা	ভিন্ন
দর-	দর+দালান	দরদালান	মধ্যস্থ
	দর+কাঁচা	দরকাঁচা	সামান্য
দুঃ- (দুর/দুস)	দুঃ+শাসন	দুঃশাসন	মন্দ
	দুর+মূল্য	দুর্মূল্য	অধিক
	দুস+প্রাপ্য	দুষ্প্রাপ্য	অঙ্গ
	দুর+দিন	দুর্দিন	মন্দ
না-	ন+লাঘেক	নালাঘেক	অপূর্ণ
	না+ইক	নাইক	নেতি
নি-	নি+দারুণ	নিদারুণ	অতিশয়
	নি+খাদ	নিখাদ	নেই এমন
নিঃ-(নির/নিস)	নিঃ+শেষ	নিঃশেষ	পুরোপুরি
	নির+ধন	নির্ধন	নেই এমন
	নির+গমন	নির্গমন	বাইরে
	নিস+ত্রঙ্গ	নিস্ত্রঙ্গ	নেই এমন
নিম-	নিম+খুন	নিমখুন	প্রায়
	নিম+রাজি	নিমরাজি	অর্ধেক
পরা-	পরা+জয়	পরাজয়	বিপরীত
	পরা+বাস্তব	পরাবাস্তব	অতিশয়
পরি-	পরি+ত্যাগ	পরিত্যাগ	সম্পূর্ণ
	পরি+পছী	পরিপছী	বিরুদ্ধ
পাতি-	পাতি+হাস	পাতিহাস	ছোটো
প্র-	প্র+গতি	প্রগতি	প্রকৃষ্ট
	প্র+কোপ	প্রকোপ	প্রচণ্ড
প্রতি-	প্রতি+ধ্বনি	প্রতিধ্বনি	তুল্য
	প্রতি+হিংসা	প্রতিহিংসা	পালটা

বদ-	বদ+মেজাজ	বদমেজাজ	উৎ
	বদ+জাত	বজ্জাত	নিম্নলীয়
বি-	বি+ভুই	বিভুই	ভিল
	বি+জ্ঞান	বিজ্ঞান	বিশেষ
বে-	বে+দখল	বেদখল	হত
	বে+আইন	বেআইন	বহিভূত
ভর-	ভর+পেট	ভরপেট	পূর্ণ
	ভর+জোয়ার	ভরজোয়ার	চূড়ান্ত
স-	স+ঠিক	সঠিক	সম্পূর্ণ
সম-	সম+মুখ	সমুখ	অভিমুখে
	সম+যোজন	সংযোজন	একত্র
সু-	সু+দিন	সুদিন	ভালো
	সু+কৌশল	সুকৌশল	চমৎকার
হা-	হা+ভাত	হাভাত	অভাব

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. নিচের কোনটি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ?

- ক. প্রবীণ খ. তিখারি গ. বাবুয়ানা ঘ. সেলাই

২. নিচের কোন শব্দে অপূর্ণ আর্থে 'না' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক. নাহক খ. নাজুক গ. নালায়েক ঘ. নাদাবি

৩. দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশ করছে কোন উপসর্গ যুক্ত শব্দটি?

- ক. আখান্দা খ. উপকূল গ. অনভিজ্ঞ ঘ. আরক্ষ

৫. নিচের কোনটি উপসর্গ?

- ক. গুলো খ. উপ গ. টা ঘ. ও

৬. 'পাতি' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়?

- ক. ছোটো খ. বিপরীত গ. নিম্ন ঘ. শূন্য

প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন

শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন –
বাঘ+আ=বাঘা; দিন+ইক = দৈনিক; দুল+অনা = দোলনা; কৃ+তবা = কর্তব্য।

শব্দের পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেগুলোকে তদ্বিতীয় প্রত্যয় বলে। তদ্বিতীয় প্রত্যয় দিয়ে সাধিত শব্দকে বলে
তদ্বিতীয় শব্দ। উপরের উদাহরণে ‘আ’ ও ‘ইক’ তদ্বিতীয় প্রত্যয় এবং ‘বাঘা’ ও ‘দৈনিক’ হলো তদ্বিতীয় শব্দ।

অন্যদিকে ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেগুলোকে কৃত্ত্বপ্রত্যয় বলে। কৃত্ত্বপ্রত্যয় দিয়ে সাধিত শব্দকে বলে
কৃত্ত্ব শব্দ। উপরের উদাহরণে, ‘অনা’ ও ‘তব্য’ হলো কৃত্ত্বপ্রত্যয় এবং ‘দোলনা’ ও ‘কর্তব্য’ হলো কৃত্ত্ব শব্দ।

প্রত্যয়ের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। তবে প্রত্যয় যুক্ত ইওয়ার পরে অনেক সময়ে শব্দের অর্থ ও শ্রেণিপরিচয় বদলে যায়। নিচে প্রত্যয় দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো:

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
-অ	শিশু+অ	শৈশব	তদ্বিতীয়
	জি+অ	জয়	কৃত্ত্ব
-অক	পঠি+অক	পাঠক	কৃত্ত্ব
	নিন্দা+অক	নিন্দক	কৃত্ত্ব
-অট	দাপ্ত+অট	দাপট	তদ্বিতীয়
	কপ্ট+অট	কপট	কৃত্ত্ব
-অনা	দুল+অনা	দোলনা	কৃত্ত্ব
	খেল+অনা	খেলনা	কৃত্ত্ব
-অনীয়	মান+অনীয়	মাননীয়	কৃত্ত্ব
	দৃশ্য+অনীয়	দর্শনীয়	কৃত্ত্ব
-অন্ত	উড়ি+অন্ত	উড়ন্ত	কৃত্ত্ব
	মহি+অন্ত	মহন্ত	কৃত্ত্ব
-অম	কর্দি+অম	কর্দম	কৃত্ত্ব
	চরি+অম	চরম	কৃত্ত্ব
-আ	বাঘ+আ	বাঘা	তদ্বিতীয়
	পড়া+আ	পড়া	কৃত্ত্ব
	শোনা+আ	শোনা	কৃত্ত্ব
-আই	ঢাকা+আই	ঢাকাই	তদ্বিতীয়
	সেলা+আই	সেলাই	কৃত্ত্ব
-আও	ধির+আও	ধেরাও	কৃত্ত্ব
	পাকড়া+আও	পাকড়াও	কৃত্ত্ব

-আন	গাড়ি+আন	গাড়োয়ান	তদ্বিত
	শী+আন	শয়ান	কৃৎ
-আনা	বিবি+আনা	বিবিয়ানা	তদ্বিত
	মুনশি+আনা	মুনশিয়ানা	তদ্বিত
-আনি	বাবু+আনি	বাবুয়ানি	তদ্বিত
	শুন+আনি	শনানি	কৃৎ
-আনো	বেত+আনো	বেতানো	তদ্বিত
	চাল+আনো	চালানো	কৃৎ
-আমি	পাগল+আমি	পাগলামি	তদ্বিত
	ছেলে+আমি	ছেলেমি	তদ্বিত
-আরি	ভিখ+আরি	ভিখারি	তদ্বিত
	ধূন+আরি	ধূনারি	তদ্বিত
-আরু	বোমা+আরু	বোমারু	তদ্বিত
	খোজু+আরু	খোজারু	কৃৎ
-আল	ঘাট+আল	ঘাটাল	তদ্বিত
	মাত্+আল	মাতাল	কৃৎ
-আলো	জমক+আলো	জমকালো	তদ্বিত
	রস+আলো	রসালো	তদ্বিত
-ই	চাষ+ই	চাষি	তদ্বিত
	ভাজ+ই	ভাজি	কৃৎ
-ইক	দিন+ইক	দৈনিক	তদ্বিত
	চরিত্র+ইক	চারিত্রিক	তদ্বিত
-ইয়া	জাল+ইয়া	জালিয়া > জেলে	তদ্বিত
	গা+ইয়া	গাইয়া > গাইয়ে	কৃৎ
-ইল	পক্ষ+ইল	পক্ষিল	তদ্বিত
	সল+ইল	সলিল	কৃৎ
-ইষু	চল+ইষু	চলিষু	কৃৎ
	সহ+ইষু	সহিষু	কৃৎ
-ঈ (ইন)	প্রাণ+ঈ	প্রাণী	তদ্বিত
	ছ্বা+ঈ	ছ্বাণী	কৃৎ
-ঈ	নর+ঈ	নারী	তদ্বিত
	ছাত্র+ঈ	ছাত্রী	তদ্বিত
-ঈন	গ্রাম+ঈন	গ্রামীণ	তদ্বিত
	সর্বজন+ঈন	সর্বজনীন	তদ্বিত
-ঈয়	রাষ্ট্র+ঈয়	রাষ্ট্রীয়	তদ্বিত
	মিশ্রণ+ঈয়	মিশ্রীয়	তদ্বিত

-ট	চাল+ট	চালু	তদ্ধিত
	বাড়ু+ট	বাড়ু	কৃৎ
-উক	পেট+উক	পেটুক	তদ্ধিত
	মিশু+উক	মিশুক	কৃৎ
-উড়	গরু+উড়	গরুড়	তদ্ধিত
	লেজ+উড়	লেজুড়	তদ্ধিত
-উয়া	মাছ+উয়া	মাছুয়া	তদ্ধিত
	পড়ু+উয়া	পড়ুয়া	কৃৎ
-ওয়া	ঘর+ওয়া	ঘরোয়া	তদ্ধিত
	লাগ+ওয়া	লাগোয়া	কৃৎ
-ওয়ালা	বাড়ি+ওয়ালা	বাড়িওয়ালা	তদ্ধিত
	রিকশা+ওয়ালা	রিকশাওয়ালা	তদ্ধিত
-ক	ফলা+ক	ফলক	তদ্ধিত
	চড়ু+ক	চড়ুক	কৃৎ
-কর	বাজি+কর	বাজিকর	তদ্ধিত
	কারি+কর	কারিকর	তদ্ধিত
-খানা	ছাপা+খানা	ছাপাখানা	তদ্ধিত
	ডাক্তার+খানা	ডাক্তারখানা	তদ্ধিত
-ড়া	গাছ+ড়া	গাছড়া	তদ্ধিত
	চাম+ড়া	চামড়া	তদ্ধিত
-ত	মুচ+ত	মুস্ত	কৃৎ
	জ্বা+ত	জ্বাত	কৃৎ
-তব্য	কৃ+তব্য	কর্তব্য	কৃৎ
	দা+তব্য	দাতব্য	কৃৎ
-তম	আশি+তম	আশিতম	তদ্ধিত
	দীর্ঘ+তম	দীর্ঘতম	তদ্ধিত
-তর	এমন+তর	এমনতর	তদ্ধিত
	অশ্ব+তর	অশ্বতর	তদ্ধিত
-তা	শক্র+তা	শক্রতা	তদ্ধিত
	বহু+তা	বহুতা	কৃৎ
-তি	চাক+তি	চাকতি	তদ্ধিত
	কাট+তি	কাটতি	কৃৎ
-ত্	কবি+ত্	কবিত্	তদ্ধিত
	সতী+ত্	সতীত্	তদ্ধিত
-ত্র	হন্দ+ত্র	হত্র	কৃৎ
	নী+ত্র	নেত্র	কৃৎ
-থ	চতুর্থ+থ	চতুর্থ	তদ্ধিত
	কাশ+থ	কাষ্ঠ	কৃৎ
দার	অংশী+দার	অংশীদার	তদ্ধিত

	চূড়ি+দার	চূড়িদার	তদ্বিত
-ন	নাতি+ন	নাতিন	তদ্বিত
-না	রাঁধ+না	রাঁনা	কৃৎ
	কাঁদ+না	কাঁনা	কৃৎ
-পনা	গিন্ধি+পনা	গিন্ধিপনা	তদ্বিত
	বেহায়া+পনা	বেহায়াপনা	তদ্বিত
-বর	ছা+বর	ছাবর	কৃৎ
	চতু+বর	চতুর	কৃৎ
-বাজ	ধান্দা+বাজ	ধান্দাবাজ	তদ্বিত
	বোকা+বাজ	বোকাবাজ	তদ্বিত
-বান	দয়া+বান	দয়াবান	তদ্বিত
	জ্বান+বান	জ্বানবান	তদ্বিত
-মান	বুদ্ধি+মান	বুদ্ধিমান	তদ্বিত
	বৃথৎ+মান	বৰ্থমান	কৃৎ
-ঝ	সুন্দর+ঝ	সৌন্দৰ্য	তদ্বিত
	কৃ+ঝ	কাৰ্য	কৃৎ
-র	মধু+র	মধুর	তদ্বিত
	নম+র	নম্র	কৃৎ
-ল	দীঘ+ল	দীঘল	তদ্বিত
	অম+ল	অম্ল	কৃৎ
-লা	মেঘ+লা	মেঘলা	তদ্বিত
	হাম্ম+লা	হামলা	কৃৎ
-সই	মানান+সই	মানানসই	তদ্বিত
	চলন+সই	চলনসই	তদ্বিত
-সে	পানি+সে	পানসে	তদ্বিত
	ফিকা+সে	ফ্যাকাসে	তদ্বিত

প্রত্যয় যোগ করলে শব্দের অর্থ অনেক সময়ে বদলে যায়, যেমন —

অবজ্ঞা অর্থে: চের→চোরা, বৃহৎ অর্থে: ডিঙ্গি→ডিঙা, সদ্শ অর্থে: বাঘ→বাঘা, আগত অর্থে: দখিন→দখিনা, আদর অর্থে: কানু→কানাই, জাত অর্থে: ঢাকা → ঢাকাই, ভাব অর্থে: ইতর → ইতরামি, নিন্দা অর্থে: জেঠা → জেঠামি, ভাব অর্থে: বাহাদুর → বাহাদুরি, পেশা অর্থে: ডাক্তার → ডাক্তারি, মালিক অর্থে: জমিদার → জমিদারি, উপকরণ অর্থে: মাটি → মেটে, নেপুণ্য অর্থে: না → নেয়ে, রোগঘাস্ত অর্থে: বাত → বেতো, যুক্ত অর্থে: টাক → টেকো, সংশ্লিষ্ট অর্থে: গাঁ → গেঁয়ো।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয় তাদের কী বলে?
 ক. কৃত্ব প্রত্যয় খ. তদ্বিত প্রত্যয় গ. কৃদন্ত শব্দ ঘ. তদ্বিতান্ত পদ
২. তদ্বিত প্রত্যয় দিয়ে সাধিত শব্দকে কী বলে?
 ক. প্রত্যয় খ. প্রকৃতি গ. মৌলিক শব্দ ঘ. তদ্বিতান্ত শব্দ
৩. নিচের কোনটি তদ্বিতান্ত শব্দের উদাহরণ?
 ক. খেলনা খ. নাগর গ. গমন ঘ. পড়া
৪. নিচের কোনটির নিজস্ব অর্থ আছে?
 ক. প্রত্যয় খ. উপসর্গ গ. শব্দ ঘ. বচন
৫. নিচের কোনটি কৃদন্ত শব্দের উদাহরণ?
 ক. ভাজি খ. বিবাহিত গ. দৈনিক ঘ. পাগলামি
৬. নিচের কোন শব্দটি ‘উয়া’ প্রত্যয় যোগে গঠিত?
 ক. লাগোয়া খ. ঘরোয়া গ. পড়ুয়া ঘ. বাঢ়িওয়ালা
৭. অবজ্ঞা অর্থে কোন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে?
 ক. কানাই খ. গেঁয়ো গ. চোরা ঘ. বেতো

পরিচ্ছেদ ১২

সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন

সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। বাক্যের মধ্যে পরল্পদের সম্পর্কিত একাধিক পদের এক শব্দে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। নিচের বাক্য দুটির দিকে তাকানো যাক:

১ম বাক্য: পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময় সংক্রান্ত সূচি স্কুল ও কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

২য় বাক্য: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচি স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

১ম বাক্যের ‘পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক’, ‘সময় সংক্রান্ত সূচি’ এবং ‘স্কুল ও কলেজ’ পদগুলো ২য় বাক্যে যথাক্রমে ‘পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক’, ‘সময়সূচি’ এবং ‘স্কুল-কলেজ’ হিসেবে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। সংক্ষেপ করার এই প্রক্রিয়ার নাম সমাস।

সমাসবক্ত শব্দকে বলে সমষ্টিপদ, যেমন ‘পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক’, ‘সময়সূচি’ এবং ‘স্কুল-কলেজ’। এর প্রথম অংশের নাম পূর্বপদ এবং শেষ অংশের নাম পরপদ। এখানে ‘পরীক্ষা’, ‘সময়’ ও ‘স্কুল’ হলো পূর্বপদ এবং ‘নিয়ন্ত্রক’, ‘সূচি’ ও ‘কলেজ’ হলো পরপদ।

যেসব শব্দ দিয়ে সমষ্টিপদকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে ব্যাসবাক্য বলে। এখানে ‘পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক’ পদের ব্যাসবাক্য হলো ‘পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক’, ‘সময়সূচি’ পদের ব্যাসবাক্য হলো ‘সময় সংক্রান্ত সূচি’ এবং ‘স্কুল-কলেজ’ পদের ব্যাসবাক্য হলো ‘স্কুল ও কলেজ’। এছাড়া যেসব পদ নিয়ে সমাস হয়, সেগুলোকে সমস্যমান পদ বলে। ১ম বাক্যের ‘পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক’ পদগুলোর ‘পরীক্ষাসমূহের’ এবং ‘নিয়ন্ত্রক’ হলো সমস্যমান পদ।

সমষ্টিপদ সাধারণত এক শব্দ হিসেবে লেখা হয়, যেমন ‘সময়সূচি’। উচ্চারণ বা অর্থের বিভাগ ঘটার আশঙ্কায় কিছু ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝাখালে হাইফেন (-) বসে, যেমন ‘স্কুল-কলেজ’। কিছু ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদকে আলাদা লেখা হয়, যেমন ‘পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক’।

সমাস মূলত চার প্রকার। যথা: দ্঵ন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বন্ধুরী।

১. দ্঵ন্দ্ব সমাস

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয় পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে। যেমন – ‘সোনা-রূপা’ সমষ্টিপদের ব্যাসবাক্য ‘সোনা ও রূপা’। নিচের বাক্যে সমষ্টিপদটির প্রয়োগ থেকে এর পূর্বপদ ও পরপদের অর্থের প্রাধান্য বোঝা যাবে:

সোনা-রূপার দাম বেড়ে গেছে।

অর্থাৎ সোনার দামও বেড়ে গেছে, রূপার দামও বেড়ে গেছে।

দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে সমজাতীয়, বিপরীত ও অনুরূপ শব্দের সংযোগ ঘটে। যেমন – মা ও বাবা = মা-বাবা, ঘর্গ ও নরক = ঘর্গ-নরক, জমা ও খরচ = জমাখরচ, হাত ও পা = হাত-পা, উনিশ ও বিশ = উনিশ-বিশ, বাঢ় ও বৃষ্টি = বাঢ়বৃষ্টি, পোটলা ও পুটলি = পোটলা-পুটলি, তুমি ও আমি = তুমি-আমি, আসা ও যাওয়া = আসা-যাওয়া, ধীরে ও সুষ্ঠে = ধীরেসুষ্ঠে, ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ।

কিছু দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের বিভিন্ন সমাসবদ্ধ হলেও বিদ্যমান থাকে। এই ধরনের দ্বন্দ্ব সমাসের নাম অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন –

হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে, চোখে ও মুখে = চোখেমুখে, চলনে ও বলনে = চলনে-বলনে ইত্যাদি।

সমস্যমান পদ কথনো কথনো দুইয়ের বেশি হতে পারে। যেমন –

সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম; হাত, পা, চোখ ও কান = হাত-পা-চোখ-কান ইত্যাদি।

২. কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন – গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল, যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচা-মিঠা।

ক. কিছু কর্মধারয় সমাসের সমস্যমান পদে 'যে' যোজক থাকে, যেমন –

থাস যে জমি = থাসজমি, চিত যে সাঁতার = চিতসাঁতার

ভাজা যে বেগুন = বেগুনভাজা, সিঙ্ক যে আলু = আলুসিঙ্ক

কনক যে টাঁপা = কনকটাঁপা, টাক যে মাথা = টাকমাথা

যে চালাক সে চতুর = চালাকচতুর, যে শাস্ত সে শিষ্ট = শাস্তশিষ্ট

খ. কিছু কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ হয়, সেগুলোকে দ্বিতীয় কর্মধারয় বলে। যেমন –

তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা, চার রাস্তার মিলন = চৌরাস্তা

গ. কিছু কর্মধারয় সমাসে সমস্যমান পদের মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদ লোপ পায়। এগুলো মধ্যপদলোপী কর্মধারয় নামে পরিচিত। যেমন –

যি মাখানো ভাত = যিভাত, হাতে পরা হয় যে ঘড়ি = হাতঘড়ি

ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই, বিজয় নির্দেশক পতাকা = বিজয়-পতাকা

ঘ. যার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা উপমান। কিছু কর্মধারয় সমাসে উপমানের সঙ্গে গুণবাচক শব্দের সমাস হয়। এগুলোকে উপমান কর্মধারয় বলে। যেমন –

কাজলের মতো কালো = কাজলকালো

শাশের মতো ব্যস্ত = শশব্যস্ত

এই সমাসে পরপদ সাধারণত বিশেষণ হয়।

ঙ. যাকে তুলনা করা হয়, তা উপমেয়। কিছু কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের সমাস হয়। এগুলোকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন –

পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ, আঁধি পদ্মের ন্যায় = পদ্মআঁধি, মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ

এই সমাসে উভয় পদই বিশেষ্য হয়।

চ. কিছু কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভেদ কল্পনা করা হয়। এগুলোকে ঝুঁপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন –

বিষাদ রূপ সিক্ক = বিষাদসিক্ক, মন রূপ মাবি = মনমাবি।

৩. তৎপুরুষ সমাস

সমস্যমান পদের বিভক্তি ও সন্ধিহিত অনুসর্গ লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তার নাম তৎপুরুষ সমাস। এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

ক. বিভক্তি লোপ পাওয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ:

দৃঢ়থকে প্রাণ = দৃঢ়থপ্রাণ, ছেলেকে ভুলানো = ছেলে-ভুলানো

মামার বাড়ি = মামাবাড়ি, ধানের খেত = ধানখেত, পথের রাজা = রাজপথ

গোলায় ভরা = গোলাভরা, গাছে পাকা = গাছপাকা, অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু।

খ. সন্ধিহিত অনুসর্গ লোপ পাওয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ:

মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, চিনি দিয়ে পাতা = চিনিপাতা

রাঙ্গার জন্য ঘর = রাঙ্গাঘর, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা

গ্রাম থেকে ছাড়া = গ্রামছাড়া, আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া।

গ. কিছু ক্ষেত্রে বিভক্তি লোপ পায় না, এসব তৎপুরুষ সমাসের নাম অলুক তৎপুরুষ, যেমন –

গরুর গাড়ি = গরুরগাড়ি, তেলে ভাজা = তেলেভাজা।

৪. বহুবীহি সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোঝায়, তাকে বহুবীহি সমাস বলে। যেমন – বউ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে = বউভাত, লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি ইত্যাদি।

ক. পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য হলে তাকে সমানবিকার বহুবীহি বলে। যেমন – এক গৌঁ যার = একগুঁয়ে, লাল পাড় যে শাড়ির = লালপেড়ে।

খ. পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য (কখনো কখনো ক্রিয়াবিশেষ্য) হলে ব্যাধিকরণ বহুবীহি হয়। যেমন – গোফে খেজুর যার = গোফখেজুরে।

গ. যে বহুবীহি সমাসের ব্যাসবাক্য থেকে এক বা একাধিক পদ লোপ পায়, তাকে পদলোপী বহুবীহি বলে। যেমন – চিরনির মতো দাঁত যার = চিরনদাঁতি, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি।

ঘ. পারম্পরিক ক্রিয়া কোনো অবস্থা তৈরি হলে ব্যতিহার বহুবীহি হয়। যেমন – হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

ঙ. যে বহুবীহি সমাসে সমস্যমান পদের পূর্বপদের বিভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাকে অলুক বহুবীহি বলে। যেমন – গায়ে এসে পড়ে যে = গায়েপড়া, কানে খাটো যে = কানেখাটো।

চ. যে বহুবীহি সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক, তাকে সংখ্যাবাচক বহুবীহি সমাস বলে। যেমন – চার ভুজ যে ক্ষেত্রে = চতুর্ভুজ, সে (তিন) তার যে যত্রে = সেতার।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. সমাসের মাধ্যমে গঠিত হয় -

ক. নতুন শব্দ খ. নতুন বাক্য গ. নতুন বর্ণ ঘ. নতুন ধ্বনি

২. সমাসবক্ত পদকে বলে -

ক. সমষ্টিপদ খ. সমস্যমান পদ গ. পূর্বপদ ঘ. পরপদ

৩. ব্যাসবাক্য কাকে ব্যাখ্যা করে?

ক. পূর্বপদ খ. পরপদ গ. সমষ্টিপদ ঘ. সমস্যমান পদ

৪. 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচি কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন' - এই বাক্যে সময়সূচি কোন পদ?

ক. সমষ্টিপদ খ. সমস্যমান পদ গ. পূর্বপদ ঘ. পরপদ

৫. অর্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বাংলা সমাস কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিনি গ. চার ঘ. পাঁচ

৬. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?

ক. নয়-ছয় খ. খাসজামি গ. কলকচাপা ঘ. ত্রিফলা

৭. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

ক. হাতঘড়ি খ. চোখে-মুখে গ. সেতার ঘ. তেলেভাজা

৮. নিচের কোনটির ব্যাসবাক্যে 'যে' যোজক রয়েছে?

ক. বেঙ্গলভাজা খ. ত্রিফলা গ. ঘরজামাই ঘ. হাতঘড়ি

৯. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উদাহরণ কোনটি?

ক. চৌরাস্তা খ. ঘিভাত গ. চালাকচতুর ঘ. টাকমাথা

১০. উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?

ক. ঠাইমুখ খ. শশব্যন্ত গ. হাতঘড়ি ঘ. বিষাদসিঙ্গু

১১. নিচের কোনটিতে উপমের পদের সাথে উপমান পদের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে?

ক. কাজলকালো খ. মনমাবি গ. তুষারঙ্গু ঘ. চৌরাস্তা

১২. বিভক্তি লোপ পাওয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি?

ক. ছেলে-ভুলানো খ. তেলেভাজা গ. গুরুগাড়ি ঘ. হাতে কাটা

১৩. নিচের কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?

ক. গ্রামছাড়া খ. গাছগাকা গ. ধানক্ষেত ঘ. গুরুগাড়ি

১৪. কোন সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোবায়?

ক. দ্বিশ সমাস খ. তৎপুরুষ সমাস গ. বহুবীহি সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস

১৫. যে বহুবীহি সমাসে সমষ্টিপদে পূর্বপদের বিভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তাকে কী বলে?

ক. সংখ্যাবাচক বহুবীহি খ. ব্যতিহার বহুবীহি গ. পদলোপী বহুবীহি ঘ. অলুক বহুবীহি

পরিচ্ছেদ ১৩

সংক্ষি

পাশাপাশি ধ্বনির মিলনকে সংক্ষি বলে। পৃথিবীর বহু ভাষায় পাশাপাশি শব্দের একাধিক ধ্বনি নিয়মিতভাবে সংক্ষিবদ্ধ হলেও বাংলা ভাষায় তা বিরল। যেমন ‘আমি এখন চা আনতে যাই’ বাংলা ভাষার এই বাক্যটিকে সংক্ষির সূত্র অনুযায়ী ‘আম্যেখন চানতে যাই’ বলা যায় না। তবে বাংলা ভাষায় উপসর্গ-প্রত্যয় দিয়ে এবং সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দগঠনের ক্ষেত্রে সংক্ষির সূত্র কাজে লাগে।

সংক্ষি তিনি প্রকার: ঘরসংক্ষি, ব্যঙ্গসংক্ষি ও বিসর্গসংক্ষি।

১. ঘরসংক্ষি

ঘরধ্বনির সঙ্গে ঘরধ্বনির মিলনকে ঘরসংক্ষি বলে।

সূত্র-১: অ/আ+অ/আ = আ। যেমন - উন্নর+অধিকার = উন্নরাধিকার, আশা+অতীত = আশাতীত

সূত্র-২: ই/ঈ+ই/ঈ = ঈ। যেমন - অতি+ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়, পরি+ঈঙ্কা = পরীঙ্কা

সূত্র-৩: উ/উ+উ/উ = উ। যেমন - মুক্ত+উদ্যান = মুক্তদ্যান

সূত্র-৪: অ/আ+ই/ঈ = এ। যেমন - গুভ+ইচছা = গুভেচছা

সূত্র-৫: অ/আ+উ/উ = ও। যেমন - সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়

সূত্র-৬: অ/আ+ঝ = অৱ। যেমন - মহা+ঝাপি = মহার্ঘি

সূত্র-৭: অ/আ+ঝত = আৱ। যেমন - শীত+ঝত = শীতার্ত

সূত্র-৮: অ/আ+এ/ঐ = ঐ। যেমন - জন+এক = জনৈক

সূত্র-৯: অ/আ+ও/ও = ও। যেমন - বন+ওষধি = বনৌষধি

সূত্র-১০: ই/ঈ+অন্য ঘর = য+ঘর। যেমন - প্রতি+এক = প্রতোক

সূত্র-১১: উ/উ+অন্য ঘর = ব+ঘর। যেমন - সু+অঞ্জ = ঘঞ্জ

সূত্র-১২: ঝ+অন্য ঘর = র্ঝ+ঘর। পিত্ত+আলয় = পিত্রালয়

সূত্র-১৩: এ+ অন্য ঘর = অঘ্য+ঘর। যেমন - শ্বে+অল = শঘ্যল

সূত্র-১৪: ঔ+ অন্য ঘর = অব্য+ঘর। যেমন - নৈ+অক = নায়ক

সূত্র-১৫: ও+ অন্য ঘর = অব্ব+ঘর। যেমন - গো+আদি = গবাদি

সূত্র-১৬: ঔ+ অন্য ঘর = আব্ব+ঘর। যেমন - নৌ+ইক = নাবিক।

কিছু ঘরসংক্ষি সূত্র অনুসরণ করে না, সেগুলোকে নিপাতনে সিন্ধু ঘরসংক্ষি বলে। যেমন - কুল+অটা = কুলটা (সূত্র অনুসারে কুলটা হওয়ার কথা)। গো+অক্ষ = গবাক্ষ (সূত্র অনুসারে গবক্ষ হওয়ার কথা) ইত্যাদি।

২. ব্যঙ্গনসংক্ষি

স্বরে-ব্যঙ্গনে, ব্যঙ্গনে-স্বরে ও ব্যঙ্গনে-ব্যঙ্গনে যে সংক্ষি হয়, তাকে ব্যঙ্গনসংক্ষি বলে।

ক. স্বর+ব্যঙ্গন

স্বর+চ = স্বর+চ। যেমন - কথা+ছলে = কথাছলে, পরি+ছেদ = পরিছেদ।

এখানে পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী ছ-এর জায়গায় চ হয়েছে।

খ. ব্যঙ্গন+স্বর

ক/চ/ট/ত/প+স্বর = গ/জ/ড(ড়)/দ/ব। যেমন - দিক্ষ+অন্ত = দিগ্ঞ, সৎ+উপায় = সদুপায়

স্বরধ্বনিগুলো ঘোষবৎ হয়। এখানে ঘোষবৎ স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি (ক, চ, ট, ত, প) পরিবর্তিত হয়ে ঘোষধ্বনিতে (গ, জ, ড, দ, ব) পরিণত হয়।

গ. ব্যঙ্গন+ব্যঙ্গন

ব্যঙ্গনসংক্ষিতে একটি ধ্বনির প্রভাবে পার্শ্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন -

চলৎ+চিত্র = চলচিত্র (এখানে চ-এর প্রভাবে ত হয়েছে চ)

বিপদ্ধ+জনক = বিপজ্জনক (এখানে জ-এর প্রভাবে দ হয়েছে জ)

উৎ+লাস = উল্লাস (এখানে ল-এর প্রভাবে ত হয়েছে ল)

বাক্ষ+দান = বাগ্দান (এখানে ঘোষধ্বনি দ-এর প্রভাবে ক হয়েছে গ)

তৎ+মধ্যে = তন্মধ্যে (এখানে নাসিক্য ধ্বনি ম-এর প্রভাবে ত হয়েছে ন)

শম্ভ+কা = শক্তা (এখানে কষ্টধ্বনি ক-এর প্রভাবে ম হয়েছে ঙ)

সম্ভ+চয় = সম্ভয় (এখানে তালব্যধ্বনি চ-এর প্রভাবে ম হয়েছে এঃ)

সম্ভ+তাপ = সন্তাপ (এখানে দন্তধ্বনি ত-এর প্রভাবে ম হয়েছে ন)

সম্ভ+মান = সম্মান (এখানে ওষ্ঠধ্বনি ম-এর প্রভাবে ম অপরিবর্তিত রয়েছে)

ষম্ভ+থ = ষষ্ঠ (এখানে মূর্ধন্যধ্বনি ষ-এর প্রভাবে থ হয়েছে ঠ)।

কিছু ব্যঙ্গনসংক্ষি নিয়ম ছাড়া হয়, সেগুলোকে নিপাতনে সিঙ্ক ব্যঙ্গনসংক্ষি বলে। যেমন - গো+পদ = গোপদ, এক+দশ = একাদশ, বৃহৎ+পতি = বৃহপতি ইত্যাদি।

৩. বিসর্গসংক্ষি

বিসর্গসংক্ষিতে বিসর্গের কয়েক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়:

১. বিসর্গ বিদ্যমান থাকে: মনঃ+কষ্ট = মনঃকষ্ট, অধঃ+পতন = অধঃপতন, বয়ঃ+সংক্ষি = বয়ঃসংক্ষি

২. বিসর্গ 'ও' হয়ে যায়: মনঃ+যোগ = মনোযোগ, তিরঃ+ধান = তিরোধান, তপঃ+বন = তপোবন

৩. বিসর্গ 'ৰ' হয়ে যায়: নিঃ+আকার = নিরাকার, পুনঃ+মিলন = পুনর্মিলন, আশীঃ+বাদ = আশীর্বাদ

৪. বিসর্গ শ্ব/ঘ/স্ত হয়: নিঃ+চয় = নিশ্চয়, দুঃ+কর = দুক্ষর, পুরঃ+কার = পুরক্ষার

৫. কিছু কিছু সংক্ষিতে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়: নিঃ+রব = নীরব, নিঃ+রস = নীরস, নিঃ+রোগ = নীরোগ।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. পাশাপাশি ধ্বনির মিলনকে বলে?

- ক. একত্রীকরণ খ. সম্ভবেশ গ. সমাস ঘ. সংক্ষি

২. $A/A + A/A =$ আ সূত্রের উদাহরণ কোনটি?

- ক. উত্তরাধিকার খ. জনেক গ. অতীন্দ্রিয় ঘ. নাবিক

৩. ঘরের সঙ্গে ঘরের যে সংক্ষি হয় তাকে কোন সংক্ষি বলে?

- ক. ঘরসংক্ষি খ. ব্যঞ্জনসংক্ষি গ. বিসর্গসংক্ষি ঘ. ঘর-ব্যঞ্জন সংক্ষি

৪. গো + আদি = গোদি – কোন সূত্রে সিদ্ধ?

- ক. ও + অন্য ঘর = অব + ঘর খ. এ + অন্য ঘর = অয় + ঘর
গ. ঔ + অন্য ঘর = র + ঘর ঘ. উ/উ + অন্য ঘর = ব + ঘর

৫. ব্যঞ্জনসংক্ষি কতভাবে হতে পারে?

- ক. এক খ. দুই গ. তিন ঘ. চার

৬. 'পরিচেছে' কোন নিয়মে ব্যঞ্জনসংক্ষি?

- ক. ঘর + ঘর খ. ঘর + ব্যঞ্জন গ. ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন ঘ. ব্যঞ্জন + ঘর

৭. নিচের কোনটিতে জ-এর প্রভাবে ত হয়েছে জ?

- ক. সংজ্ঞা খ. উজ্জ্বল গ. বিপদমূলক ঘ. চলচিত্র

৮. নিচের কোনটি বিসর্গ সংক্ষির উদাহরণ?

- ক. ষষ্ঠি খ. সম্মান গ. বচ্ছ ঘ. মনোযোগ

৯. নিচের কোনটিতে বিসর্গ 'ও' হয়ে গেছে?

- ক. নীরোগ খ. আরোগ্য গ. তিরোধান ঘ. ভৌগোলিক

১০. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসংক্ষি কোনটি?

- ক. নায়ক খ. পিত্রালয় গ. শুভেচ্ছা ঘ. একাদশ

পরিচ্ছেদ ১৪

শব্দবিত্ত

অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দবিত্ত বলে। শব্দবিত্ত তিন ধরনের: অনুকার দ্বিতীয়, ধ্বন্যাত্মক দ্বিতীয় ও পুনরাবৃত্ত দ্বিতীয়।

১. অনুকার দ্বিতীয়

পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিতীয় বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়। এই অনুকরণ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে ট, ফ, ব, ম, শ প্রভৃতি ধ্বনি যুক্ত থাকতে দেখা যায়। তাতে শব্দকে খানিকটা অনিদিষ্ট, সাধারণ বা গুরুত্বহীন করা হয়। প্রকাশ পায় ‘এই রকম একটা’ ভাব। যেমন -

অঙ্ক-টঙ্ক, আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, গর-টৱ, ছাগল-টাগল, ঝাল-টাল, হেন-তেন, লুচিফুচি, টাট্টু-ফাট্টু, আগড়ম-বাগড়ম, চাকর-বাকর, এলোমেলো, বিকিমিকি, কচর-মচর, বিলমিল, শেষ-মেষ, অঙ্গসঞ্চ, বুক্কিঙ্গম্বি, গুটিশুটি, মোটাসোটা, নরম-সরম, ব্যাপার-স্যাপার, বুরো-সুরো।

অনুকার দ্বিতীয় অনেক সময়ে স্বরের পরিবর্তন ঘটে, যেমন -

আড়াআড়ি, খৌজাখুঁজি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, ঠেকাঠেকি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি, দামাদামি, পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি, টুকরো-টাকরা, ধারধোর, জোগাড়-জাগাড়।

২. ধ্বন্যাত্মক দ্বিতীয়

কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন - ঠন একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কোনো ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য কোনো ধাতব পদার্থের সংঘর্ষে এই ধরনের ধ্বনি তৈরি হয়। ঠন শব্দটি পরপর দুই বার বা কখনো ততোধিক বার ব্যবহৃত হলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি হয়। যেমন - সাঁ করে তির ছুটে যায়, সাঁ সাঁ করে তিরগুলো ছুটে যাচ্ছে, সাঁ সাঁ করে অসংখ্য তির চারদিকে ছুটে গেল। অনেক সময়ে ক঳িত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিতীয় তৈরি হয়। যেমন - ফোড়া টন্টন করে, গা ছমছম করে। কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিতীয়ের উদাহরণ:

কুট কুট, কোত কোত, কুটুস-কুটুস, খক খক, খুটুর-খুটুর, টুং টুং, টুক টুক, ধূপ ধূপ, দুম দুম, ঢং ঢং, চকচক, ঝলঝল, বামবাম, টস্টস, থকথকে, ফুসুর ফুসুর, ভটভট, শৌ শৌ, হিস হিস।

কিছু ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক দ্বিতীয়ের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন -

খপাখপ, গবাগব, বাটাবাট, ফটাফট, দমাদম, পটাপট।

৩. পুনরাবৃত্ত স্থিতি

পুনরায় আবৃত্ত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত স্থিতি বলে। পুনরাবৃত্ত স্থিতি বিভক্তিহীন বা বিভক্তিযুক্ত হতে পারে। যেমন – জ্বর জ্বর, পর পর, করি করি, হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে ইত্যাদি।

বিভক্তিহীন পুনরাবৃত্ত: ভালো ভালো (কথা), কত কত (লোক), হঠাৎ হঠাৎ (ব্যথা), ঘুম ঘুম (চোখ), উড়ু উড়ু (মন), গরম গরম (জিলাপি), হায় হায় (করা)।

বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্ত: কথায় কথায় (বাড়া), মজার মজার (কথা), বাঁকে বাঁকে (চলা), চোখে চোখে (রাখা), মনে মনে (হাসা), সুরে সুরে (বলা), পথে পথে (হাটা)।

অনুশীলনী

সঠিক উভয়ে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দুইবার ব্যবহৃত হওয়া শব্দকে বলে –

ক. শব্দ পরিবর্তন খ. শব্দস্থিতি গ. শব্দ গঠন ঘ. শব্দ প্রয়োগ

২. শব্দস্থিতি কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. পর পর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে কী বলে?

ক. অনুকার স্থিতি খ. পুনরাবৃত্ত স্থিতি গ. ধ্বন্যাত্মক স্থিতি ঘ. পদস্থিতি

৪. কোন ধরনের স্থিতে বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়?

ক. অনুকার স্থিতে খ. পুনরাবৃত্ত স্থিতে গ. ধ্বন্যাত্মক স্থিতে ঘ. ক ও খ উভয়ই

৫. কোনটি ধ্বন্যাত্মক স্থিতের উদাহরণ?

ক. চূপচাপ খ. সুরে সুরে গ. চোখে চোখে ঘ. ঢং ঢং

৬. বিভক্তিযুক্ত শব্দস্থিতি কোনটি?

ক. বাঁকে বাঁকে খ. হায় হায় গ. ঘুম ঘুম ঘ. কত কত

৭. নিচের কোন ধ্বন্যাত্মক স্থিতের মাঝামানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে?

ক. খপাখপ খ. থকথকে গ. ভট ভট ঘ. মজায় মজায়

পরিচ্ছেদ ১৫

নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ

বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য শব্দ ও কিছু বিশেষণ শব্দ রয়েছে যা নরবাচক অথবা নারীবাচক বলে ধরা হয়। আবার এমন কিছু বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দ রয়েছে যা দিয়ে নর বা নারী উভয়কে বোঝায়। বিশেষ্য ও বিশেষণের এই নর-নারীভেদের নাম লিঙ্গ। ব্যাকরণে শব্দের নর ও নারীবাচকতাকে সংক্ষেপে ‘পুং’ ও ‘স্ত্রী’ দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নরবাচক শব্দ পুঁলিঙ্গ, যথা: পিতা, পুত্র ইত্যাদি। নারীবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, যথা: মাতা, কন্যা ইত্যাদি। নরবাচক ও নারীবাচক উভয়কে বোঝায় এমন সঙ্গীব বিশেষ্য শব্দকে উভলিঙ্গ বলে, যথা: সন্তান, মহী ইত্যাদি। আবার নরবাচক বা নারীবাচক কোনোটাকেই বোঝায় না এমন অঙ্গীব বিশেষ্য শব্দকে ক্লীবলিঙ্গ বলে, যথা: ঘর, গাড়ি, টেবিল ইত্যাদি।

সাধারণ নারীবাচক শব্দ দুই ধরনের: পত্নীবাচক এবং অপত্নীবাচক। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বোঝালে পত্নীবাচক হয়। যেমন - পিতা-মাতা, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি, জেলে-জেলেনি, গুরু-গুরুপত্নী ইত্যাদি। অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না বোঝালে অপত্নীবাচক হয়। যেমন - খোকা-খুকি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, নেতা-নেত্রী, পাগল-পাগলি।

কিছু শব্দ রয়েছে যা নিত্য নরবাচক ও নিত্য নারীবাচক। নিত্য নরবাচকের উদাহরণ: কৃতদার, অকৃতদার। নিত্য নারীবাচকের উদাহরণ: সতীন, বিধবা।

নরবাচক শব্দ থেকে নারীবাচক শব্দগঠন

প্রত্যয় যোগে

নরবাচক শব্দকে নারীবাচক শব্দে পরিবর্তন করতে সাধারণত কিছু প্রত্যয় যোগ করতে হয়। এ রকম কয়েকটি প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখানো হলো:

- আ প্রত্যয়: বৃক্ষ-বৃক্ষা, প্রিয়-প্রিয়া, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা।
- ই প্রত্যয়: দাদা-দাদি, জেঠা-জেঠি, পাগল-পাগলি।
- ইনি প্রত্যয়: কাঙ্গাল-কাঙ্গালিনি, বাঘ-বাঘিনি।
- ইনী প্রত্যয়: বিজয়ী-বিজয়ীনী, যোগী-যোগীনী, তেজবী-তেজবীনী।
- ঈ প্রত্যয়: কিশোর-কিশোরী, নর-নারী, সুন্দর-সুন্দরী।
- নি প্রত্যয়: জেলে-জেলেনি, বেদে-বেদেনি, ধোপা-ধোপানি।
- বতী প্রত্যয়: গুণবান-গুণবতী, পুণ্যবান-পুণ্যবতী।
- মতী প্রত্যয়: বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, শ্রীমান-শ্রীমতী।

এছাড়া ‘অক’ প্রত্যয় দিয়ে গঠিত নরবাচক শব্দকে নারীবাচক করার সময়ে ‘অক’-এর জায়গায় ‘-ইকা’ হয়। যেমন - পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গায়ক-গায়িকা।

নারী-নির্দেশক শব্দ যোগে

কিছু ক্ষেত্রে নারী-নির্দেশক শব্দ যোগ করে নারীবাচক শব্দ তৈরি করা হয়।

যেমন - লোক-স্ত্রীলোক, শ্রমিক-নারী শ্রমিক, ছেলে-ছেলে বউ।

কিছু ক্ষেত্রে নর-নির্দেশক শব্দের বদলে নারী-নির্দেশক শব্দ যোগ করে নারীবাচক শব্দ তৈরি করা হয়।

যেমন - মন্দা বিড়াল - মাদি বিড়াল, ভাইপো - ভাইবি।

স্বতন্ত্র শব্দে

কিছু নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল থাকে না।

যেমন - ভাই-বোন, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, বৱ-কনে, বাদশা-বেগম।

বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাকে নারীবাচক করা হয় না। যেমন -

নার্সিস আখতার একজন সহকারী শিক্ষক।

নমিতা রায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক টিক (✓) দাও।

১. বিশেষ্য ও বিশেষণের নারী ও নরভেদের নাম কী?

ক. বচন খ. নির্দেশক গ. বলক ঘ. লিঙ্গ

২. নিচের কোন শব্দটি উভলিঙ্গ প্রকাশক?

ক. সন্তান খ. ভেড়ি গ. ছাত্র ঘ. ঘর

৩. 'ক্লীব লিঙ্গ' শব্দ কোনটি?

ক. গাড়ি খ. মন্ত্রী গ. মানুষ ঘ. পাখি

৪. কোন শব্দটি অপন্নীবাচক?

ক. মাতা খ. দাদি গ. চাচি ঘ. শিক্ষিকা

৫. নিচের কোনটি নিত্য নরবাচক শব্দ?

ক. কৃতদার খ. ছেলে গ. নেতা ঘ. বাবা

৬. নিচের কোনটি নিত্য নারীবাচক শব্দ?

ক. শিক্ষিকা খ. জেলেনি গ. মেয়ে ঘ. সতীন

৭. '-অক' প্রত্যয় দিয়ে গঠিত নরবাচক শব্দকে নারীবাচক করার সময়ে '-অক' এর জায়গায় কী হয়?

ক. -একা খ. -ওকা গ. -ইকা ঘ. -আকা

৮. নিচের কোন নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল নেই?

ক. বেগম খ. ভাইবি গ. ছেলে বউ ঘ. গায়িকা

পরিচ্ছেদ ১৬

সংখ্যাবাচক শব্দ

যেসব শব্দ দিয়ে সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে সংখ্যাবাচক শব্দ বা সংখ্যাশব্দ বলে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ – এগুলো এখানে কথায় লেখা হয়েছে। আবার বিশেষ কিছু বর্ণ বা সংকেত দিয়ে এগুলো প্রকাশ করা যায়, যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ – এগুলো এখানে আঙ্কে বা সংখ্যাবর্ণে লেখা হয়েছে। দুর্বৃত্ত, দৈর্ঘ্য, আয়তন, খণ্ড, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপের ক্ষেত্রে সংখ্যাশব্দের ব্যাপক ব্যবহার হয়।

সংখ্যাশব্দ দুই রকমের: ক্রমবাচক ও পূরণবাচক। ক্রমবাচক, যথা: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। পূরণবাচক, যথা: প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম।

১. ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ

একের পর এক যে সংখ্যাগুলো আসে, সেগুলো ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ। যেমন – ১ (এক), ২ (দুই), ৩ (তিন), ৪ (চার), ৫ (পাঁচ), ৬ (ছয়), ৭ (সাত), ৮ (আট), ৯ (নয়), ১০ (দশ), ১১ (এগারো), ১২ (বারো), ১৩ (তেরো), ১৪ (চোদ), ১৫ (পনেরো), ১৬ (ষোলো), ১৭ (সতেরো), ১৮ (আঠারো), ১৯ (উনিশ), ২০ (বিশ) ইত্যাদি।

ক্রমবাচক সংখ্যাবর্ণের সুবিধা হলো এতে ১ থেকে ৯ এবং ০ দিয়ে অসীম সংখ্যার পূর্ব পর্যন্ত ক্রম তৈরি করা যায়।

ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দের এক বা একাধিক প্রতিশব্দ রয়েছে। এগুলো কখনো স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়, কখনো সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন ‘দুই’ সংখ্যাশব্দের প্রতিশব্দ ‘ৰি’, ‘দু’, এবং ‘দো’। ‘তিন’ সংখ্যাশব্দের প্রতিশব্দ ‘ত্ৰি’ এবং ‘তে’।

২. পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ

পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ দিয়ে কোনো সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান ও পরিমাণকে বোঝায়। যেমন ‘এক’ সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান ‘প্রথম’, ‘প্রথমা’, ‘পহেলা’ ইত্যাদি। এগুলোকে পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ বলে।

পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ তিন ধরনের হয়: ১. সাধারণ পূরণবাচক, ২. তারিখ পূরণবাচক ও ৩. ভঞ্জৎশ পূরণবাচক।

সাধারণ পূরণবাচক

ক্রমবাচক সংখ্যার পর্যায় বা অবস্থানকে নির্দেশ করতে সাধারণ পূরণবাচক হয়ে থাকে। যেমন – প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ বা এগারোতম ইত্যাদি। সাধারণ পূরণবাচক সংক্ষিঙ্গ রূপেও লেখা যায়। যেমন – ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ইত্যাদি।

১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যার পূর্ণ পূরণবাচক ও সংক্ষিপ্ত পূরণবাচক দুই রকম: একাদশ (১১শ) ও এগারোতম (১১তম), দ্বাদশ (১২শ) ও বারোতম (১২তম), ত্রয়োদশ (১৩শ) ও তেরোতম (১৩তম), চতুর্দশ (১৪শ) ও চৌদ্দতম (১৪তম), পঞ্চদশ (১৫শ) ও পনেরোতম (১৫তম), ষোড়শ (১৬শ) ও ষোলোতম (১৬তম), সপ্তদশ (১৭শ) ও সতেরোতম (১৭তম), অষ্টাদশ (১৮শ) ও আঠারোতম (১৮তম)।

১৯ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার সংক্ষিপ্ত পূরণবাচকে শুধু 'তম' প্রত্যয় যোগ করা হয়। যথা: উনিশতম বা উনবিংশতিতম (১৯তম), বিশতম বা বিংশতিতম (২০তম), একুশতম বা একবিংশতিতম (২১তম), আটাশতম বা আষ্টাবিংশতিতম (২৮তম), উনপঞ্চাশতম বা উনপঞ্চাশতম (৪৯তম), আশিতম বা অশীতিতম (৮০তম), নৰাইতম বা নৰতিতম (৯০তম), নিরানৰাইতম বা নবনবতিতম (৯৯তম) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সাধারণ পূরণবাচকের নামীবাচক রূপের ব্যবহার আছে। যেমন – প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থা (৪য়া), পঞ্চমী (৫য়া), ষষ্ঠী (৬য়া), সপ্তমী (৭য়া), অষ্টমী (৮য়া), নবমী (৯য়া), দশমী (১০য়া), একাদশী (১১শী), দ্বাদশী (১২শী), ত্রয়োদশী (১৩শী), চতুর্দশী (১৪শী), পঞ্চদশী (১৫শী), ষোড়শী (১৬শী), সপ্তদশী (১৭শী), অষ্টাদশী (১৮শী) ইত্যাদি।

তারিখ পূরণবাচক

বাংলা ভাষায় তারিখ নির্দেশ করার জন্য সংখ্যাশব্দের পূরণবাচকে নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা: পহেলা বা পঞ্জলা (১লা), দোসরা (২রা), তেসরা (৩রা), চৌঠা (৪ঠা), পাঁচই (৫ই), ছয়ই (৬ই), সাতই (৭ই), আটই (৮ই), নয়ই (৯ই), দশই (১০ই), এগারোই (১১ই), বারোই (১২ই), তেরোই (১৩ই), চৌদ্দই (১৪ই), পনেরোই (১৫ই), ষোলোই (১৬ই), সতেরোই (১৭ই), আঠারোই (১৮ই), উনিশে (১৯শে), বিশে (২০শে), একুশে (২১শে), বাইশে (২২শে), তেইশে (২৩শে), চারিশে (২৪শে), পঞ্চিশে (২৫শে), ছারিশে (২৬শে), সাতাশে (২৭শে), আটাশে (২৮শে), উনত্রিশে (২৯শে), ত্রিশে (৩০শে), একত্রিশে (৩১শে)।

ভগ্নাংশ পূরণবাচক

কখনো পূর্ণসংখ্যার থেকে খানিকটা কম বা খানিকটা বেশি বোঝাতে ভগ্নাংশ পূরণবাচক হয়। যেমন – আধ, সাড়ে, পোয়া, সোয়া, দেড়, আড়াই, তেহাই ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. নিচের কোনটি সংখ্যাবর্গ?

- ক. পাঁচ খ. ৩ গ. আড়াই ঘ. পঠা

২. নিচের কোনটি সংখ্যাশৰ্ক?

- ক. বারো খ. ২৩৩ গ. দুজন ঘ. একাকী

৩. একের পর এক যে সংখ্যাগুলো আসে সেগুলোকে কী বলে?

- ক. অম্বাচক খ. পূরণবাচক গ. সংখ্যাবাচক ঘ. তারিখবাচক

৪. নিচের কোনটি পূরণবাচক সংখ্যাশৰ্ক?

- ক. পহেলা খ. সাত গ. সতেরো ঘ. দ্বি

৫. নিচের কোনটি পূরণবাচক সংখ্যাশৰ্ক নয়?

- ক. উনিশে খ. আড়াই গ. আশি ঘ. তেহাই

৬. সাধারণ পূরণবাচকের নারীবাচক ক্লপের ব্যবহার আছে কোনটিতে?

- ক. দশমী খ. মোড়শ গ. আটাশে ঘ. মোলই

৭. পূর্ণসংখ্যার থেকে খানিকটা কম বা বেশি বোকালে কী ধরনের পূরণবাচক হয়?

- ক. গুণিতক পূরণবাচক খ. ভগ্নাংশ পূরণবাচক

- গ. তারিখ পূরণবাচক ঘ. সাধারণ পূরণবাচক

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা শব্দভাষারকে বিভিন্ন বিবেচনায় ভাগ করা যায়: ক. উৎস বিবেচনা, খ. গঠন বিবেচনা, গ. পদ বিবেচনা।

ক. উৎস বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

উৎস বিবেচনায় বাংলা শব্দভাষারকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়: তৎসম, তত্ত্ব, দেশি ও বিদেশি। এর মধ্যে তৎসম ও তত্ত্ব শ্রেণিকে নিজস্থ উৎসের এবং দেশি ও বিদেশি শ্রেণিকে আগন্তুক উৎসের শব্দ হিসেবে গণ্য করা হয়।

১. তৎসম শব্দ: প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষ্য থেকে বিবরিত যেসব বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংস্কৃত ভাষার শব্দের অনুরূপ সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। যথা: পৃথিবী, আকাশ, অহ, বৃক্ষ। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে গঠিত পারিভাষিক শব্দকেও তৎসম শব্দ বলা হয়। যথা: অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, মহাপরিচালক, সচিবালয় ইত্যাদি।
২. তত্ত্ব শব্দ: প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষ্য থেকে বিবরিত যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় একেবারেই ব্রত্তা, সেগুলোকে তত্ত্ব শব্দ বলা হয়। উদাহরণ: হাত, পা, কান, নাক, জিভ, দাঁত; হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখি, কুমির ইত্যাদি।
৩. দেশি শব্দ: বাংলা অধ্বরের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, এগুলোকে দেশি শব্দ বলা হয়। উদাহরণ: কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, ডাব, টোপৰ, ঢেকি ইত্যাদি।
৪. বিদেশি শব্দ: ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক শব্দগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে রয়েছে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফরাসি, গুলন্দাজ, তুর্কি, হিন্দি ইত্যাদি।

উদাহরণ -

আরবি: আল্লাহ, হারাম, হালাল, হজ, জাকাত, ঈদ, উকিল, কলম, নগদ, বাকি, আদালত, তারিখ, হালুয়া ইত্যাদি।

ফারসি: খোদা, দোজখ, নামাজ, রোজা, চশমা, তোশক, দোকান, কারখানা, আমদানি, জানোয়ার ইত্যাদি।

ইংরেজি: চেয়ার, টেবিল, কলেজ, স্কুল, পেনসিল, ব্যাগ, ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যাসপাতাল, বাস্কেটবল বোল্টল ইত্যাদি।

পর্তুগিজ: আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদরি, বালতি ইত্যাদি।

ফরাসি: কুপন, ডিপো, রেন্টের্বাঁ, আঁতেল, কার্তুজ ইত্যাদি।

গুলন্দাজ: হরতন, ইফাপন, রাইতন, টেকা, তুর্কপ ইত্যাদি।

তুর্কি: চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।

হিন্দি: পানি, ধোলাই, লাগাতার, সমবোতা।

খ. গঠন বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠন বিবেচনায় বাংলা শব্দকে মৌলিক এবং সাধিত – এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. মৌলিক শব্দ: যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করলে অর্থপূর্ণ কোনো অংশ থাকে না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন – গাছ, পাখি, ফুল, হাত, গোলাপ ইত্যাদি।
২. সাধিত শব্দ: যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে এক বা একাধিক অর্থপূর্ণ অংশ থাকে, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। উপর্যুক্ত বা প্রত্যয় যোগ করে অথবা সমাস প্রক্রিয়ায় সাধিত শব্দ তৈরি হয়। যেমন – পরিচালক, গরমিল, সম্পাদকীয়, সংসদ সদস্য, নীলাকাশ ইত্যাদি। শব্দের দ্বিতীয় করেও সাধিত শব্দ হয়ে থাকে। যেমন – ফিসফিস, ধূমাধুম ইত্যাদি।

গ. পদ বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

শব্দ যখন বাকে ব্যবহৃত হয়, তখন তার নাম হয় পদ। বাকের অন্তর্গত এসব শব্দ বা পদকে মোট আটটি শ্রেণিতে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়: ১. বিশেষ্য, ২. সর্বনাম, ৩. বিশেষণ, ৪. ক্রিয়া, ৫. ক্রিয়াবিশেষণ, ৬. অনুসর্গ, ৭. যোজক ও ৮. আবেগ।

বাকে প্রয়োগের উপরে শব্দশ্রেণির এই আট রূক্ম বিভাজন চূড়ান্ত হয়ে থাকে। যেমন, যখন বলা হয়: 'লাল থেকে নীল ভালো, তখন 'লাল' এটি বিশেষ্য পদ। কিন্তু যখন বলা হয়: আমি একটি লাল ফুল তুলেছি – তখন 'লাল' বিশেষণ পদ।

পদ বিবেচনায় শব্দের এসব শ্রেণিতে নিয়ে পরবর্তী পরিচেছেন্ডগুলোতে আলোচনা করা হলো।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. উৎস বিবেচনায় বাংলা শব্দভাস্তুর কত প্রকার?
ক. তিনি খ. চার গ. পাঁচ ঘ. ছয়
২. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?
ক. এহ খ. কুড়ি গ. কলম ঘ. পাখি
৩. কোন শ্রেণির বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংক্ষিতের অনুরূপ?
ক. তৎসম খ. তত্ত্ব গ. দেশি ঘ. বিদেশি
৪. গঠন বিবেচনায় শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা –
ক. প্রত্যয় ও বিভক্তি খ. ধ্বনি ও বর্ণ গ. মৌলিক ও সাধিত ঘ. তৎসম ও তত্ত্ব
৫. পদ বিবেচনায় শব্দ কত প্রকার?
ক. পাঁচ খ. সাত গ. আট ঘ. দশ
৬. কোনটি পদের নাম নয়?
ক. আবেগ খ. অনুসর্গ গ. যোজক ঘ. পদাণু

পরিচ্ছেদ ১৮

বিশেষ

যেসব শব্দ দিয়ে ব্যক্তি, প্রাণী, স্থান, বস্তু, ধারণা ও গুণের নাম বোঝায়, সেগুলোকে বিশেষ বলে। যেমন –
নজরচৰ্ক, বাঘ, ঢাকা, ইট, ভোজন, সততা ইত্যাদি।

বিশেষের শ্রেণিবিভাগ

বিশেষ সাধারণত ছয় প্রকার: ১. নাম-বিশেষ্য, ২. জাতি-বিশেষ্য, ৩. বস্তু-বিশেষ্য, ৪. সমষ্টি-বিশেষ্য, ৫.
গুণ-বিশেষ্য এবং ৬. ক্রিয়া-বিশেষ্য।

১. নাম-বিশেষ্য: ব্যক্তি, স্থান, দেশ, কাল, সৃষ্টি প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নামকে নাম-বিশেষ্য বলা হয়। যেমন –

ব্যক্তিনাম: হাবিব, সজল, লতা, শম্পা।

স্থাননাম: ঢাকা, বাংলাদেশ, হিমালয়, পদ্মা।

কালনাম: সোমবার, বৈশাখ, জানুয়ারি, রমজান।

সৃষ্টিনাম: গীতাঞ্জলি, সপ্তিতা, ইন্দ্রেফাক, অপরাজেয় বাংলা।

২. জাতি-বিশেষ্য: জাতি-বিশেষ্য সাধারণ-বিশেষ্য নামেও পরিচিত। এ ধরনের বিশেষ্য নির্দিষ্ট কোনো
নামকে না বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীর সাধারণ নামকে বোঝায়। যেমন – মানুষ, গরু, ছাগল, ঘূঁঁজু, ফল,
নদী, সাগর, পর্বত ইত্যাদি।

৩. বস্তু-বিশেষ্য: কোনো দ্রব্য বা বস্তুর নামকে বস্তু-বিশেষ্য বলে। যেমন – ইট, লবণ, আকাশ, টেবিল, বই
ইত্যাদি।

৪. সমষ্টি-বিশেষ্য: এ ধরনের বিশেষ্য দিয়ে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন – জনতা, পরিবার,
ঝাঁক, বাহিনী, মিছিল ইত্যাদি।

৫. গুণ-বিশেষ্য: গুণগত অবস্থা ও ধারণার নামকে গুণ-বিশেষ্য বলে। যেমন – সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব,
দীনতা, ধৈর্য ইত্যাদি।

৬. ক্রিয়া-বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে।
যেমন – পঠন, ভোজন, শয়ন, করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উভয়ে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. যে সব শব্দ দিয়ে কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে কী বলে?

ক. বিশেষ্য খ. অনুসর্গ গ. যোজক ঘ. সর্বনাম

২. যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো কাজের নাম বোঝায়, তাকে বলে –

ক. বস্তু-বিশেষ্য খ. সমষ্টি-বিশেষ্য
গ. গুণ-বিশেষ্য ঘ. ক্রিয়া-বিশেষ্য

৩. 'পদ্মা' কোন জাতীয় নাম-বিশেষ্য?

ক. সৃষ্টিনাম খ. কালনাম গ. হাননাম ঘ. ব্যক্তিনাম

৪. জাতি-বিশেষ্যের উদাহরণ কোনটি?

ক. আকাশ খ. নদী গ. পদ্মা ঘ. হিমালয়

৫. নিচের কোনগুলি সমষ্টি-বিশেষ্যের উদাহরণ?

ক. পরিবার ও মিছিল খ. নদী ও সাগর গ. সঁথিতা ও ইন্ডেফাক ঘ. আকাশ ও বই

৬. গুণ-বিশেষ্য কোনটি?

ক. সাগর খ. সততা গ. ভোজন ঘ. বাহিনী

৭. নিচের কোনটি কালনাম শ্রেণির নাম-বিশেষ্য?

ক. বৈশাখ খ. হিমালয় গ. আকাশ ঘ. পর্বন

পরিচ্ছেদ ১৯

সর্বনাম

বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকে সর্বনাম শব্দ বলে। বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য যে ভূমিকা পালন করে, সর্বনাম অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। যেমন - “শিমুল মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করত। তাই সে পরীক্ষায় ভালো করেছে।” দ্বিতীয় বাক্যের ‘সে’ প্রথম বাক্যের ‘শিমুল’-এর পরিবর্তে বসেছে। বিশেষ্য শব্দের মতো সর্বনাম শব্দের সঙ্গেও বিভক্তি, নির্দেশক, বচন প্রভৃতি যুক্ত হয়।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

সর্বনামকে নিচের নয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম: ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ব্যক্তিনামের পরিবর্তে বসে। এই সর্বনাম তিনি ধরনের:

বঙ্গ পক্ষের সর্বনাম: আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।

শ্রোতা পক্ষের সর্বনাম: তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা, তোমাকে, তোকে, আপনাকে ইত্যাদি।

অন্য পক্ষের সর্বনাম: সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওর, ওদের ইত্যাদি।

শ্রোতাপক্ষ ও অন্যপক্ষের সর্বনামকে মর্যাদা অনুযায়ী তিনি ভাগে ভাগ করা হয়: সাধারণ সর্বনাম (তুমি, সে), মানী সর্বনাম (আপনি, তিনি, ইনি, উনি) ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম (তুই, এ, ও)।

২. আত্মবাচক সর্বনাম: কর্তা নিজেই কোনো কাজ করেছে, এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য এ ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। যেমন - নিজে (সে নিজে অক্টা করছে), স্থাং ইত্যাদি।

৩. নির্দেশক সর্বনাম: যে সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। যেমন - নিকট নির্দেশক: এ, এই, এরা, ইনি; দূর নির্দেশক: ও, ওই, ওরা, উনি।

৪. অনিদিষ্ট সর্বনাম: অনিদিষ্ট বা পরিচয়ীন কিছু বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে অনিদিষ্ট সর্বনাম বলে। যেমন - কেউ, কোথাও, কিছু, একজন (একজন এসে খবরটা দেয়) ইত্যাদি।

৫. প্রশ়ংস্কবাচক সর্বনাম: প্রশ়ংস্ক তৈরির জন্যে প্রশ়ংস্কবাচক সর্বনাম প্রয়োগ করা হয়। যেমন - কে, কারা, কাকে, কার, কী (কী দিয়ে ভাত খায়?) ইত্যাদি।

৬. সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন - যারা-তারা, যে-সে, যেমন-তেমন (যেমন কর্ম তেমন ফল) ইত্যাদি।

৭. পারস্পরিক সর্বনাম: দুই পক্ষের সহযোগিতা বা নির্ভরতা বোঝাতে পারস্পরিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন - পরস্পর, নিজেরা নিজেরা (যাবতীয় দুই নিজেরা নিজেরা মিটাট করে) ইত্যাদি।

৮. সকলবাচক সর্বনাম: ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝাতে সকলবাচক সর্বনাম হয়। যেমন - সবাই, সকলে, সকলকে, সবার, সমস্ত, সব ইত্যাদি।

৯. অন্যবাচক সর্বনাম: নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনিদিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে অন্যবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন
— অন্য, অপর, পর, অমুক ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উভয়ের টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকে কী শব্দ বলে?

ক. সর্বনাম খ. বিশেষণ গ. অনুসর্গ ঘ. ক্রিয়া

২. সর্বনামকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. পাঁচ খ. ছয় গ. নয় ঘ. এগারো

৩. নিচের কোনটি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম?

ক. একজন খ. উনি গ. দ্বয়ঁ ঘ. আমি

৪. কর্তা নিজেই কাজটি করেছেন, তা বোঝালে কোন সর্বনাম হয়?

ক. ব্যক্তিবাচক খ. আত্মবাচক গ. নির্দেশক ঘ. অনিদিষ্ট

৫. সাপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ কোনটি?

ক. অন্য খ. এ গ. যে-সে ঘ. পরম্পর

৬. নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনিদিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে কোন সর্বনাম ব্যবহৃত হয়?

ক. অনিদিষ্ট খ. আত্মবাচক গ. অন্যবাচক ঘ. সফলবাচক

৭. কোন সর্বনাম নেকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে?

ক. সাপেক্ষ সর্বনাম খ. অনিদিষ্ট সর্বনাম গ. আত্মবাচক সর্বনাম ঘ. নির্দেশক সর্বনাম

পরিচ্ছেদ ২০

বিশেষণ

যে শব্দ দিয়ে সাধারণত বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন – সুন্দর ফুল, বাজে কথা, পদ্ধতি টাকা, হাজার সমস্যা, তাজা মাছ।

বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ

কোন কোন শ্রেণির শব্দকে বিশেষিত করে, সেই অনুযায়ী বিশেষণকে আলাদা করা যায়। বিশেষণ শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে, সেই বিবেচনায়ও বিশেষণকে ভাগ করা সম্ভব। এছাড়া বাক্যের মধ্যে বিশেষণটির অবস্থান কোথায় তা দিয়েও বিশেষণকে চিহ্নিত করা যায়। এসব বিবেচনায় বিশেষণকে নানা নামে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

- বর্ণবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে রং নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা – এখানে ‘নীল’, ‘সবুজ’ বা ‘লাল’ হলো বর্ণবাচক বিশেষণ।
- গুণবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – চালাক হেলে, ঠাভা পানি – এখানে ‘চালাক’ ও ‘ঠাভা’ হলো গুণবাচক বিশেষণ।
- অবস্থাবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে অবস্থা বোঝায়, তাকে অবস্থাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ – এখানে ‘চলন্ত’ ও ‘তরল’ অবস্থাবাচক বিশেষণ।
- ক্রমবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে ক্রমসংখ্যা বোঝায়, তাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – এক টাকা, আট দিন – এখানে ‘এক’ ও ‘আট’ ক্রমবাচক বিশেষণ।
- পূরণবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে পূরণসংখ্যা বোঝায়, তাকে পূরণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান – এখানে ‘তৃতীয়’ ও ‘৩৪তম’ পূরণবাচক বিশেষণ।
- পরিমাণবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে পরিমাণ বা আয়তন বোঝায়, তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – আধা কেজি চাল, অনেক লোক – এখানে ‘আধা কেজি’ ও ‘অনেক’ পরিমাণবাচক বিশেষণ।
- উপাদানবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে উপাদান নির্দেশ করে, তাকে উপাদানবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – রেলে মাটি, পাথুরে মৃত্তি – এখানে ‘রেলে’ ও ‘পাথুরে’ উপাদানবাচক বিশেষণ।
- প্রশ্নবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে প্রশ্নবাচকতা নির্দেশিত হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – কেমন গান? কতক্ষণ সময়? – এখানে ‘কেমন’ ও ‘কতক্ষণ’ প্রশ্নবাচক বিশেষণ।
- নির্দিষ্টতাবাচক:** যে বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – এই দিনে, সেই সময় – এখানে ‘এই’ ও ‘সেই’ নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ।
- ভাববাচক বিশেষণ:** যেসব বিশেষণ বাক্যের অন্তর্গত অন্য বিশেষণকে বিশেষিত করে, সেসব বিশেষণকে ভাববাচক বিশেষণ বলে। যেমন – ‘খুব ভালো খবর’ ও ‘গাড়িটা বেশ জোরে চলছে’ – এসব বাক্যে ‘খুব’ এবং ‘বেশ’ ভাববাচক বিশেষণ।

পরিচ্ছেদ ২১

ক্রিয়া

বাকেয় উদ্দেশ্য বা কর্তা কী করে বা কর্তার কী ঘটে বা হয়, তা নির্দেশ করা হয় যে পদ দিয়ে তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন –

রাজীব খেলছে।

বৃষ্টি হতে পারে।

ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন শুল্ক হয়ে ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন –

পড় + ই = পড়ি, পড় + এ = পড়ে, পড় + ছে = পড়ছে, পড় + বে = পড়বে

পক্ষ (পুরুষ) এবং কাল ভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়। যেমন –

পক্ষভেদ: আমি পড়ি, আমরা পড়ি, তুমি পড়ো, তোমরা পড়ো, সে পড়ে, তারা পড়ে।

কালভেদ: আমি পড়ি, আমি পড়ছি, আমি পড়েছি, আমি পড়ছিলাম, আমি পড়ছিলাম, আমি পড়ব।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে, বাকেয় কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে এবং গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া দুই প্রকার:

১. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন – ভালো করে পড়াশোনা করবে।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া ভাব সম্পূর্ণ করতে পারে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন – ভালো করে পড়াশোনা করলে ভালো ফল হবে।

অসমাপিকা ক্রিয়া তিনি ধরনের: ১. ভূত অসমাপিকা, ২. ভাবী অসমাপিকা এবং ৩. শর্ত অসমাপিকা।

যথা:

ভূত অসমাপিকা: সে গান করে আনন্দ পায়।

ভাবী অসমাপিকা: সে গান শিখতে রাজশাহী যায়।

শর্ত অসমাপিকা: গান করলে তার মন ভালো হয়।

খ. বাকেয়ের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিনি প্রকার:

১. অকর্মক ক্রিয়া: বাকেয় ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন – সে মুমায়।

এই বাকেয় কোনো কর্ম নেই।

২. সকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন - সে বই পড়ছে।

এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন - শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।

এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।

গ. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়া পাঁচ রকম:

১. সরল ক্রিয়া: একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন - সে লিখছে। ছেলেরা মাঠে খেলছে। এখানে লিখছে ও খেলছে - এগুলো সরল ক্রিয়া।

২. প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন - তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন; রাখাল গুরুকে ঘাস খাওয়ায় - এখানে 'করাচ্ছেন' ও 'খাওয়ায়' প্রযোজক ক্রিয়া।

৩. নামক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধরন্যাত্মক শব্দের শেষে -আ বা -আনো প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন - বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে -আনো যুক্ত হয়ে হয় চমকানো; আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়; বিশেষণ কম শব্দের সঙ্গে -আ যুক্ত হয়ে হয় কমা: বাজারে সবাজির দাম কমছে না; ধরন্যাত্মক ছটফট শব্দের সঙ্গে -আনো যুক্ত হয়ে হয় ছটফটানো: জবাই করা মুরগি উঠানে ছটফটায়।

৪. সংযোগ ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধরন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। করা ক্রিয়া যোগে: গান করা, গরম করা, ঠেন্ঠন করা, ব্যাট করা; কাটা ক্রিয়া যোগে: সাঁতার কাটা, বিপদ কাটা; হওয়া ক্রিয়া যোগে: উদয় হওয়া, বড়ো হওয়া, রাজি হওয়া; দেওয়া ক্রিয়া যোগে: কথা দেওয়া, মন দেওয়া, দোষ দেওয়া; ধরা ক্রিয়া যোগে: ভাঙ্গন ধরা, মরচে ধরা, ক্যাচ ধরা; পাওয়া ক্রিয়া যোগে: লজ্জা পাওয়া, কঁষ পাওয়া, বৃক্ষ পাওয়া; খাওয়া ক্রিয়া যোগে: আছাড় খাওয়া, মার খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া; মারা ক্রিয়া যোগে: উকি মারা, পকেট মারা।

৫. যৌগিক ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন - মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঁবো নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. বাকের উদ্দেশ্য বা কর্তা কী করে বা কর্তার কী ঘটে বা হয় তা কোন পদের দ্বারা নির্দেশিত হয়?
 ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. ক্রিয়া ঘ. যোজক
২. ধাত্র সঙ্গে কী যুক্ত হয়ে ক্রিয়া হয়?
 ক. প্রত্যয় খ. অনুসর্গ গ. বিভক্তি ঘ. উপসর্গ
৩. ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয় –
 ক. পুরুষ ভেদে খ. কাল ভেদে গ. বচন ভেদে ঘ. ক ও খ উভয়ই
৪. নিচের কোন বাক্যটিতে অসমাপিকা ক্রিয়া নেই?
 ক. সে গান করে আনন্দ পায় খ. রাতের বেলা আকাশে চাঁদ ঘটে
 গ. ভালো করে পড়াশোনা করবে ঘ. পড়াশোনা করলে ভালো ফল হবে
৫. কোনটি অসমাপিকা ক্রিয়ার ধরন?
 ক. শর্ত খ. ভূত গ. ভাবী ঘ. সর্বগুলোই
৬. নিচের বাক্যগুলোতে কোনটি অকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ?
 ক. সে বই পড়ছে গ. তিনি আমাকে বই দিলেন
 খ. লতা ঘুমায় ঘ. সে গল্প লিখছে
৭. অন্যকে দিয়ে করা বোঝালে কোন ক্রিয়া হয়?
 ক. সরল ক্রিয়া গ. প্রযোজক ক্রিয়া খ. নাম ক্রিয়া ঘ. যৌগিক ক্রিয়া
৮. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠন করে তাকে কী বলে?
 ক. সংযোগ ক্রিয়া খ. নাম ক্রিয়া গ. সরল ক্রিয়া ঘ. যৌগিক ক্রিয়া
৯. নিচের কোনটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ?
 ক. এগিয়ে চলা খ. উদয় হওয়া গ. ডিগবাজি খাওয়া ঘ. বৃক্ষ পাওয়া
১০. ধৰন্যাত্মক নামক্রিয়ার উদাহরণ আছে কোন বাক্যে?
 ক. চিঠিটা ওকে দিয়ে লেখাতে হবে।
 খ. পাখিটা ছটফটাচ্ছে।
 গ. ঘৰ্ষ্টা বেজে উঠল।
 ঘ. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

পরিচ্ছেদ ২২

ক্রিয়াবিশেষণ

যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। নিচের বাক্য তিনটির নিম্নরেখ শব্দগুলো
ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ:

ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়।

লোকটি ধীরে হাঁটে।

মেয়েটি গুন্ডুনিয়ে গান করছে।

অনেক সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে '-এ', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি এবং '-ভাবে', '-বশত', '-মতো'
ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবিশেষণ তৈরি হয়। যেমন - ততক্ষণে, দ্রুতগতিতে, শাস্তভাবে, ভাস্তবশত,
আচ্ছামতো ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: কোনো ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়, ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ তা নির্দেশ করে।

যেমন -

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

ঠিকভাবে চললে কেউ কিছু বলবে না।

২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: এই ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল নির্দেশ করে। যেমন -

আজকাল ফুলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি।

যথাসময়ে সে হাজির হয়।

৩. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ। যেমন -

মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়

তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

৪. নেতৃত্বাচক ক্রিয়াবিশেষণ: না, নি ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়ার নেতৃত্বাচক অবস্থা বোঝায়। এগুলো সাধারণত

ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন -

সে এখন যাবে না।

তিনি বেড়াতে যাননি।

এমন কথা আমার জানা নেই।

৫. পদার্থ ক্রিয়াবিশেষণ: বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন না করলেও 'কি', 'যে', 'বা', 'না', 'তো'

প্রত্তি পদার্থ ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে। যেমন -

কি: আমি কি যাব?

যে: খুব যে বলেছিলেন আসবেন!

বা: কখনো বা দেখা হবে।
 না: একটু ঘুরে আসুন না, ভালো লাগবে।
 তো: মরি তো মরব।

গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে একপদী ও বহুপদী – এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়:
 একপদী ক্রিয়াবিশেষণ: আঙ্গে, জোরে, চেঁচিয়ে, সহজে, ভালোভাবে ইত্যাদি।
 বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ: ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক টিক (✓) দাও।

১. যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে কী বলে?
 ক. ক্রিয়া-বিশেষ্য খ. ক্রিয়াবিশেষণ গ. গুণ-বিশেষ্য ঘ. অনুসর্গ
 ক. তিনি এখানে এসেছিলেন।
 খ. ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়।
 গ. গতকাল তিনি ঘুরে গিয়েছেন।
 ঘ. একটু ঘুরে আসুন না!
৩. ‘মিহিলতি সামনে এগিয়ে যায়’ – বাক্যটিতে কোন ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে?
 ক. ধরনবাচক খ. কালবাচক গ. স্থানবাচক ঘ. পদার্থ
 ক. পদার্থ খ. কালবাচক গ. স্থানবাচক ঘ. ধরনবাচক
৪. ‘কি’, ‘যে’, ‘বা’, ‘তো’ প্রতীক কোন ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ?
 ক. পদার্থ খ. কালবাচক গ. স্থানবাচক ঘ. ধরনবাচক
৫. নিচের কোনটি একপদী ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ?
 ক. জোরে খ. ভয়ে ভয়ে গ. মরতে মরতে ঘ. যায় যায়

পরিচ্ছেদ ২৩

অনুসর্গ

যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে। যেমন -

সে কাজ ছাড়া কিছুই বোবো না। - এই বাক্যে 'ছাড়া' একটি অনুসর্গ।
কোন পর্যন্ত পড়েছে? - এই বাক্যে 'পর্যন্ত' একটি অনুসর্গ।

কয়েকটি অনুসর্গের উদাহরণ:

অপেক্ষা, অবধি, অভিমুখে, আগে, উপরে, করে, কর্তৃক, কাছে, কারণে, ছাড়া, জন্য, তরে, থেকে, দরক্ষণ, দিকে, দিয়ে, দ্বারা, ধরে, নাগাদ, নিচে, পর্যন্ত, পানে, পাশে, পিছনে, প্রতি, বদলে, বনাম, বরাবর, বাইরে, বাদে, বাবদ, বিনা, ব্যতীত, ভিতরে, মতো, মধ্যে, মাঝে, লেগে, সঙ্গে, সম্মুখে, সাথে, সামনে, হতে ইত্যাদি।

যেসব শব্দের পরে অনুসর্গ বসে, সেসব শব্দের সঙ্গে '-কে' '-র', '- ইত্যাদি বিভক্তিও ঘূর্ণ হতে পারে। যেমন -
তোমাকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব।
সে পরীক্ষার জন্য পড়ছে।

অনুসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সাধারণ অনুসর্গ ও ক্রিয়াজাত অনুসর্গ।

সাধারণ অনুসর্গ

যেসব অনুসর্গ ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে তৈরি হয়, সেগুলোকে সাধারণ অনুসর্গ বলে। যেমন -

উপরে: মাথার উপরে নীল আকাশ।

কাছে: কার কাছে গেলে জানা যাবে?

জন্যে: হ্যারানো ঘড়িটার জন্য অনেক কেঁদেছি।

দ্বারা: এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না।

বনাম: আজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা।

ক্রিয়াজাত অনুসর্গ

যেসব অনুসর্গ ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে, সেগুলোকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যেমন -

করে: ভালো করে খেয়ে নাও।

থেকে: ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে পদ্মা নদী পার হতে হয়।

দিয়ে: মন দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার।

ধরে: বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।

বলে: সে সঙ্গে যাবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. অনুসর্গকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

- ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

২. সাধারণ অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে কোনটিতে?

- ক. মাথার উপরে নীল আকাশ। খ. ভালো করে খেয়ে নাও।
 গ. মন দিয়ে লোখাপড়া করো। ঘ. বছদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।

৩. নিচের কোনটিতে ক্রিয়াজাত অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে?

- ক. এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না। খ. কার কাছে গেলে জানা যাবে?
 গ. সবার সামনে থাকবে। ঘ. তুমি আসবে বলে দাঢ়িয়ে আছি।

৪. কোনটি অনুসর্গের উদাহরণ?

- ক. আপন, তুমি খ. বলে, করে গ. অভিমুখে, কাছে ঘ. জোরে, আন্তে

৫. ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে কোন অনুসর্গ?

- ক. ক্রিয়াজাত অনুসর্গ খ. ক্রিয়ামূখী অনুসর্গ
 গ. ক্রিয়াধর্মী অনুসর্গ ঘ. ক্রিয়ালঘৃ অনুসর্গ

পরিচ্ছেদ ২৪

যোজক

পদ, বর্গ বা বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন – এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১. সাধারণ যোজক: এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে। যেমন –

রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।

জলাদি দোকানে যাও এবং পাউরটি কিনে আনো।

২. বিকল্প যোজক: এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন –

লাল বা নীল কলমটা আনো।

চা না-হয় কফি খান।

৩. বিরোধ যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে। যেমন –

এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না।

তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।

৪. কারণ যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ।

যেমন –

জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি।

বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

৫. সাপেক্ষ যোজক: এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

যদি রোদ ওঠে, তবে রওলা দেব।

যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. যোজক কাকে যুক্ত করে?

- ক. পদ খ. বর্গ গ. বাক্য ঘ. সবগুলো

২. বিরোধ যোজক আছে কোন বাক্যে?

- ক. সংখ্যাটি সতেরো কিংবা আঠারো হবে।
 খ. লোকটি শিক্ষিত, তবে সৎ নন।
 গ. যখন বৃষ্টি থাকল, তখন সবাই রওনা হলাম।
 ঘ. দুবার বলেছি, ফলে তৃতীয় বার বলার প্রয়োজন বোধ করিনি।

৩. কোন যোজক কার্যকারণ দেখাতে দৃঢ়ি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়?

- ক. সাধারণ যোজক খ. বিকল্প যোজক গ. কারণ যোজক ঘ. বিরোধ যোজক

৪. কোন যোজক একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়?

- ক. কারণ যোজক খ. বিকল্প যোজক গ. সাপেক্ষ যোজক ঘ. কারণ যোজক

৫. “যদি রোদ ওঠে তবে রওনা দেবো” – বাক্যটি কোন যোজক নির্দেশ করেছে?

- ক. সাধারণ যোজক খ. বিকল্প যোজক গ. বিরোধ যোজক ঘ. সাপেক্ষ যোজক

পরিচ্ছেদ ২৫

আবেগ

মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয় যেসব শব্দ দিয়ে সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলা হয়। এই ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়ে আলগাভাবে বা স্থানভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন – ছি ছি, আহা, বাহ, শাবাশ, হায় হায় ইত্যাদি।

নিচে বিভিন্ন ধরনের আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখানো হলো।

১. সিঙ্কান্ত আবেগ: এ জাতীয় শব্দের সাহায্যে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়।

যেমন –

হ্যাঁ, আমাদের জিততেই হবে।

বেশ, তবে যাওয়াই যাক।

২. প্রশংসা আবেগ: এ ধরনের শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

শাবাশ! এমন খেলাই তো চেয়েছিলাম।

বাহ, চমৎকার লিখেছ।

৩. বিরক্তি আবেগ: এ ধরনের শব্দ অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

ছি ছি! এরকম কথা তার মুখে মানায় না।

জ্বালা! তোমাকে নিয়ে আর পারি না!

৪. আতঙ্ক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন –

উহ, কী বিপদে পড়া গেল।

বাপরে বাপ! কী ভয়ঙ্কর ছিল রাক্ষসটা।

৫. বিশ্যয় আবেগ: এ ধরনের শব্দ বিশ্যিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন –

আরে! তুমি আবার কখন এলে?

আহ, কী চমৎকার দৃশ্য!

৬. করুণা আবেগ: এ ধরনের শব্দ করুণা, মায়া, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন –

আহা! বেচারার এত কষ্ট।

হায় হায়! ওর এখন কী হবে!

୭. ସମୋଧନ ଆବେଗ: ଏ ଧରନେର ଶବ୍ଦ ସମୋଧନ ବା ଆହୁତି କରାର ଫେରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଥିଲା । ଯେମନ -

ହେ ବନ୍ଦୁ, ତୋମାକେ ଅଭିନନ୍ଦନ ।

ଓଗୋ, ତୋରା ଜୟଧବନି କରୋ ।

୮. ଅଳଙ୍କାର ଆବେଗ: ଏ ଧରନେର ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଘଟିଯେ କୋମଲତା, ମାଧ୍ୟମ ଇତ୍ୟାଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଶୟ, ଅନୁରୋଧ, ମିଳନି ଇତ୍ୟାଦି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶେର ଜନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଯେମନ -

ଦୂର! ଏ କଥା କି ବଲତେ ଆଛେ?

ଯାକଗେ, ଓସବ କଥା ଥାକ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ସଠିକ ଉତ୍ତରେ ଟିକ ଚିହ୍ନ (✓) ଦାଓ ।

୧. ଆବେଗ ଶବ୍ଦ କୌତୁବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ?

କ. ଯାଧୀନଭାବେ ଖ. ଅନୁମୋଦିତଭାବେ ଗ. ନିୟାନ୍ତ୍ରିତଭାବେ ଘ. ଶର୍ତ୍ତସାପେକ୍ଷେ

୨. ଅନୁମୋଦନ, ସମ୍ମାନ ଓ ସମୟରେ ପାଇଁ କୋଣ ଜାତୀୟ ଆବେଗ ଶବ୍ଦେ?

କ. ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଆବେଗ ଖ. ଅଳଙ୍କାର ଆବେଗ ଗ. ବିଶ୍ୱାସ ଆବେଗ ଘ. ସମୋଧନ ଆବେଗ

୩. ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

କ. ହ୍ୟା - ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଆବେଗ ଖ. ଶାବାଶ - ଆତକ ଆବେଗ

ଗ. ଆରେ - କରଣ୍ଣା ଆବେଗ ଘ. ଆହା - ବିଶ୍ୱାସ ଆବେଗ

୪. ସମୋଧନ ଆବେଗ ଆଛେ କୋଣ ବାକ୍ୟେ?

କ. ଓହେ, କୀ ବଲେଛି, ଓନେଛ?

ଖ. ନାହ, ଓକେ ନିଯୋ ଆର ପାରି ନା ।

ଗ. ଆରେ! ତୁମି ଆବାର କଥନ ଏଲେ?

ଘ. ଦୂର! ଓସବ କଥା ଆମି ବଲିନି ।

୫. ନିଚେର କୋଣଟି ଅଳଙ୍କାର ଆବେଗ?

କ. ହେ ବନ୍ଦୁ, ତୋମାକେ ଅଭିନନ୍ଦନ ।

ଖ. ଆହା! ବେଚାରାର ଏତ କଟ୍ଟ!

ଗ. ଉହଁ! କୀ ବିପଦେ ପଡ଼ା ଗେଲ ।

ଘ. ଦୂର ପାଗଳ! ଏ କଥା କି ବଲତେ ଆଛେ?

পরিচ্ছেদ ২৬

নির্দেশক

যেসব লঘুক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা বোধায়, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। যেমন - -টা, -টি, -খানা, -খানি, -জন, -টুকু। নিচে কয়েকটি নির্দেশকের প্রয়োগ দেখানো হলো।

ক) -টা, -টি

বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণের সঙ্গে -টা, -টি নির্দেশক বসে। এর দুটি রূপান্তর: -টো ও -টে। যেমন -
বাড়িটা, ছেলেটা, এটা, সেটা, আমারটা, কিছুটা, একটা, সারাটা, করাটা; দিনটি, মেয়েটি, একটি,
কয়েকটি, আরেকটি; দুটো; তিনটে ইত্যাদি।

খ) -খানা, -খানি

বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে -খানা, -খানি নির্দেশক বসে। যেমন -
ব্যাপারখানা, ভাবখানা, একখানা, আধখানা, মুখখানি, অনেকখানি ইত্যাদি।

যেসব ক্ষেত্রে -টা বা -টি বসে, সেসব ক্ষেত্রে -খানা বা -খানি বসতে পারে। যেমন, বাড়িটা বা বাড়িটি না বলে
বাড়িখানা বা বাড়িখানিও বলা যায়।

গ) -জন

শুধু মানুষের বেলায় -জন নির্দেশকের ব্যবহার হয়। যেমন -
বিড়জন, লোকজন, অনেকজন, কয়জন, এতজন, পঞ্চিতজন।

সংখ্যার সঙ্গেও -জন নির্দেশকের ব্যবহার হয়। যেমন -
একজন রাজা, দুজন ডাক্তার ইত্যাদি।

অধিক সংখ্যার বেলায় 'জন' নির্দেশকটি সংখ্যা পরে আলাদা শব্দের মতো বসে। যেমন -
পাঁচ জন, পঁচিশ জন, ৪৫ জন ইত্যাদি।

ঘ) -টুকু

-টুকু নির্দেশক দিয়ে কোনো কিছুর সামান্য অংশ বা অন্ত পরিমাণ বোধায়। বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে
নির্দেশকটি ব্যবহৃত হয়। এর রূপভেদ: -টু বা -টুক। যেমন -
সাবান্টুকু, হাসিটুকু, শব্বতটুকু, এতটুকু, সময়টুকু, একটু, আধটু, যতটুক, ততটুক ইত্যাদি।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ସଠିକ ଉତ୍ତରେ ଟିକ ଚିହ୍ନ (✓) ଦାଓ ।

୧. କୋଣାଟି ନିର୍ଦେଶକ ନୟ?

କ. -ଟା ଖ. -ତମ ଗ. -ଖାନା ଘ. -ଜନ

୨. -ଟା/-ଟି ନିର୍ଦେଶକେର ରୂପାନ୍ତର?

କ. -ଟୋ ଖ. -ଟୁକୁ
ଗ. -ତା ଘ. -ତେ

୩. କିଛୁଟା ବା ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ବା ଅଞ୍ଚ ପରିମାଣ ବୋବାତେ କୋଣ ନିର୍ଦେଶକ ବ୍ୟବହାର ହ୍ୟା?

କ. -ଟୁକୁ ଖ. -ଟି ଗ. -ଖାନା ଘ. -ଖାନି

୪. କୋଣ ନିର୍ଦେଶକଟି ଶବ୍ଦେର ପରେ ଆଲାଦାଭାବେ ବସେ?

କ. ଜନ ଖ. ଟୁକୁ ଗ. ଖାନା ଘ. ଖାନି

୫. ନିର୍ଦେଶକ ଯୁକ୍ତ ହ୍ୟା କୋଣ ଶବ୍ଦେର ସଦେ?

କ. ବିଶେଷ୍ୟ ଖ. ସର୍ବନାମ ଗ. ବିଶେଷଣ ଘ. ସର୍ବଗୁଲୋହ

পরিচ্ছেদ ২৭

বচন

বচন হলো সংস্ক্যার ধারণা। বচনের মাধ্যমে গগলাবাচক বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের সংস্ক্যা নির্দেশিত হয়। বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার: একবচন ও বহুবচন। সাধারণত কিছু শব্দাংশ বা লক্ষণ একবচন শব্দের পরে যুক্ত হয়ে বহুবচন শব্দ তৈরি করে।

একবচন শব্দের উদাহরণ:

শিক্ষক ঙ্গাসে এসেছেন।

বইটা কোথায় হারিয়ে গেল?

এখানে প্রথম বাক্যের ‘শিক্ষক’ শব্দের সঙ্গে কোনো লক্ষণ যুক্ত হয়নি। দ্বিতীয় বাক্যে ‘বই’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত ‘টা’ একটি নির্দেশক। এর সঙ্গেও কোনো বহুবচন লক্ষণ যুক্ত হয়নি।

বহুবচন শব্দের উদাহরণ:

মাবিরা নৌকা চালায়।

কলমগুলোর দাম অনেক।

এখানে প্রথম বাক্যের একবচন ‘মাবিরা’ শব্দের সঙ্গে ‘-রা’ লক্ষণ যুক্ত হয়ে বহুবচন ‘মাবিরা’ হয়েছে। একইভাবে দ্বিতীয় বাক্যে ‘-গুলো’ লক্ষণ যুক্ত হয়ে বহুবচন ‘কলমগুলো’ হয়েছে।

ক) ‘-রা’, ‘-এরা’, ‘-গুলো’, ‘-গুলি’, ‘-দের’ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত হলে শব্দটির বহুবচন হয়। যেমন –

রা – ছাত্ররা, ধনীরা

এরা – ভাইয়েরা, শিক্ষকেরা

গুলো – ফুলগুলো, গরুগুলো

গুলি – বইগুলি, ঘরগুলি

দের – ছেলেদের, মেয়েদের।

খ) কিছু একবচন শব্দ বহুবচন হওয়ার সময়ে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায়। যেমন –

একবচন – আমি, বহুবচন – আমরা

একবচন – তুমি, বহুবচন – তোমরা

একবচন – সে, বহুবচন – তারা

একবচন – তিনি, বহুবচন – তাঁরা।

গ) প্রাণী বা বস্তুর নামকে বহুবচন করতে ‘-সব’, ‘-সমূহ’, ‘-আবলি’, ‘-মালা’ ইত্যাদি লক্ষণ যোগ করতে হয়।

যেমন –

সব – ভাইসব, পাখিসব

সমূহ – গ্রন্থসমূহ, বৃক্ষসমূহ

আবলি - নিয়মাবলি, রচনাবলি
মালা - মেঘমালা, পর্বতমালা।

- ঘ) মানী পক্ষের বহুবচন করার সময়ে '-গণ,' '-বৃন্দ,' '-মঙ্গলী,' '-বর্গ' ইত্যাদি লঘুক যোগ করা হয়। যেমন -
 গণ - সনস্যগণ, সচিবগণ
 বৃন্দ - দর্শকবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ
 মঙ্গলী - সুধীমঙ্গলী, সম্পাদকমঙ্গলী
 বর্গ - পাণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রীবর্গ।

অনেক ফেরে বচন লঘুক ব্যবহৃত না হলেও বহুবচন হতে পারে। যেমন -
 বাজারে লোক কম।
মৌমাছি মৌচাক বানায়।
 সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

- একাধিক সংখ্যা বোঝাতে যেসব লঘুক বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে যুক্ত হয়, তার নাম -
 ক. বচন খ. যোজক গ. আবেগ ঘ. পদার্থ
- নিচের কোনটি একবচন?
 ক. আমি খ. বইগুলি গ. মাঝিরা ঘ. কলমগুলো
- 'মানী' লোকের বেলায় বহুবচনে কী লঘুক ব্যবহৃত হয়?
 ক. বৃন্দ খ. মালা গ. সব ঘ. রাজি
- নিচের কোন বাক্যে বহুবচন ব্যবহৃত না হয়েও বহুবচন বোঝাচ্ছে?
 ক. মৌমাছি মৌচাক বানায়।
 খ. ছাত্রার এসে জড়ো হয়েছে।
 গ. এ নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই।
 ঘ. হাজার হাজার কৃষক ফুলের চাষ করেন।
- 'পর্বত' শব্দকে বহুবচন করাতে কোন লঘুকটি ব্যবহৃত হয়?
 ক. কুল খ. সব গ. সমূহ ঘ. মালা

পরিচ্ছেদ ২৮

বিভক্তি

বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে অর্থহীন কিছু লগ্নক যুক্ত হয়, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। যেমন: -এ, -তে, -য়, -য়ে, -কে, -রে, -র, -এর, -য়ের ইত্যাদি।

লোকে কি না বলে! — এই বাক্যে 'লোক' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-এ' বিভক্তি।

সে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গুরু চরাতে গেছে। — এই বাক্যে 'ছেলে' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-কে' বিভক্তি।

বাড়ির পুকুরের পাড়ে বড়ো ভাইয়ের কলাবাগান। — এই বাক্যে 'বাড়ি', 'পুকুর' এবং 'ভাই' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-র', '-এর' এবং '-য়ের' বিভক্তি।

বিভক্তিগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখানো যায়।

ক) -এ, -তে, -য়, -য়ে বিভক্তি

সাধারণত ক্রিয়ার স্থান, কাল, ভাব বোঝাতে -এ, -তে, -য়, -য়ে ইত্যাদি বিভক্তির ব্যবহার হয়। কথনে কথনে বাক্যের কর্তৃর সঙ্গেও এসব বিভক্তি বসে।

যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের সঙ্গে -এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন — সকালে, দিনাজপুরে, ই-মেইলে, কম্পিউটারে, ছাগলে, তিলে ইত্যাদি।

শব্দের শেষে ই-কার ও টি-কার থাকলে -তে বিভক্তি হয়। যেমন — হাতিতে, রাতিতে, মধুতে, রামুতে ইত্যাদি।

আ-কারান্ত শব্দের শেষে -য় বিভক্তি হয়। যেমন — ঘোড়ায়, সঙ্কায়, ঢাকায় ইত্যাদি।

শব্দের শেষে দ্বিতীয় থাকলে -য়ে বিভক্তি হয়। যেমন — ছইয়ে, ভাইয়ে, বউয়ে।

ই-কারান্ত শব্দের শেষেও -য়ে বিভক্তি দেখা যায়। যেমন — বিয়ে, ঘিয়ে।

খ) -কে, -রে বিভক্তি

বাক্যে গৌণকর্মের সঙ্গে সাধারণত -কে এবং -রে বিভক্তি বসে। ক্রিয়াকে 'কাকে' প্রশ্ন করলে যে শব্দ পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন — শিশুকে, দরিদ্রকে, আমাকে, আমারে ইত্যাদি।

গ) -র, -এর, -য়ের বিভক্তি

বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে সমন্বয় বোঝাতে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে -র, -এর এবং -য়ের বিভক্তি যুক্ত হয়। সাধারণত আ-কারান্ত, ই/ঈ-কারান্ত ও উ/উ-কারান্ত শব্দের শেষে -র বিভক্তি বসে। যেমন - রাজাৰ, প্ৰজাৰ, হাতিৰ, বুদ্ধিজীবীৰ, তনুৱ, বধূৱ।

যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের শেষে -এর বিভক্তি হয়। যেমন - বলেৱ, শব্দেৱ, নজুলেৱ, সাতাশেৱ ইত্যাদি।

শব্দের শেষে দ্বিতীয় থাকলে -য়ের বিভক্তি হয়। যেমন - ভাইয়েৱ, বইয়েৱ, লাউয়েৱ, মৌয়েৱ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. 'লোকে কিনা বলে' - বাক্যের লোক শব্দের সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত আছে?

ক. -এ খ. -তে গ. -যে ঘ. -ৱে

২. সাধারণত ক্ৰিয়াৰ কাল, হ্বান ও ভাৰ বোঝাতে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?

ক. -কে, -ৱে খ. -ৱ, -এৱ গ. -এ, -তে ঘ. -এ, -য়েৱ

৩. শব্দের শেষে ই-কাৰ ও উ-কাৰ থাকলে -এ বিভক্তিৰ রূপভেদ হয় -

ক. -য়ে খ. -এ গ. -কে ঘ. -তে

৪. আ-কাৰান্ত শব্দের শেষে -এ বিভক্তিৰ রূপভেদ -

ক. -ই খ. -ৱে গ. -ৱ ঘ. -য়

৫. শব্দের শেষে দ্বিতীয় থাকলে -এ বিভক্তিৰ রূপভেদ হয় -

ক. -এ খ. -তে গ. -য়ে ঘ. -ৱে

৬. বাক্যে গৌণ কৰ্মেৰ সঙ্গে কোন বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ হয়?

ক. -ৱ খ. -এ গ. -কে ঘ. -তে

৭. বাক্যের মধ্যে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে সমন্বয় বোঝাতে কোন বিভক্তি হয়?

ক. -ৱ খ. -এ গ. -কে ঘ. -তে

পরিচ্ছেদ ২৯

ক্রিয়াবিভক্তি

ক্রিয়ার দুইটি অংশ: প্রথম অংশ ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং দ্বিতীয় অংশ ক্রিয়াবিভক্তি। ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যেসব লগ্নক যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল ও পক্ষ নির্দেশিত হয়, সেগুলোকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে। যেমন –

পড়ছি (পড় + ছি) – ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা বজ্ঞা পক্ষের এবং এটা দিয়ে ঘটমান বর্তমান কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

পড়বেন (পড় + বেন) – ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা শ্রোতা পক্ষের এবং এটা দিয়ে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

পড়ছিল (পড় + ছিল) – ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা অন্য পক্ষের এবং এটা দিয়ে সাধারণ অতীত কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

উপরের উদাহরণগুলোতে ‘-ছি’, ‘-বেন’, ‘-ছিল’ – এগুলো হলো ক্রিয়াবিভক্তি।

অধিকাংশ বাংলা ক্রিয়ার দুটি রূপ আছে: সাধারণ রূপ ও প্রযোজক রূপ। উভয় রূপের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তির রূপ আলাদা। নিচের সারণিতে ক্রিয়ামূল ‘কর’-এর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হলো:

সাধারণ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তি

কাল ↓ পক্ষ →	আধি	তৃষ্ণি	তুই	সে	আপনি/তিনি
সাধারণ বর্তমান	-ই (করি)	-ও (করো)	-ইস (করিস)	-এ (করে)	-এন (করেন)
ঘটমান বর্তমান	-ছি (করছি)	-ছ (করছ)	-ছিস (করছিস)	-ছে (করছে)	-ছেন (করছেন)
পুরাখতি বর্তমান	-এছি (করেছি)	-এছ (করেছ)	-এছিস (করেছিস)	-এছে (করেছে)	-এছেন (করেছেন)
অনুভৱ বর্তমান		-ও (করো)	-ইস (করিস)	-উক (করুক)	-উন (করুন)
সাধারণ অতীত	-লাম (করলাম)	-লে (করলে)	-লি (করলি)	-ল (করল)	-লেন (করলেন)
ঘটমান অতীত	-ছিলাম (করছিলাম)	-ছিলে (করছিলে)	-ছিলি (করছিলি)	-ছিল (করছিল)	-ছিলেন (করছিলেন)
পুরাখতি অতীত	-এছিলাম (করেছিলাম)	-এছিলে (করেছিলে)	-এছিলি (করেছিলি)	-এছিল (করেছিল)	-এছিলেন (করেছিলেন)
নিত্য অতীত	-তাম (করতাম)	-তে (করতে)	-তি (করতি)	-ত (করত)	-তেন (করতেন)

সাধারণ ভবিষ্যৎ	-ব (করব)	-বে (করবে)	-বি (করবি)	-বে (করবে)	-বেন (করবেন)
অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ		-ও (কোরো)	-বি (করবি)	-বে (করবে)	-বেন (করবেন)
অসমাপিকা	ভূত অসমাপিকা: -এ (করে); ভাবী অসমাপিকা: -তে (করতে); শর্ত অসমাপিকা: -লে (করলে)				

প্রযোজক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তি

কাল ↴ পক্ষ	আমি	ভূমি	ভুই	সে	আপনি/তিনি
সাধারণ বর্তমান	-আই (করাই)	-আও (করাও)	-আস (করাস)	-আয় (করায়)	-আন (করান)
ঘটমান বর্তমান	-আচ্ছি (করাচ্ছি)	-আচ্ছ (করাচ্ছ)	-আচ্ছিস (করাচ্ছিস)	-আচ্ছে (করাচ্ছে)	-আচ্ছেন (করাচ্ছেন)
পুরাধর্মিত বর্তমান	-ইয়োছি (করিয়োছি)	-ইয়োছ (করিয়োছ)	-ইয়োছিস (করিয়োছিস)	-ইয়োছে (করিয়োছে)	-ইয়োছেন (করিয়োছেন)
অনুজ্ঞা বর্তমান		-আও (করাও)	-আস (করাস)	-আক (করাক)	-আন (করান)
সাধারণ অতীত	-আলাম (করালাম)	-আলে (করালে)	-আলি (করালি)	-আল (করাল)	-আলেন (করালেন)
ঘটমান অতীত	-আচ্ছিলাম (করাচ্ছিলাম)	-আচ্ছিলে (করাচ্ছিলে)	-আচ্ছিলি (করাচ্ছিলি)	-আচ্ছিল (করাচ্ছিল)	-আচ্ছিলেন (করাচ্ছিলেন)
পুরাধর্মিত অতীত	-ইয়োছিলাম (করিয়েছিলাম)	-ইয়োছিলে (করিয়েছিলে)	-ইয়োছিলি (করিয়েছিলি)	-ইয়োছিল (করিয়েছিল)	-ইয়োছিলেন (করিয়েছিলেন)
নিত্য অতীত	-আতাম (করাতাম)	-আতে (করাতে)	-আতি (করাতি)	-আত (করাত)	-আতেন (করাতেন)
সাধারণ ভবিষ্যৎ	-আব (করাব)	-আবে (করাবে)	-আবি (করাবি)	-আবে (করাবে)	-আবেন (করাবেন)
অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ		-ইয়ো (করিয়ো)	-আবি (করাবি)	-আবে (করাবে)	-আবেন (করাবেন)
অসমাপিকা	ভূত অসমাপিকা: -ইয়ে (করিয়ে); ভাবী অসমাপিকা: -আতে (করাতে); শর্ত অসমাপিকা: -আলে (করালে)				

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. ক্রিয়ার প্রথম অংশকে কী বলে?

ক. শব্দ খ. শব্দমূল গ. ধাতু ঘ. ক্রিয়াবিভক্তি

২. ক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশকে কী বলে?

ক. ধৰনি খ. বৰ্ণ গ. ধাতু ঘ. ক্রিয়াবিভক্তি

৩. সাধারণ ক্রিয়ার বর্তমান কালে বক্তা পক্ষের ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?

ক. -ই (করি) খ. -আই (করাই) গ. -লে (করলে) ঘ. -এন (করেন)

৪. প্রযোজক ক্রিয়ার সাধারণ অতীত কালে শ্রোতা পক্ষের মানী ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?

ক. -তি (করাতি) খ. -আলাম (করালাম)

গ. -ইয়েছি (করিয়েছি) ঘ. -আলেন (করালেন)

৫. সাধারণ ক্রিয়ার নিত্য অতীত কালে শ্রোতা পক্ষের ঘনিষ্ঠ ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?

ক. -ব (করব) খ. -তি (করতি) গ. -বে (করবে) ঘ. -এন (করেন)

৬. প্রযোজক ক্রিয়ার সাধারণত বর্তমান কালে বক্তা পক্ষের ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?

ক. -আও (করাও) খ. -আস (করাস) গ. -আয় (করায়) ঘ. -আই (করাই)

৭. নিচের কোনটি প্রযোজক ক্রিয়ার ভাবী অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি?

ক. -আনো (করানো) খ. -ইয়ে (করিয়ে) গ. -আতে (করাতে) ঘ. -আলে (করালে)

পরিচ্ছেদ ৩০

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। ক্রিয়ার কাল তিনি প্রকার: বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

১. বর্তমান কাল

বর্তমানে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বর্তমান কাল বলে। বর্তমান কাল চার প্রকার: সাধারণ বর্তমান, ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান এবং অনুজ্ঞা বর্তমান।

সাধারণ বর্তমান

যে ক্রিয়া বর্তমান কালে নিয়মিতভাবে ঘটে, তাকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন -

আমি কুলে ঘাই।

সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।

ঘটমান বর্তমান

যে ক্রিয়া বর্তমানে চলছে বোবায়, তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন -

আমি কুলে ঘাস্তি।

আমাদের পরীক্ষা চলছে।

পুরাঘটিত বর্তমান

এইমাত্র সম্পন্ন ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে। যেমন -

আমি অঙ্কটি করেছি।

তারা বাড়িতে ফিরেছে।

অনুজ্ঞা বর্তমান

যে ক্রিয়া দিয়ে বর্তমান কালে বজ্জ্বার আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, অভিশাপ, উপদেশ, উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞা বর্তমান কাল বলে। যেমন -

তাড়াতাড়ি কাজটি করো।

সকলের মঙ্গল হোক।

২. অতীত কাল

অতীতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হতো তাকে অতীত কাল বলে। অতীত কাল চার প্রকার: সাধারণ অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত এবং নিত্য অতীত।

সাধারণ অতীত

অতীত কালে যে কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বোঝায়, তাকে সাধারণ অতীত কাল বলে। যেমন –

তারা সেখানে বেড়াতে গেল।

তখন বাতিটা জলে উঠল।

ঘটমান অতীত

যে ক্রিয়া অতীত কালে চলছিল বোঝায়, তাকে ঘটমান অতীত কাল বলে। যেমন –

আমরা তখন বই পড়ছিলাম।

তারা মাঠে খেলছিল।

পুরাঘটিত অতীত

অতীতের যে ক্রিয়া বহু পূর্বেই ঘটে গেছে এবং পরে আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। যেমন –

বৃঢ়ি শেষ হওয়ার আগেই আমরা বাড়ি পৌছেছিলাম।

বরবটা তুমি আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলে।

নিত্য অতীত

অতীত কালে প্রায়ই ঘটতো এমন বোঝালে নিত্য অতীত কাল হয়। যেমন –

শুধু সকালে ঘুম থেকে উঠতাম।

তারা সাগরের তীরে ঝিনুক কুড়াত।

৩. ভবিষ্যৎ কাল

ভবিষ্যতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হবে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার: সাধারণ ভবিষ্যৎ, ঘটমান ভবিষ্যৎ এবং অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ।

সাধারণ ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যৎ কালে যে কাজ সাধারণভাবে সম্পন্ন হবে বোঝায়, তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন –

আমরা রংপুরে যাব।

দু-এক দিনের মধ্যে সে আসবে।

ঘটমান ভবিষ্যৎ

যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে বোঝায়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন –

আমাদের কাজ আমরা করতে থাকব।

এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ

যে ক্রিয়া দিয়ে ভবিষ্যৎ কালের আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রাৰ্থনা, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, উপদেশ, উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন -

তাড়াতাড়ি কাজটি কোরো।

ভালোভাবে পৌছে যেয়ো।

ক্রিয়ার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

অনেক সময়ে ক্রিয়াবিভক্তি যে কালের হয়, ঘটনা সেই কালের হয় না। এগুলো ক্রিয়ার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ। নিচের বাক্য দুটির দিকে তাকানো যাক:

আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছিলাম।

আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছি।

প্রথম বাক্যে ক্রিয়ার কাল অতীত এবং ক্রিয়া ঘটার সময় অতীতের। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়ার কাল বর্তমান কালের এবং ক্রিয়া ঘটার সময় অতীতের। দ্বিতীয় বাক্যটি কালের বিশিষ্ট প্রয়োগের নমুনা।

সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ:

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)
সবাই যেন সভায় হাজির থাকে। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)

ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ:

আগামী মাসে আমরা সিলেট যাচ্ছি। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)

সাধারণ অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ:

শিকারি পাখিটিকে এইমাত্র গুলি করল। (ঘটনা পুরাঘটিত বর্তমানের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত।)
যদি বৃষ্টি হতো, সবাই মিলে খিচুড়ি খেতাম। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত।)

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ:

তোমরা হয়ত ছয় দফার কথা শুনে থাকবে। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু কাল ভবিষ্যৎ।)

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কী বলে?

- ক. ক্রিয়ার মূল খ. ক্রিয়ার স্থান গ. ক্রিয়ার কাল ঘ. ক্রিয়ার বিভঙ্গি

২. ঘটমান বর্তমান কালের উদাহরণ কোনটি?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ক. আমি রোজ কুলে যাই | খ. আমি কুলে যাচ্ছি |
| গ. আমি কুলে এসেছি | ঘ. আমরা কুলে এসেছি |

৩. কোন কালে অনুজ্ঞা হয় না?

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ক. বর্তমান কালে | খ. ভবিষ্যৎ কালে |
| গ. অতীত কালে | ঘ. ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে |

৪. কাজটি চলছে এখনও শেষ হয়নি, এমন বোঝাতে কোন বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়?

- ক. সাধারণ বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান গ. পুরাধিত বর্তমান ঘ. অনুজ্ঞা বর্তমান

৫. “আমার আশীর্বাদ নিয়ো” – বাক্যটি কোন কালের?

- ক. সাধারণ বর্তমান খ. অনুজ্ঞা বর্তমান গ. সাধারণ অতীত ঘ. নিত্য অতীত

৬. আজ বিকেলে যদি সুমন আসত, মজা হতো – বাক্যটির ক্রিয়া অতীতের কিন্তু ঘটনা কোন কালের?

- ক. সাধারণ বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান গ. সাধারণ অতীত ঘ. সাধারণ ভবিষ্যৎ

৭. নিচের কোন বাক্যে ঘটনা অতীতের, কিন্তু ক্রিয়ার কাল সাধারণ বর্তমান কালের?

- ক. আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছি।
 খ. সবাই যেন সভায় হাজির থাকে।
 গ. গত বছর তিনি একুশে পদক পান।
 ঘ. পরের সপ্তাহে আমরা বাড়ি যাচ্ছি।

পরিচ্ছেদ ৩১

বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ

এক বা একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত পূর্ণ অর্থবোধক ভাষ্মিক একককে বাক্য বলে। বাক্য দিয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। যেমন – “সজল ও লতা বই পড়ে।” – এটি একটি বাক্য। পাঁচটি শব্দ দিয়ে গঠিত এই বাক্যে বক্তার মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশিত হয়েছে।

বাক্যের মধ্যে স্থান পাওয়া প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলে। এদিক দিয়ে পদ হলো বাক্যের একক। ক্রপতত্ত্ব অংশে শব্দশ্রেণি নামে বাক্যের এই পদ বিভাজনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরের বাক্যে ‘সজল’, ‘লতা’ ও ‘বই’ হলো বিশেষ্য, ‘ও’ হলো যোজক এবং ‘পড়ে’ হলো ক্রিয়া।

বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দের গুচ্ছ অনেক সময়ে পদের মতো কাজ করে। তখন সেই একাধিক শব্দের গুচ্ছকে বর্গ বলা হয়। উপরের বাক্যে ‘সজল ও লতা’ একটি বর্গ।

সাধারণ বাক্যের প্রধান তিনটি অংশ: কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। বাক্যের ক্রিয়াকে যে চালায়, সে হলো কর্তা। যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে কর্ম। আর বাক্যের মধ্যে যে অংশ দিয়ে কোনো কিছু করা, ঘটা বা হওয়া বোঝায় তাকে বলে ক্রিয়া। উপরের বাক্যে ‘সজল ও লতা’ হলো কর্তা, ‘বই’ হলো কর্ম এবং ‘পড়ে’ হলো ক্রিয়া।

প্রতিটি বাক্যকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় – এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। বাক্যের যে অংশে কারো সম্পর্কে বলা হয়, সেই অংশ হলো বাক্যের উদ্দেশ্য। এছাড়া বাক্যের যে অংশে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয়, সেই অংশ হলো বাক্যের বিধেয়। উপরের বাক্যে ‘সজল ও লতা’ উদ্দেশ্য এবং ‘বই পড়ে’ বিধেয়।

গঠনগত দিয়ে বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সরল, জটিল ও যৌগিক।

- (১) **সরল বাক্য:** একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন – জেসমিন স্বার জন্য চা বানিয়েছে।
- (২) **জটিল বাক্য:** একটি মূল বাক্যের অধীনে এক বা একাধিক আঙ্কিত বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে জটিল বাক্য তৈরি হয়। যেমন – যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তবে এখনই বলে ফেলো।
- (৩) **যৌগিক বাক্য:** এক বা একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করে। যেমন – রহমত রাতে কুটি খায় আর রহিমা খায় ভাত।

বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকা-না থাকা বিবেচনায় বাক্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: সক্রিয় বাক্য ও অক্রিয় বাক্য।

- (১) **সক্রিয় বাক্য:** যেসব বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকে, সেগুলোকে সক্রিয় বাক্য বলে। যেমন – আমার মা চাকরি করেন।

- (২) **অক্রিয় বাক্য:** যেসব বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকে না, সেগুলোকে অক্রিয় বাক্য বলে। যেমন -
তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। তবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগে এগুলো সক্রিয় বাক্য হয়ে যায়।
যেমন - 'তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন' বা 'তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হবেন'।

বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যকে বিবৃতিবাচক, নেতিবাচক, প্রশংসবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক প্রভৃতি
ভাগে ভাগ করা যায়:

- (১) **বিবৃতিবাচক বাক্য:** সাধারণভাবে কোনো বিবরণ প্রকাশ পায় যেসব বাক্যে, সেগুলোকে বিবৃতিমূলক
বাক্য বলে। বিবৃতিবাচক বাক্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। যেমন -
আমরা রোজ বেড়াতে যেতাম।
তারা তোমাদের ভোলেনি।
- (২) **প্রশংসবাচক বাক্য:** বক্তা কারও কাছ থেকে কিছু জানাব জন্য যে ধরনের বাক্য বলে, সেগুলো প্রশংসবাচক
বাক্য। যেমন -
তোমার নাম কী?
সুন্দরবনকে কোন ধরনের বনাঞ্চল বলা হয়?
- (৩) **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য:** আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য হয়।
যেমন -
আমাকে একটি কলম দাও।
তার মঙ্গল হোক।
- (৪) **আবেগবাচক বাক্য:** কোনো কিছু দেখে বা কোন অবাক হয়ে যে ধরনের বাক্য তৈরি হয়, তাকে
আবেগবাচক বাক্য বলে। যেমন -
দারুণ! আমরা জিতে গিয়েছি।
অত উচ্চ পাহাড়ে উঠে আমি তো ভয়েই মরি!

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. এক বা একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত পূর্ণ অর্থবোধক ভাষিক একককে কী বলে?

ক. বাক্য খ. বাক্যাংশ গ. উদ্দেশ্য ঘ. বিধেয়

২. বাক্যের মধ্যে ছান পাওয়া প্রত্যেকটি শব্দকে কী বলা হয়?

ক. যোজক খ. বর্গ গ. ধরন ঘ. পদ

৩. বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দের গুচ্ছকে কী বলে?

ক. বর্ণ খ. বর্গ গ. পদ ঘ. শব্দ

৪. বাক্যের ক্রিয়াকে যে চালায় তাকে বলে -

ক. কর্তা খ. কর্ম গ. ক্রিয়া ঘ. পদ

৫. "সঙ্গল কুলে যায়।" - বাক্যের উদ্দেশ্য -

ক. সঙ্গল খ. কুলে গ. যায় ঘ. কুলে যায়

৬. একটি মূল বাক্যের অধীনে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে তাকে কোন বাক্য বলে?

ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য গ. জটিল বাক্য ঘ. সক্রিয় বাক্য

৭. এক বা একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ যোজকের মাধ্যমে মিলে যে বাক্য হয় তাকে কী বাক্য বলে?

ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য গ. জটিল বাক্য ঘ. অক্রিয় বাক্য

৮. বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকা না থাকা বিবেচনায় বাক্যকে কতভাগে ভাগ করা যায়?

ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৯. কোনো কিছু দেখে বা শুনে অবাক বা বিস্মিত হলে কোন ধরনের বাক্য তৈরি হয়?

ক. নেতিবাচক বাক্য খ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ. প্রশ্নবাচক বাক্য ঘ. আবেগবাচক বাক্য

পরিচ্ছদ ৩২

বাক্যের বর্গ

বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে বর্গ বলে। বর্গ হলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ। বর্গকে বলা যায় বাক্যের একক, কেননা মানুষ কথা বলতে গিয়ে শব্দের পরে শব্দ না বসিয়ে প্রায়ই বর্গের পরে বর্গ বসায়। যেমন –

মালা ও মায়া খুব সকালে বাড়ির সামনে থাকা কুল-বাসে উঠে পড়ল।

এই বাক্যে ‘মালা’ ও ‘মায়া’, ‘খুব সকালে’, ‘বাড়ির সামনে থাকা’, ‘কুল-বাসে’, ‘উঠে পড়ল’ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ এক একটি বর্গ।

কোনো একটি বর্গ বাক্যের মধ্যে যে পদের মতো আচরণ করে, সেই পদের নাম অনুযায়ী বর্গের নাম হয়। উপরের উদাহরণে ‘মালা’ ও ‘কুল-বাসে’ হলো বিশেষ্যবর্গ; ‘বাড়ির সামনে থাকা’ হলো বিশেষণবর্গ, ‘খুব সকালে’ ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ এবং ‘উঠে পড়লো’ হলো ক্রিয়াবর্গ।

নিচে বিভিন্ন ধরনের বর্গের পরিচয় দেওয়া হলো:

১. বিশেষ্যবর্গ

বিশেষ্যের আগে এক বা একাধিক বিশেষণ বা সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বর্গ তৈরি হয়। যেমন –

অসুস্থ ছেলেটি আজ কুলে আসেনি।

আমার ভাই পড়তে বসেছে।

আবার, যোজক হাতা দুইটি বিশেষ্য যুক্ত হয়ে বিশেষ্যবর্গ তৈরি হয়। যেমন –

রহিম ও করিম বৃষ্টিতে ভিজছে।

২. বিশেষণবর্গ

বিশেষজ্ঞাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলা যায় বিশেষণবর্গ। যেমন –

আমটা দেখতে ভারী সুন্দর।

ভদ্রলোক সত্যিকারের নির্লোভ।

পোকায় খাওয়া কাঠ দিয়ে আসবাব বানানো ঠিক নয়।

৩. ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ

যে শব্দগুচ্ছ ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ বলে।

সকাল আটটার সময়ে সে রওনা হলো।

তারপর আমরা দশ নম্বর প্লাটফর্মে গিয়ে দাঢ়ালাম।

আমি সকাল থেকে বসে আছি।
বেঁচে থাকার মতো সামান্য কয়টা টাকা বেতন পাই।
 সে থেয়ে আর দুমিয়ে কাটাচ্ছে।

৪. ক্রিয়াবর্গ

বাক্যের বিধেয় অংশের ক্রিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই ক্রিয়াবর্গ তৈরি করে। যেমন -

অন্নসহ সৈন্যদল এগিয়ে চলোছে।
 সে লিখছে আর হাসছে।
 সে আনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বসে পড়লো।
 বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে চিঢ়কার করছে।

অনুশীলনী

সঠিক উভরে টিক টিক (✓) দাও।

১. বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে কী বলে?

ক. বর্গ খ. উদ্দেশ্য গ. বিধেয় ঘ. বাক্যাংশ

২. 'বর্গ' আসলে -

ক. বাক্যের বিন্যাস খ. ধ্বনিগুচ্ছ গ. বর্ণের সমষ্টি ঘ. শব্দের গুচ্ছ

৩. বর্গের নাম হয় -

ক. পদ অনুযায়ী খ. বাক্য অনুযায়ী গ. ধ্বনি অনুযায়ী ঘ. বর্ণ অনুযায়ী

৪. বিশেষ্যের আগে এক বা একাধিক বিশেষণ বা সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে কোন বর্গ তৈরি হয়?

ক. বিশেষ্যবর্গ খ. বিশেষণবর্গ গ. ক্রিয়াবিশেষণবর্গ ঘ. ক্রিয়াবর্গ

৫. বিশেষণ জাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলে -

ক. বিশেষ্যবর্গ খ. ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ গ. বিশেষণবর্গ ঘ. ক্রিয়াবর্গ

৬. বিধেয় অংশের ক্রিয়া সাধারণত -

ক. বিশেষ্যবর্গ খ. বিশেষণবর্গ গ. ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ ঘ. ক্রিয়াবর্গ

পরিচ্ছেদ ৩৩

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

বাক্যকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় - এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন - 'সুমন বল খেলে'। এই বাক্যে সুমনকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হচ্ছে। অতএব 'সুমন' বাক্যটির উদ্দেশ্য। বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। বিধেয় অংশে সাধারণত ক্রিয়া থাকে। এখানে 'বল খেলে' অংশটি বাক্যের বিধেয়।

বাক্য দীর্ঘতর হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের সঙ্গে নানা ধরনের শব্দ ও বর্গ যুক্ত হতে পারে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এইসব শব্দ ও বর্গ প্রসারিত করে বলে এগুলোর নাম প্রসারক। এছাড়া বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে বলা হয় পূরক। যেমন -

সেলিম সাহেবের ছেলে সুমন গাছতলায় বসে বই পড়ছে।

এখানে 'সুমন' উদ্দেশ্য, 'সেলিম সাহেবের ছেলে' উদ্দেশ্যের প্রসারক। অন্যদিকে 'পড়ছে' বিধেয়ের ক্রিয়া, 'গাছতলায় বসে' বিধেয়ের প্রসারক এবং 'বই' হলো বিধেয়ের পূরক।

তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের এই অবস্থান বদলে যেতে পারে। যেমন -

চিনি বা শর্করা এইসব মিলিয়ে তৈরি হয়।

এই বাক্যকে এভাবেও লেখা যেতে পারে -

এইসব মিলিয়ে তৈরি হয় চিনি বা শর্করা।

উপরের প্রথম বাক্যে উদ্দেশ্য 'চিনি বা শর্করা' প্রথমে বসেছে, বিধেয়ের প্রসারক 'এইসব মিলিয়ে' মাঝখানে বসেছে, এবং বিধেয় ক্রিয়া 'তৈরি হয়' শেষে বসেছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বাক্যে উদ্দেশ্য 'চিনি বা শর্করা' শেষে বসেছে, বিধেয়ের প্রসারক 'এইসব মিলিয়ে' প্রথমে বসেছে, এবং বিধেয় ক্রিয়া 'তৈরি হয়' মাঝখানে বসেছে।

সাধারণত উদ্দেশ্যের পূর্বে উদ্দেশ্যের প্রসারক এবং বিধেয়ের পূর্বে বিধেয়ের প্রসারক বসে। তবে বিধেয়ের ছান ও কাল সংক্রান্ত প্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বেও বসতে পারে। যেমন -

১৯৫২ সালে ঢাকার রাজপথে বাঙালি জাতির অহংকার রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এই বাক্যে উদ্দেশ্য হলো 'রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার', উদ্দেশ্যের প্রসারক হলো 'বাঙালি জাতির অহংকার'। বিধেয় ক্রিয়া হলো 'উৎসর্গ করেছিলেন', বিধেয়ের পূরক হলো 'জীবন'। অন্যদিকে '১৯৫২ সালে', 'ঢাকার রাজপথে', এবং 'মাতৃভাষার জন্য' - এই তিনটি অংশ হলো বিধেয়ের প্রসারক।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. বাক্যের দুই অংশ -

ক. উদ্দেশ্য ও কর্তা খ. বিধেয় ও কর্ম গ. উদ্দেশ্য ও বিধেয় ঘ. উদ্দেশ্য ও কর্ম

২. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে কী বলে?

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. পূরক ঘ. প্রসারক

৩. বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে কী বলে?

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. পূরক ঘ. প্রসারক

৪. উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে প্রসারিত করা হয় যেসব শব্দ ও বর্গ দিয়ে, তাকে বলে -

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. পূরক ঘ. প্রসারক

৫. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে বলে -

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. পূরক ঘ. প্রসারক

৬. বাংলা বাক্যে উদ্দেশ্য কোথায় বসে?

ক. বাক্যের শুরুতে খ. বাক্যের মাঝে গ. বাক্যের শেষে ঘ. যে কোনো জায়গায়

৭. 'এইসব মিলিয়ে তৈরি হয় চিনি বা শর্করা' - এখানে 'এইসব মিলিয়ে' বর্গ হলো -

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. উদ্দেশ্যের প্রসারক ঘ. বিধেয়ের প্রসারক

৮. বিধেয়ের স্থান ও কাল সংজ্ঞান্ত প্রসারক বসতে পারে -

ক. উদ্দেশ্যের পূর্বে খ. বিধেয়ের পূর্বে

গ. উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পরে ঘ. উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পূর্বে

৯. মোঘল সম্রাট শাজাহান তাঁর ভালোবাসার নির্দশন স্থরূপ তাজমহল নির্মাণ করেন - এখানে মোঘল সম্রাট কী?

ক. উদ্দেশ্যের প্রসারক খ. বিধেয়ের প্রসারক গ. বিধেয়ের পূরক ঘ. বিধেয়ের ক্রিয়া

১০. 'যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের আশ আমরা শোধ করতে পারব না' - এখানে আশ কী?

ক. উদ্দেশ্যের প্রসারক খ. বিধেয়ের প্রসারক গ. বিধেয়ের পূরক ঘ. বিধেয়ের ক্রিয়া

পরিচ্ছেদ ৩৪

সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য

গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলা বাক্যকে তিনি ভাগে ভাগ করা যায়: সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য।
নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করা যাক:

আমি পড়াশোনা শেষ করে খেলতে যাব।

যখন আমার পড়াশোনা শেষ হবে, তখন আমি খেলতে যাব।

আমি পড়াশোনা শেষ করব; তারপর খেলতে যাব।

প্রথম বাক্যে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে। এটি সরল বাক্য। দ্বিতীয় বাক্যের দুটি অংশ 'যখন' ও 'তখন'
যোজক দ্বারা যুক্ত হয়েছে। এটি জটিল বাক্যের উদাহরণ। তৃতীয় বাক্যে 'করব' ও 'যাব' দুটি সমাপিকা ক্রিয়া
রয়েছে। এটি একটি যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য

যে বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন –

পাখিগুলো নীল আকাশে উড়ছে।

তিনি ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সরল বাক্যে অনেক সময়ে ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে। যেমন –

আমরা তিনি ভাইবোন।

বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও সরল বাক্য হয়। যেমন –

তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পায়চারি করতে করতে বাজারের দিকে গেলেন।

২. জটিল বাক্য

যে-সে, যারা-তারা, যিনি-তিনি, যাঁরা-তাঁরা, যা-তা প্রভৃতি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, যদিও-তবু,
যেহেতু-সেহেতু, যত-তত, যেটুকু-সেটুকু, যেমন-তেমন, যখন-তখন প্রভৃতি সাপেক্ষ যোজক দিয়ে যখন
অধীন বাক্যগুলো যুক্ত থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন –

যে ছেলেটি এখানে এসেছিল, সে আমার ভাই।

যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে।

যখন বৃষ্টি নামল, তখন আমরা ছাতা খুজতে শুরু করলাম।

৩. যৌগিক বাক্য

দুই বা ততোধিক স্থাদীন বাক্য যখন যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। এবং, ও, আর, অথবা, বা, কিংবা, কিন্তু, অথচ, সেজন্য, ফলে ইত্যাদি যোজক যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), ড্যাশ (-) ইত্যাদি যতিচ্ছবি যোজকের কাজ করে। যেমন –

হামিদ বই পড়ছে, আর সীমা রান্না করছে।

সে ঘর ঝাড়ু দিল, ঘর মুছল, তারপর পড়তে বসল।

অঙ্ককার হয়ে এসেছে – বন্দুরাও মুখ ভার করে রাইল।

তোমরা চেষ্টা করেছ, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওনি – এতে দোষের কিছু নেই।

বাক্যের রূপান্তর

বাক্যের মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের পারস্পরিক রূপান্তর করা সম্ভব।

ক. সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্য

যে-সে, যিনি-তিনি, যারা-তারা, যা-তা ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, যেহেতু-সেহেতু, যখন-তখন, যত-তত, যেমন-তেমন ইত্যাদি সাপেক্ষ যোজক যুক্ত করে সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন –

সরল বাক্য: দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।

জটিল বাক্য: যেসব লোক দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।

সরল বাক্য: তুমি চেষ্টা না করায় বার্থ হয়েছ।

জটিল বাক্য: যেহেতু তুমি চেষ্টা করোনি, তাই বার্থ হয়েছ।

খ. জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সময়ে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজককে বাদ দিতে হয়। যেমন –

জটিল বাক্য: যারা পরিশ্রম করে, তারা জীবনে সফল হয়।

সরল বাক্য: পরিশ্রমীরা জীবনে সফল হয়।

জটিল বাক্য: যখন সে সুসংবাদটা পেল, তখন সে আনন্দিত হলো।

সরল বাক্য: সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো।

গ. সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য

যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্য করতে সরল বাক্যের মাঝখানের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়। সরল বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া থাকলে যৌগিক বাক্য গঠনের সময়ে আরেকটি ক্রিয়া তৈরি করে নিতে হয়। যেমন –

সরল বাক্য: তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ।

যৌগিক বাক্য: তুমি চেষ্টা করোনি, তাই ব্যর্থ হয়েছ।

সরল বাক্য: ভিজুককে টাকা দাও।

যৌগিক বাক্য: কিছু লোক ভিজুক করে, ওদের টাকা দাও।

ঘ. যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য

যৌগিক বাক্যে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে; অন্যদিকে সরল বাক্যে থাকে একটি সমাপিকা ক্রিয়া। তাই যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সময়ে মাঝখানের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করে নিতে হয়। যেমন –

যৌগিক বাক্য: সে এখানে এল এবং সব কথা খুলে বলল।

সরল বাক্য: সে এখানে এসে সব কথা খুলে বলল।

যৌগিক বাক্য: লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।

সরল বাক্য: লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।

ঙ. জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য

জটিল বাক্যের সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক বাদ দিয়ে যৌগিক বাক্য তৈরি করতে হয়। যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যেমন –

জটিল বাক্য: যখন বিপদ আসে, তখন দৃঢ়খণ্ড আসে।

যৌগিক বাক্য: বিপদ আসে এবং সঙ্গে দৃঢ়খণ্ড আসে।

জটিল বাক্য: যদি নিয়মিত সাঁতার কাটো, তবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

যৌগিক বাক্য: নিয়মিত সাঁতার কাটো, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

চ. যৌগিক বাক্য থেকে জটিল বাক্য

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করার সময়ে যৌগিক বাক্যের যোজক বাদ দিতে হয়। এর বদলে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক যুক্ত হয়। যেমন –

যৌগিক বাক্য: ছেলেটির বয়স অল্প; কিন্তু বেশ বৃদ্ধিমান।

জটিল বাক্য: যদিও ছেলেটির বয়স অল্প, তবু বেশ বৃদ্ধিমান।

যৌগিক বাক্য: দোষ করেছ; অতএব শান্তি পাবে।

জটিল বাক্য: যেহেতু দোষ করেছ, সেহেতু শান্তি পাবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. যে বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে কোন বাক্য বলে?

- ক. সরল
- খ. যৌগিক
- গ. জটিল
- ঘ. অধীন

২. 'তিনি ভাত খেয়ে চেয়ারে বসলেন' – বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া কোনটি?

- ক. ভাত
- খ. খেয়ে
- গ. চেয়ারে
- ঘ. বসলেন

৩. একধিক সমাপিকা ক্রিয়া কী দিয়ে যুক্ত হলে যৌগিক বাক্য হয়?

- ক. বিশেষ্য
- খ. বিশেষণ
- গ. যোজক
- ঘ. অনুসর্গ

৪. জটিল বাক্যের উদাহরণ কোনটি?

- ক. যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে।

- খ. পাখিঙ্গলো আকাশে উড়ছে।

- গ. আমরা তিনি ভাই এবং দুই বোন।

- ঘ. আমার সমৃদ্ধ দেখতে খুব ভাল লাগে।

৫. সময় বোঝাতে জটিল বাক্যে যোজকের কোন জোড় ব্যবহার করা হয়?

- ক. যে-সে
- খ. যত-তত
- গ. যেটুকু-সেটুকু
- ঘ. যখন-তখন

৬. নিচের কোনটি সরল বাক্য?

- ক. পরিশ্রমীরা জীবনে সাফল্য লাভ করে।

- খ. সে এখানে এল এবং বসে পড়ল।

- গ. লোকটি নিরঙ্গন, কিন্তু অভদ্র নয়।

- ঘ. বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।

৭. 'দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য' – বাক্যটিকে জটিল বাক্যে পরিণত করলে হবে –

- ক. যেসব লোক দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।
- খ. যে দুর্জন সেই পরিত্যাজ্য।
- গ. দুর্জন লোক মাত্রই পরিত্যাজ্য।
- ঘ. দুর্জন লোককে সকলে পরিত্যাগ করে।

৮. 'সে এখানে এসেই বসে পড়ল' – বাক্যটির মৌগিক বাক্যরূপ কোনটি?

- ক. সে এখানে এসে বসলো।
- খ. সে এখানে এসে বসে পড়ল।
- গ. সে এখানে এসে বসেছে।
- ঘ. সে এখানে এল, তারপরে বসে পড়ল।

৯. 'যখন সে সুসংবাদ পেল, তখন সে আনন্দিত হলো' – বাক্যটির সরল বাক্যরূপ কোনটি?

- ক. সে সুসংবাদ পেল এবং আনন্দিত হলো।
- খ. সুসংবাদ পেয়ে সে আনন্দিত হলো।
- গ. যেই সে সুসংবাদ পেল, সেই সে আনন্দিত হলো।
- ঘ. যদি সুসংবাদ পাও, তবে আনন্দিত হও।

পরিচ্ছেদ ৩৫

কারক

মূলত ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য ও সর্বনামের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কারক সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে সাধারণত বিভক্তি ও অনুসর্গ যুক্ত হয়ে থাকে।

কারক ছয় প্রকার: কর্তা কারক, কর্ম কারক, করণ কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক ও সম্বন্ধ কারক।

কর্তা কারক

ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে কর্তাকারক বলে। বাক্যের কর্তা বা উদ্দেশ্যই কর্তা কারক। কর্তা কারকে সাধারণত বিভক্তি যুক্ত হয় না। যেমন –

আমরা নদীর ঘাট থেকে রিকশা নিয়েছিলাম।

অনেকগুলো বন্য হাতি বাগান নষ্ট করে দিল।

কর্তা কারকে কথনো কথনো -এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন –

পাগালে কিনা বলে, ছাগালে কিনা খায়।

কর্ম কারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্ম কারক বলে। বাক্যের মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম – উভয় ধরনের কর্মই কর্ম কারক হিসেবে গণ্য হয়। সাধারণত মুখ্য কর্ম কারকে বিভক্তি হয় না, তবে গৌণ কর্ম কারকে ‘-কে’ বিভক্তি হয়। যেমন –

সে রোজ সকালে এক পেট ভাত খায়।

শিশুককে জানাও।

অসহায়কে সাহায্য করো।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সমাজের নানা রকম অঙ্গতা, গোড়ায়ি, ও কুসংস্কারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে গেছেন।

কার্যাভাষায় কর্মকারকে ‘রে’ বিভক্তি হয়। যেমন –

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা।

করণ কারক

যার দ্বারা বা যে উপায়ে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত ‘দ্বারা’, ‘দিয়ে’, ‘কর্তৃক’ ইত্যাদি অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন –

ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়।

চাষিরা ধারালো কাটে দিয়ে ধান কাটছে।

অপাদান কারক

যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'ইতে', 'থেকে' ইত্যাদি অনুসর্গ শব্দের পরে বসে। যেমন -

জমি থেকে ফসল পাই।

কাপটা উচ্চ টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

অধিকরণ কারক

যে কারকে স্থান, কাল, বিষয় ও ভাব নির্দেশিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত '-এ', '-র', '-রে', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন -

বাবা বাড়িতে আছেন।

বিকাল পাঁচটায় অফিস ছুটি হবে।

রাজীব বাংলা ব্যাকরণে ভালো।

সম্বন্ধ কারক

যে কারকে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়, তাকে সম্বন্ধ কারক বলে। এই কারকে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পরোক্ষ। এই কারকে শব্দের সঙ্গে '-র', '-এর', '-য়ের', '-কার', '-কের' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন -

ফুলের গাঢ়ে ঘূম আসে না।

আমার জামার বোতামগুলো একটু অন্য রকম।

তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে চলতে হতো মাইলের পর মাইল।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. বাকেয় ক্রিয়ার সঙ্গে কোন পদের সম্পর্ককে কারক বলে?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ক. বিশেষ্য ও বিশেষণ | খ. বিশেষ্য ও সর্বনাম |
| গ. বিশেষ্য ও অনুসর্গ | ঘ. বিশেষণ ও আবেগ |

২. ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই, তেমন কারকের নাম কী?

- | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|
| ক. সম্বন্ধ | খ. অপাদান | গ. অধিকরণ | ঘ. কর্তা |
|------------|-----------|-----------|----------|

৩. বাংলা ভাষায় কারকের সংখ্যা কয়টি?

- | | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| ক. তিনি | খ. চার | গ. পাঁচ | ঘ. ছয় |
|---------|--------|---------|--------|

৪. 'আমরা নদীর ঘাট থেকে বিকশা নিয়েছিলাম' – বাক্যটিতে আমরা কোন কারক?

- | | | | |
|----------|---------|--------|-----------|
| ক. কর্তা | খ. কর্ম | গ. করণ | ঘ. অপাদান |
|----------|---------|--------|-----------|

৫. যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কোন কারক বলে?

- | | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|
| ক. কর্তা | খ. কর্ম | গ. অধিকরণ | ঘ. অপাদান |
|----------|---------|-----------|-----------|

৬. 'শিক্ষককে জানাও' – এই বাকেয় 'শিক্ষককে' কোন কারক?

- | | | | |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ক. অধিকরণ | খ. অপাদান | গ. কর্তা | ঘ. কর্ম |
|-----------|-----------|----------|---------|

৭. 'ভেড়া দিয়ে চাষ করা সত্ত্ব নয়' – এই বাকেয় 'ভেড়া দিয়ে' কোন কারক?

- | | | | |
|------------|---------|--------|----------|
| ক. সম্বন্ধ | খ. কর্ম | গ. করণ | ঘ. কর্তা |
|------------|---------|--------|----------|

৮. 'জমি থেকে ফসল পাই' – বাক্যটিতে 'জমি থেকে' কোন কারক?

- | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|
| ক. করণ | খ. কর্ম | গ. অপাদান | ঘ. অধিকরণ |
|--------|---------|-----------|-----------|

৯. কোন কারকে মূলত ক্রিয়ার ছান, সময় ইত্যাদি বোঝায়?

- | | | | |
|-----------|-----------|------------|---------|
| ক. অপাদান | খ. অধিকরণ | গ. সম্বন্ধ | ঘ. কর্ম |
|-----------|-----------|------------|---------|

১০. 'গাছের ফল পেকেছে' – এখানে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে?

- | | | | |
|-------|--------|----------|-------|
| ক. -র | খ. -এর | গ. -য়ের | ঘ. -এ |
|-------|--------|----------|-------|

পরিচ্ছেদ ৩৬

বাচ্য

বাক্যের প্রকাশভঙ্গিকে বাচ্য বলে। বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার ভূমিকা বদলে গিয়ে একই বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হয়ে যায়। ক্রিয়া কথনে কর্তাকে অনুসরণ করে, ক্রিয়া কথনে কর্মকে অনুসরণ করে, আবার ক্রিয়াই কথনে বাক্যের মধ্যে মুখ্য হয়ে ওঠে। যেমন –

সে বাজারে যায়।

সাহসী ছেলেটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

উপরের প্রথম বাক্যে ‘যায়’ ক্রিয়াটি ‘সে’ কর্তার অনুসারী। দ্বিতীয় বাক্যে ‘করা হয়েছে’ ক্রিয়াটি ‘সাহসী ছেলেটিকে’ কর্মের অনুসারী। তৃতীয় বাক্যে ‘যাওয়া হচ্ছে’ ক্রিয়াই মুখ্য। প্রকাশভঙ্গির এই ভিন্নতা অনুযায়ী বাচ্য তিনি প্রকার: কর্তাবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

১. কর্তাবাচ্য

যে বাক্যের ক্রিয়া কর্তাকে অনুসরণ করে, তাকে কর্তাবাচ্য বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপটি কর্তার পক্ষ অনুযায়ী হয়। যেমন –

করনা ছবি আঁকে।

আমি আগামীকাল বাড়ি ফিরব।

অজীব বিশেষ্যও অনেক সময়ে কর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন –

ফ্যানটা অনেক জোরে ঘুরছে।

শরতে শিউলি ফোটে।

২. কর্মবাচ্য

যে বাক্যের ক্রিয়া কর্মকে অনুসরণ করে, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন –

পুলিশ কর্তৃক ডাকাত ধূত হয়েছে।

চিঠিটা পড়া হয়েছে।

৩. ভাববাচ্য

যে বাক্যের ক্রিয়া-বিশেষ্য বাক্যের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন –

আমার যাওয়া হলো না।

কোথা থেকে আসা হলো।

এখানে 'যাওয়া', 'আসা' – এগুলো হলো ক্রিয়া-বিশেষ্য।

বাচ্য পরিবর্তন

বাচ্য পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য

কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে কর্তার সঙ্গে দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক ইত্যাদি অনুসর্গ যোগ করতে হয় এবং ক্রিয়াকৃপকে কর্মের অনুসারী করতে হয়। যেমন –

কর্তৃবাচ্য: জাহানারা ইমাম একান্তরের দিনগুলি রচনা করেছেন।

কর্মবাচ্য: জাহানারা ইমাম কর্তৃক একান্তরের দিনগুলি রচিত হয়েছে।

কর্তৃবাচ্য: তারা বাড়িটি তৈরি করেছে।

কর্মবাচ্য: তাদের দ্বারা বাড়িটি তৈরি হয়েছে।

২. কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে কর্তার সঙ্গে যুক্ত দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গ বাদ দিতে হয় এবং ক্রিয়াকে কর্তার অনুসারী করতে হয়। যেমন –

কর্মবাচ্য: প্রধান শিক্ষক কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছে।

কর্তৃবাচ্য: প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন।

কর্মবাচ্য: আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

কর্তৃবাচ্য: আমরা কঠোর পরিশ্রম করি।

৩. কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য

কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে একটি ক্রিয়াবিশেষ্যকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নিয়ে আসতে হয়। যেমন –

কর্তৃবাচ্য: তুমি কখন এলে?

ভাববাচ্য: কখন আসা হলো?

কর্তৃবাচ্য: ওখানে কেন গোলে?

ভাববাচ্য: ওখানে কেন যাওয়া হলো?

৪. ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে ক্রিয়াকে কর্তার অনুসারী করতে হয়। যেমন –

ভাববাচ্য: একটু বাইরে বেড়িয়ে আসা যাক।

কর্তৃবাচ্য: একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি।

ভাববাচ্য: এবার বাঁশিটি বাজানো হোক।

কর্তৃবাচ্য: এবার বাঁশিটি বাজাও।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. বাচ্য বলতে বোঝায় -

- ক. বাকেয়ের অর্থ খ. বাকেয়ের প্রকাশভঙ্গ গ. বাকেয়ের ভাব ঘ. বাকেয়ের প্রয়োগ

২. বাকেয়ের মধ্যে কিসের ভূমিকা বদলে গিয়ে একই বাকেয়ের প্রকাশভঙ্গ আলাদা হয়?

- ক. যোজক খ. অনুসর্গ গ. আবেগ ঘ. ক্রিয়া

৩. বাচ্য কত প্রকার?

- ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৪. কর্তাবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে কোন পদকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়?

- ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. ক্রিয়া ঘ. ক্রিয়া-বিশেষ্য

৫. 'আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়' কর্মবাচ্যের এই বাক্যটি কর্তাবাচ্যে কী হবে?

- ক. আমরা কঠোর পরিশ্রম করি।
 খ. আমার দ্বারা কঠোর পরিশ্রম হয়।
 গ. আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা লাগে।
 ঘ. কঠোর পরিশ্রম আমাদের কাজ।

পরিচ্ছেদ ৩৭

উক্তি

বঙ্গার কথা উপস্থাপনের ধরনকে উক্তি বলে। উক্তি দুই প্রকার: প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি। যেমন -

ছেলেটি বলেছিল, “আজ আমি অনেক পড়েছি।” - এটি প্রত্যক্ষ উক্তি।

ছেলেটি বলেছিল যে, সেদিন সে অনেক পড়েছে। - এটি পরোক্ষ উক্তি।

যে উক্তিতে বঙ্গার কথা সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়, তাকে বলে প্রত্যক্ষ উক্তি। আর যে উক্তিতে বঙ্গার কথা অন্যের দ্বারা বর্ণিত হয়, তাকে বলে পরোক্ষ উক্তি।

প্রত্যক্ষ উক্তি লেখার সময়ে উদ্ধারচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন -

রফিক হেসে বললো, “আমি আপনাকে লক্ষ করিনি।”

কালো চুলের মানুষটি বলল, “দশ পর্যন্ত গুলতে পারি। যোগ কী আমার ধারণা আছে। কিন্তু বিয়োগ করতে পারি না।”

উক্তি পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উক্তির যেখান থেকে উদ্ধারচিহ্ন শুরু হয়, পরোক্ষ উক্তিতে সেখানে যোজক ‘যে’ বসে এবং উদ্ধারচিহ্ন উঠে যায়। যেমন -

প্রত্যক্ষ উক্তি: নেতা বললেন, “আমি জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে চাই।”

পরোক্ষ উক্তি: নেতা বললেন যে, তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে চান।

অর্থের সংগতি রাখার জন্য বাকে ব্যবহৃত সর্বনামের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। যেমন -

প্রত্যক্ষ উক্তি: রাজীব বললো, “আমি বাগান করা পছন্দ করি।”

পরোক্ষ উক্তি: রাজীব বললো যে, সে বাগান করা পছন্দ করে।

প্রত্যক্ষ উক্তি: মিহির বললো, “আমার জানামতে সবুজ এ বাসায় থাকে।”

পরোক্ষ উক্তি: মিহির বললো যে, তার জানামতে সবুজ সে বাসায় থাকতো।

পরোক্ষ উক্তিতে কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়াকলপের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন -

প্রত্যক্ষ উক্তি: লিপি বলল, “আমি এখনই বের হচ্ছি।”

পরোক্ষ উক্তি: লিপি বলল যে, সে তখনই বের হচ্ছে।

প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করার সময়ে কালবাচক ও ঝানবাচক শব্দের পরিবর্তন হয়।

যেমন -

প্রত্যক্ষ উক্তি: লোকটি বললেন, “আমি আগামীকাল এখানে আবার আসব।”

পরোক্ষ উক্তি: লোকটি বললেন যে, তিনি পরদিন সেখানে আবার যাবেন।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে চিরস্তন সত্ত্বের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে ত্রিয়ার কালের কোনো পরিবর্তন হয় না।
যেমন -

প্রত্যক্ষ উক্তি: শিক্ষক বললেন, “চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।”

পরোক্ষ উক্তি: শিক্ষক বললেন যে, চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

গুরু, অনুজ্ঞা ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে ভাব অনুযায়ী ত্রিয়ার পরিবর্তন করতে হয়। যেমন -

প্রত্যক্ষ উক্তি: মা আমাকে বললেন, “তোমাদের ক্লুলে গ্রীষ্মের ছুটি হবে কবে?”

পরোক্ষ উক্তি: মা আমার কাছে জানতে চাইলেন কবে আমাদের ক্লুলে গ্রীষ্মের ছুটি হবে।

প্রত্যক্ষ উক্তি: লোকটি আমাকে বললেন, ‘অনুগ্রহ করে আপনি সামনের আসনে বসুন।’

পরোক্ষ উক্তি: লোকটি আমাকে সামনের আসনে বসতে অনুরোধ করলেন।

প্রত্যক্ষ উক্তি: ছেলেটি বলে উঠলো, ‘বাহ! কৌ সুন্দর বাড়ি।’

পরোক্ষ উক্তি: ছেলেটি আনন্দের সঙ্গে বললো যে, বাড়িটি খুব সুন্দর।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের সময়ে কী ধরনের শব্দের বদল হয়?

- ক. কালবাচক খ. ছানবাচক গ. ভাববাচক ঘ. কালবাচক ও ছানবাচক

২. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোন যত্নচিহ্ন দিয়ে উক্তিকে আবদ্ধ করা হয়?

- ক. সেমিকোলন খ. কোলন গ. ড্যাশ ঘ. উদ্বাচচিহ্ন

৩. অর্থের সংগতি রাখার জন্য উক্তি পরিবর্তনের সময়ে কোন পদের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়?

- ক. সর্বনাম খ. বিশেষ্য গ. বিশেষণ ঘ. অনুসর্গ

৪. প্রত্যক্ষ উক্তিতে চিরস্তন সত্ত্বের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন হয় না -

- ক. উদ্বাচচিহ্নের খ. ত্রিয়ার কালের গ. ভাব বিশেষ্যের ঘ. নামবিভক্তির

৫. পরোক্ষ উক্তিতে ত্রিয়ারপের পরিবর্তন হয় কী অনুযায়ী?

- ক. কর্তা খ. কর্ম গ. উদ্দেশ্য ঘ. বিধেয়

পরিচেদ ৩৮

যতিচিহ্ন

মুখের কথাকে লিখিত রূপ দেওয়ার সময়ে কম-বেশি থামা বোকাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে যতিচিহ্ন বলে। বজ্ব্যকে স্পষ্ট করতেও কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যতিচিহ্নকে বিরামচিহ্ন বা বিরতিচিহ্নও বলা হয়।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত যতিচিহ্নগুলো হলো: দাঁড়ি (।), কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নচিহ্ন (?) , বিশ্বাচিহ্ন (!), হাইফেন (-), ড্যাশ (-), কোলন (:), বিন্দু (.), ত্রিবিন্দু (...), উকারচিহ্ন (' - ', " - "), বকনীচিহ্ন ((-)), ({-}), ([-]), বিকল্পচিহ্ন (/)।

১. দাঁড়ি (।)

দাঁড়ি সাধারণত বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশ করে। যেমন –

প্রাণ্ত ফুটবল খেলা পছন্দ করে।

যথার্থ অনুসন্ধানের পর বলা যাবে কী ঘটেছিল।

২. কমা (,)

কমা সামান্য বিরতি নির্দেশ করে। শব্দ, বর্গ ও অধীন বাক্যকে আলাদা করতে কমার ব্যবহার হয়। যেমন –

গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমত, শীত ও বসন্ত – বাংলাদেশ এই ছয়টি ঋতুর দেশ।

নিবিড় অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও সময়নিষ্ঠ থাকলে সাফল্য আসবে।

সুজন, দেখ তো কে এসেছে।

কাল তুমি যাকে দেখেছ, তিনি আমার বাবা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছু না করাই তো পাপ।”

৩. সেমিকোলন (;)

যাধীন অথচ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করার কাজে অথবা একই ধরনের বর্গকে পাশাপাশি সাজাতে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন –

সোহাগ ত্রিকেট পছন্দ করে; আমি ফুটবল পছন্দ করি।

কোনো বইয়ের সমালোচনা করা সহজ; কিন্তু বই লেখা অত সহজ নয়।

তিনি পড়েছেন বিজ্ঞান; পেশা ব্যাংকার; আর নেশা সাহিত্যচর্চ।

৪. প্রশ্নচিহ্ন (?)

সাধারণত কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন বসে। যেমন –

তারা কখন এসেছে?

বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী?

৫. বিস্ময়চিহ্ন (!)

সাধারণত বিস্ময়, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশের জন্য বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন -

মানে কী! সে আর চাকরি করবে না!

তার গানের কষ্ট দারুণ!

৬. হাইফেন (-)

বাকের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন -

মা-বাবার কাছে সন্তানের গৌরব সবচেয়ে বড়ো গৌরব।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

৭. ড্যাশ (-)

সাধারণত দুটি বাক্যকে এক বাকে পরিণত করার কাজে এবং ব্যাখ্যাযোগ্য বাক্যাংশের আগে-পরে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন -

বাংলাদেশ দল জয়লাভ করেছে - বিজয়ের আনন্দে দেশের জনগণ উচ্ছ্বসিত।

ঐ লোকটি - যিনি গতকাল এসেছিলেন - তিনি আমার মামা।

৮. কোলন (:)

বাকের প্রথম অংশের কোনো উক্তিকে দ্বিতীয় অংশে ব্যাখ্যা করা এবং উদাহরণ উপস্থাপনের কাজে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন -

ভাষার দুটি রূপ: কথ্য ও লেখ্য।

সভার সিদ্ধান্ত হলো: প্রতি মাসে সব সদস্যকে দশ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে।

৯. উক্তারচিহ্ন (' - '), (" - ")

কোনো কিছু উদ্ধৃত করার কাজে উক্তারচিহ্নের ব্যবহার হয়। উক্তারচিহ্ন দুই রূক্ম: একক ও দ্বৈত। যেমন -

'সিরাজউদ্দৌলা' একটি ঐতিহাসিক নাটক।

আমাদের কষ্ট তনে প্রিয়স্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এল, "ও আপনারা এসে গেছেন! বাসা চিনতে কোনো কষ্ট হয়নি তো?"

১০. বঙ্কনী (), { }, []

অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন ও কালনির্দেশের ক্ষেত্রে বঙ্কনীর ব্যবহার হয়। বঙ্কনী তিন প্রকার: প্রথম বঙ্কনী (), দ্বিতীয় বঙ্কনী { } ও তৃতীয় বঙ্কনী []। যেমন -

তিনি বাংলা ভাষার বিবর্তন (চর্যাপদের সময় থেকে পরবর্তী) নিয়ে আলোচনা করবেন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত।

১১. বিন্দু (.)

শব্দসংকেপ, ত্রুমনির্দেশ ইত্যাদি কাজে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। যেমন -

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

ভাষার প্রধান উপাদান চারটি: ১. ধরনি, ২. শব্দ, ৩. বাক্য ও ৪. বাগর্থ।

১২. ত্রিবিন্দু (...)

কোনো অংশ বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিন্দুর ব্যবহার হয়। যেমন -

তিনি রেগে গিয়ে বললেন, “তার মানে তুমি একটা ...।”

আমাদের ঐক্য বাইরের। ... এ ঐক্য জড় অকর্মক, সজীব সকর্মক নয়।

১৩. বিকল্পচিহ্ন (/)

একটির বদলে অন্যটির সম্ভাবনা বোঝাতে বিকল্পচিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন -

শুন্দ/অশুন্দ চিহ্নিত করো।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. যতিচিহ্নের অপর নাম কী?

ক. বিরামচিহ্ন খ. বিরতিচিহ্ন গ. বিস্থায়চিহ্ন ঘ. ক ও খ উভয়ই

২. বাক্যের পূর্ণ সমাপ্তি বা পূর্ণ বিরতি নির্দেশ করতে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. কমা খ. সেমিকোলন গ. বিকল্পচিহ্ন ঘ. দাঁড়ি

৩. শব্দ, বর্গ ও অধীন বাক্যকে আলাদা করতে ব্যবহৃত হয় -

ক. দাঁড়ি খ. কমা গ. সেমিকোলন ঘ. কোলন

৪. দুটি অধীন বাক্যের মধ্যে অর্থের ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. কমা খ. কোলন গ. সেমিকোলন ঘ. বিকল্পচিহ্ন

৫. প্রশ্ন বোঝাতে কোন যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়?

ক. প্রশ্নচিহ্ন খ. বিস্থায়চিহ্ন গ. দাঁড়ি ঘ. উদ্ধারচিহ্ন

৬. শব্দসংকেপ ও ক্রম নির্দেশ করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. বিন্দু খ. ত্রিবিন্দু গ. বিকল্পচিহ্ন ঘ. কোলন

৭. লেখার সময়ে কোনো কথা অব্যক্ত রাখতে চাইলে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়?

ক. বিন্দু খ. ত্রিবিন্দু গ. কমা ঘ. কোলন

পরিচ্ছেদ ৩৯

বাগর্থ

ভাষা ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ করা। মনের ভাব প্রকাশ করতে মানুষ শব্দ ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। এগুলোর অর্থই মূলত বঙ্গ ও শ্রোতার মধ্যে সংযোগ ঘটায়। শব্দ ও শব্দগুচ্ছের অর্থকে বাগর্থ বলে।

অর্থের শ্রেণিবিভাগ

শব্দের অর্থ জন্মত দুই রকমের। কোথাও শব্দের গাঠনিক উপাদানগুলোর অর্থ প্রাধান্য পায়, আবার কোথাও গাঠনিক অর্থ ছাপিয়ে শব্দের ভিত্তি অর্থ তৈরি হয়। এই দুই ধরনের অর্থের নাম – বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ।

বাচ্যার্থ: একটি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে ছবি বা বোধ জেগে ওঠে, সেটাই শব্দটির বাচ্যার্থ। অভিধানে অর্থ গ্রহণের বেলায় শব্দের বাচ্যার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ‘মাথা’ শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের যে ছবি মনে ভেসে ওঠে, তা-ই ‘মাথা’ শব্দের বাচ্যার্থ। বাচ্যার্থ হলো শব্দের মুখ্য অর্থ। এই অর্থকে আক্ষরিক অর্থও বলা হয়ে থাকে।

লক্ষ্যার্থ: একটি শব্দের বাচ্যার্থের বাইরেও আলাদা অর্থ তৈরি হতে পারে। এই আলাদা অর্থের নাম লক্ষ্যার্থ। যেমন: ‘তিনি গ্রামের মাথা’ – এখানে ‘মাথা’ শব্দ শোনার পরে শ্রোতার মনে শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের কোনো ছবি ভেসে ওঠে না, মাননীয় কোনো ব্যক্তির ছবি ভেসে ওঠে। লক্ষ্যার্থকে গৌণার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ বলা হয়ে থাকে।

শব্দের অর্থ পরিবর্তন

ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় শব্দের অর্থ কখনো প্রসারিত হয়, কখনো সংকৃতিত হয়; কখনো অর্থের উন্নতি ঘটে, কখনো অবনতি ঘটে; আবার শব্দ কথনে সম্পূর্ণ ভিত্তি অর্থ গ্রহণ করে। অর্থের এসব পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

অর্থপ্রসার: একটি শব্দ পূর্বে যে অর্থ প্রকাশ করতো, তার থেকে আরো ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করলে বুঝতে হয় অর্থপ্রসার ঘটেছে। যেমন – ‘অধ্বল’ শব্দের মূল অর্থ শাড়ির পাঢ়। অধ্বল থেকে উত্তৃত আঁচল শব্দটি এখনও তা

নির্দেশ করে। তবে অঞ্চল শব্দটি এখন শাড়ির পাড় নির্দেশের পাশাপাশি এলাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে 'বর্ষ' শব্দের পূর্ববর্তী অর্থ বর্ষাকাল, প্রসারিত অর্থ 'বছর' (ছয় খাতু সংবলিত)।

অর্থসংকোচ: অর্থসংকোচের ফলে একটি শব্দের পূর্ববর্তী অর্থের ব্যাপ্তি কমে। যেমন এক সময়ে 'মৃগ' শব্দের দ্বারা সকল পশুকে বোঝানো হতো। এর উদাহরণ পাওয়া যায় 'মৃগয়া', 'মৃগরাজ' প্রভৃতি শব্দের অর্থে। শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে পশুশিকার ও পশুদের রাজা। কিন্তু অর্থ সংকোচনের ফলে 'মৃগ'র অর্থ দাঁড়িয়েছে কেবল হরিণ। আবার এক সময়ে 'অঙ্গ' বলতে বোঝানো হতো যে-কোনো খাদ্য (মিষ্টান্ন, পলান্ন)। কিন্তু এখন 'অঙ্গ' বলতে বোঝানো হয় ভাত।

অর্থের উন্নতি: একটি শব্দের অর্থ আগের চেয়ে ভালো অর্থ ধারণ করতে পারে। অর্থের একটি পরিবর্তনকে বলা হয় অর্থের উন্নতি। যেমন 'অপরাহ্ন' শব্দটি পূর্বে নির্দেশ করত শ্রীহীনতাকে, এখন এটি অনৰ্বাচনীয় সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে। কিংবা 'সাহস' শব্দের পূর্বতন অর্থ ছুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কাজ কিন্তু বর্তমান অর্থ নিভীকৃতা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উদ্যম।

অর্থের অবনতি: ইতিবাচক অর্থের শব্দ নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে অর্থের অবনতি বলে। যেমন, দুর্দশ শব্দের অর্থ ছিল মিলন (দুর্দশ সমাস), এখন এর অর্থ বিরোধ। কিংবা 'জেঠামি' শব্দটি জেঠা-সংশ্লিষ্ট হয়ে সম্মানিত বোঝাতে পারত। কিন্তু তা ব্যবহৃত হয় 'পাকামি' অর্থে বা হেয়-অর্থে 'জ্যাঠার ভাব' বোঝাতে। বাংলাদেশে 'রাজাকার' শব্দটি এভাবে নেতিবাচক অর্থ লাভ করেছে।

অর্থ-বদল: অর্থের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কখনো শব্দের অর্থটি এমন দূরবর্তী হয়ে ওঠে যে, তা থেকে শব্দটির মূল অর্থ উদ্ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ ছিল ধর্মসম্প্রদায়। তবে পরিবর্তিত হয়ে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে ধর্মদ্রোহী উৎপীড়ক কিংবা নির্দৃষ্ট। আবার 'গবাঙ্ক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গরুর চোখ। এখন 'গবাঙ্ক' শব্দের অর্থ হয়েছে জানালা।

বাক্যে অর্থ পরিবর্তন

শব্দের অর্থগত পরিবর্তন কেবল ক্লাপমূলের অর্থের মধ্যে সীমিত থাকে না। বাক্যে প্রয়োগভেদে শব্দের নানারকম অর্থ-বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে। তাছাড়া এমনিতেও একটি শব্দের দ্বি-অর্থবাচকতা বা বহু-অর্থবাচকতা থাকতে পারে। এমনকি বাক্যভঙ্গির কারণে অর্থ-ভিন্নতা পাওয়া যায়।

উদাহরণ: ১. (ক) সে মাথায় আঘাত পেয়েছে।

(খ) তিনি আমাদের গ্রামের মাথা।

(গ) সে রাস্তার মাথায় অপেক্ষা করছে।

(ঘ) আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে মাথায় তুলেছে!

২. (ক) সে আমাদের রক্ষাকর্তা।

(খ) হ্যাঁ, সে আমাদের রক্ষাকর্তা বটে!

দাগ-অঙ্গিত শব্দগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, উদাহরণ ১-এ 'মাথা' শব্দটি বাকের প্রেক্ষাপটে নানা রকম অর্থ তৈরি করেছে। উদাহরণ ২-এ বাকভিপির কারণে এক বাক্যই তিনি অর্থ উৎপাদন করেছে। আসলে শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্যের ব্যাপারটিকে সৃত বা নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. একটি শব্দ শোনার সাথে সাথে আমাদের মনে যে ছবি বা বোধ জেগে ওঠে তাকে কী বলে?

- ক. শব্দার্থ
- খ. লক্ষ্যার্থ
- গ. বাচ্যার্থ
- ঘ. বাগর্থ

২. 'বাচ্যার্থ' শব্দের কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?

- ক. মুখ্য
- খ. গৌণ
- গ. প্রত্যক্ষ
- ঘ. পরোক্ষ

৩. বকার উদ্দেশ্যে অনুযায়ী বাচ্যার্থকে উপেক্ষা করে শব্দের আলাদা অর্থ তৈরি করলে, তা হয় -

- ক. লক্ষ্যার্থ
- খ. আক্ষরিক অর্থ
- গ. গাঠনিক অর্থ
- ঘ. বাগর্থ

৪. অধঃল শব্দটি শাড়ির পাঢ় না বুবায়ে এলাকা বোবালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?

- ক. অর্থপ্রসার
- খ. অর্থসংকোচ
- গ. অর্থের উন্নতি
- ঘ. অর্থের অবনতি

৫. মৃগয়া শব্দের দ্বারা হরিণ বোবালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?

- ক. অর্থপ্রসার
- খ. অর্থসংকোচ
- গ. অর্থ-বদল
- ঘ. অর্থের উন্নতি

পরিচ্ছেদ ৪০

বাগধারা

বাক্যের বর্গ যখন বাচ্যার্থ বা আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাগধারা বলে। বাগধারার প্রয়োগে ভাষা প্রাপ্তবন্ত হয় এবং বাক্য অধিক ব্যঙ্গনা সৃষ্টি করতে পারে। বাগধারা যেহেতু আক্ষরিক অর্থ ধারণ করে না, সেহেতু বাগধারা ঠিক কী অর্থ প্রকাশ করে ভাষা-ব্যবহারকারীকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়। বাগধারা এক অর্থে অতীত কালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার স্মারক।

নিচে প্রচলিত কিছু বাগধারার প্রয়োগ-উদাহরণ দেওয়া হলো।

অক্ষা পাওয়া (মারা যাওয়া): খারাপ লোকটা আরো আগেই অক্ষা পেতে পারত।

অক্ষরে অক্ষরে (যথাযথ): দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাই।

অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যের খেলা): যানজট অদৃষ্টের পরিহাস নয়, মানুষেরই তৈরি।

অনধিকার চর্চা (অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ): অনধিকার চর্চা তার রোগ, সব কিছুতেই কথা বলা চাই।

অন্ধকার দেখা (দিশেছারা হয়ে পড়া): কাজের চাপে চারদিকে অন্ধকার দেখছি।

অঙ্কের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন): ছেলেটাই ছিল বিদ্বার অঙ্কের যষ্টি।

আমাবস্যার চাঁদ (দুর্ভিল বন্ধ): তোমার দেখাই পাই না আজকাল, একেবারে আমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে!

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল অনুনয়): কৃপণ লোকের কাছে কিছু চাওয়া আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা।

অর্ধচন্দ্ৰ (ঘাড় ধাক্কা দেয়া): চাইলাম চাঁদা, পেলাম অর্ধচন্দ্ৰ!

আঁতে ঘা (খুব কষ্ট): তোমার প্রতিবেদনে ওইসব লোকের আঁতে ঘা লেগেছে।

আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা): আলু বিনিয়োগে বেশি লাভের আশা! আকাশ কুসুম চিন্তা ছাড়া কিছু নয়।

আগুন নিয়ে খেলা (বিপজ্জনক ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করা): তুমি আমার সাথে আগুন নিয়ে খেলতে এসো না।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়োলোক হওয়া): আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তো, তাই কথাবার্তার ধ্রন
বদলে গেছে।

আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা): সাত দিনের মধ্যে ও করবে এই কাজ! ওর তো আঠারো মাসে বছর।

আদা-জল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা): এতদিন কাজটা ফেলে রেখেছিলে, এবার আদা-জল খেয়ে লেগে
দেখো শেষ করতে পারো কিনা।

আমড়া কাঠের টেকি (অপদার্থ): তার মতো আমড়া কাঠের টেকি লাখে একটা মেলে।

আষাঢ়ে গল্ল (আজগুবি গল্ল): বৰ্ষাকালে আষাঢ়ে গল্ল না হলে কি আসব জমে?

ইচড়ে পাকা (অকালপক্ষ): ইচড়ে পাকা ছেলেমেয়েদের দিয়ে এমন কাজ করানো কঠিন।

ইতর বিশেষ (পার্থক্য): দুজনের কাজের মাঝে অনেক ইতর বিশেষ আছে।

উড়নচঞ্চী (বেহিসেবি): যেমন উড়নচঞ্চী মেয়ে তেমন উড়নচঞ্চী জামাই।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অগ্রত্যাশিতভাবে জায়গা দখল করা): উড়ে এসে জুড়ে বসা লোকের মুখে অনধিকার চর্চার উপদেশ মানায় না।

উড়োকথা (গুজব): উড়োকথায় কান দিয়ো না।

উড়োচিঠি (বেনামি চিঠি): এমন উড়োচিঠির উপর ভিসি করে তদন্ত করা ঠিক হবে না।

উন্ম-মধ্যম (বেদম প্রহার): সব চোরের কপালেই উন্ম-মধ্যম লেখা থাকে, তা থেকে রেহাই নেই।

উনিশ-বিশ (সামান্য পার্থক্য): বইটির প্রথম সংস্করণ আর দ্বিতীয় সংস্করণে পার্থক্য উনিশ-বিশ।

এককথার মানুষ (দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি): আমি এককথার মানুষ; বলেছি যখন, করেই দেখাব।

এক ঢিলে দুই পাখি (এক প্রচেষ্টায় দুই ফল): বুঁবেছি, তুমি এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাও।

এলাহি কাও (বিরাট আয়োজন): এমন এলাহি কাও করে বসেছ! অথচ কিনা সামান্য জন্মদিনের অনুষ্ঠান।

এসপার ওসপার (চড়ান্ত মীমাংসা): আজ ওর সঙ্গে এসপার ওসপার করে তবেই ঘরে ফিরব।

ওজন বুঁৰে চলা (আত্মস্মান রক্ষা করা): নিজের ওজন বুঁৰে চললে এরকম সম্মানহানি হতো না।

কচুকাটা করা (ধৰংস করা): ওর সাথে লাগতে যেও না, কচুকাটা করে ছাড়বে।

কড়ায় গড়ায় (চুলচেরা হিসাব): হিসাবের খাতায় সব লিখে রেখেছি, সময়মতো কড়ায় গড়ায় আদায় করা যাবে।

কথার কথা (গুরাত্মুহীন কথা): এটা একেবারেই কথার কথা, মানতেই হবে এমন নয়।

কপাল ফেরা (সৌভাগ্য লাভ): বহু কাল দুঃখে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তার কপাল ফিরল।

কলমের এক খৌচা (লিখিত আদেশ): কলমের এক খৌচা দুর্বৃত্তদের চাকরি চলে গেল।

কলুর বলদ (একটানা খাটুনি): মা সারাজীবন সংসারে কলুর বলদের মতো খেটেই গেলেন।

কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন): উঠতি ধনীদের কাঁচা পয়সার গরমে বাজারে সব কিছুর দাম বাঢ়ছে।

কাগজে কলমে (লিখিতভাবে): কাগজে-কলমে সব প্রমাণ রয়েছে।

কাছাচিলা (অসাবধান): এমন কাছাচিলা লোক দিয়ে দারোয়ানের কাজ হবে না।

কাঠখোট্টা (নীরস ও অনমনীয়): এমন কাঠখোট্টা লোককে দিয়ে রাজনীতি হয় না।

কানকাটা (নির্জন): তার মতো কানকাটা লোক এমন মিষ্টি গালিতে অপমান বোধ করে না।

কান খাড়া করা (ওত পেতে থাকা): সাবধানে কথা বলো, আশেপাশে কেউ হয়তো কান খাড়া করে আছে।

কান ভাঙ্গনো (কুপরামর্শ): ও নিশ্চয় আমার নামে কান ভাঙ্গিয়েছে। আর তুমিও তা বিশ্বাস করে বসে আছ।

কিস্তিমাত করা (সফলতা লাভ): সবচেয়ে বড়ো পুরকারটা পেয়ে সে একেবারে কিস্তিমাত করেছে।

কুঁয়োর ব্যাঙ (সংকীর্ণমনা লোক): ও রকম কুঁয়োর ব্যাঙ দিয়ে নতুন কিছু করা যাবে না।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না): শত প্রতিকূল পরিবেশেও এরা কৈ মাছের প্রাণ হয়ে বাঁচে।

কোমর বাঁধা (দৃঢ় সংকল্প): কোমর বাঁধে কাজে নেমে পড়ো, সফলতা আসবেই।

খয়ের খী (চাটুকার): খয়ের খী থেকে একটু সাবধান থেকো।

খেজুরে আলাপ (অকাজের কথা): কাজের সময়ে খেজুরে আলাপ করতে ভালো লাগে না।

গড়লিকা প্রবাহ (অক্ষ অনুকরণ): গড়লিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে পথ চলতে শেখো।

গভীর জলের মাছ (খুব চালাক): ওর মতো গভীর জলের মাছকে নাগালে আনা কঠিন।

গরম গরম (তৎক্ষণাত্): সাংবাদিকরা গরম গরম ঘবর পেলে খুব খুশি হয়।

গা ঢাকা দেওয়া (পলায়ন করা): কোম্পানির টাকা আসার করে এখন সে গা ঢাকা দিয়েছে।

গায়ে পড়া (অ্যাচিত): গায়ে পড়ে কোনো কাজ করতে যেও না বাপু।

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো (ফাঁকির মনোভাব): গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো যার অভাব, তাকেও দলে রাখতে হলো।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য): বাড়ের কারণে আম ব্যবসায়ীদের লাভের আশা এবার গুড়ে বালি।

গৌফ থেঁজুরে (খুব অলস): গৌফ থেঁজুরে লোককে দিয়ে এসব কাজ হবে না।

গোড়ায় গলদ (শুরুতেই ভুল): গোড়ায় গলদ করলে হিসাব মিলবে কী করে?

গোলায় যাওয়া (নষ্ট হওয়া): সৎ সঙ্গে মিশলে গোলায় যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা): দাণ্ডরিক কাজে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যেয়ো না, বিপদে পড়বে।

ঘোড়ার ডিম (কিছুই না): আশ্ফালন কোরো না, তুমি আমার ঘোড়ার ডিম করতে পারবে।

চশমখোর (বেহায়া): এমন চশমখোর লোকের সাথে আমি মিশি না।

চিনির বলদের মতো ঘানি টানা (ফল লাভে অংশীদার না হওয়া): সারাজীবন চিনির বলদের মতো ঘানি টানলে, বিনিময়ে কিছুই পেলে না।

চিনে জঁক (নাছোড়বান্দা): লোকটি এ কাজ পাওয়ার জন্য একেবারে চিনে জঁকের মতো লেগে আছে।

চুনোপুটি (সামান্য ব্যক্তি): সকলকে চুনোপুটি ভেবে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

চুলোয় যাওয়া (নষ্ট হওয়া): ছোট একটা ভুলের জন্য এমন পরিশ্রমের কাজটা শেষ পর্যন্ত চুলোয় গেল।

চোখ পাকানো (রাগ দেখানো): আমার দিকে এমন চোখ পাকানোর কারণ কী?

চোখ বুঁজে থাকা (ভূমিকা না রাখা): প্রতিবেশীর বিপদে চোখ বুঁজে থাকতে নেই।

চোখে সরয়ে ফুল দেখা (বিপদে দিশেহারা হওয়া): পরীক্ষা সামনে, তাই চোখে সরয়ে ফুল তো দেখবেই।

ছা-পোষা (অত্যন্ত গরিব): ছা-পোষা লোক আমি, দেশ নিয়ে ভাবার সময় কোথায়?

ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য): সবকিছু ছেলের হাতের মোয়া ভেবো না।

জগাখিচুড়ি (বিশৃঙ্খল): সবকিছু জগাখিচুড়ি করে রেখেছ দেখছি!

জিলাপির পাঁচ (কৃটবুদ্ধি): বাইরে থেকে দেখতে সরল হলেও লোকটির অন্তরে জিলাপির পাঁচ।

বোপ বুঁবো কোপ মারা (অবস্থা বুঁবো সুযোগ হাবল): তিনি বোপ বুঁবো কোপ মেরে সফল হয়েছেন।

টইটমুর (ভরপুর): বৃষ্টির পানিতে পুকুরটা একেবারে টইটমুর হয়ে আছে।

টিনক নড়া (সজাগ হওয়া): আগে কথা বললে না, এতক্ষণে তোমার টিনক নড়ল?

টাকার গরম (বিস্তার অহংকার): সব সময়ে টাকার গরম দেখানো ঠিক নয়।

ঠোঁট কাটা (বেহায়া): আজকাল ঠোঁটকাটা লোকের অভাব নেই।

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া): আগে ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নেই, পরে অন্য কথা।

ডুব মারা (পালিয়ে যাওয়া): যেই আমি বিপদে পড়লাম, অমনি তোমরা সবাই ডুব মারলে।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু): তুমি দেখি একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ!

তালকানা (কাঞ্জানইন): এমন তালকানা লোকের সাথে চলা যায় না।

তালপাতার সেপাই (ছিপছিপে): শরীরের প্রতি যত্ন নাও, দিন দিন তুমি তো তালপাতার সেপাই হয়ে যাচ্ছ।

তাসের ঘর (ঘলঘাসী): বাবার চাকরি যাওয়ায় মায়ের সব স্পন্দন তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

তিলকে তাল করা (ছোটোকে বড়ো করা): তিলকে তাল করা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

তীর্থের কাক (সুযোগ সন্ধানী): শরণার্থীরা রিলিফের চালের জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।

তেল মাখানো (তোশামোদ): সাহেবকে তেল মাখানোর লোকের অভাব নেই।

থতমত খাওয়া (অপ্রস্তুত হয়ে পড়া): ক্লাসে হঠাৎ নতুন শিক্ষক দেখে সবাই থতমত খেয়ে গেলাম।

দা-কুমড়া সম্পর্ক (শক্রতা): বাপ-চাচাদের দা-কুমড়া সম্পর্ক এখন চাচাতো ভাইদের মধ্যে টিকে আছে।

দিবাস্বপ্ন (অলীক কল্পনা): দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে না এমন লোক মেলা ভার।

দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু): সুযোগসন্ধানীরা সব সময়ে দুধের মাছির মতো ক্ষমতার আশপাশে ঘোরে।

ধরাকে সরা জ্ঞান (অহংকার করা): তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছ!

ননীর পৃতুল (শ্রমবিমুখ): ছেলেটাকে একেবারে ননীর পৃতুল বানিয়ে রেখেছে, কোনো কাজ করতে দেয় না।

নয়-ছয় (অপব্যবহার): তুমি নয়-ছয় করে টাকাগুলো শেষ কোরো না।

পটল তোলা (মারা যাওয়া): আজ বাদে কাল পটল তুলবে, অর্থচ তার মিথ্যাচার গেল না।

পুঁটি মাছের প্রাণ (ছোটো মন): পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে নেতা হওয়া যায় না।

বইয়ের পোকা (সব সময়ে বই পড়ে এমন): পরিচিত লোকদের কাছে বইয়ের পোকা হিসেবে তার নাম আছে।

বর্ণচোরা (ভঙ্গ): বর্ণচোরা লোকেরা খুব সহজেই অন্যদের বিপদে ফেলে।

বাঘের দুধ (অসম্ভব বস্তু): টাকায় কী না হয়? বাঘের দুধ মেলে।

বিনা মেঘে বজ্রপাত (অপ্রত্যাশিত বিপদ): সন্তানের মৃত্যুসংবাদ তার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো।

বুদ্ধির টেকি (নির্বোধ): তোমার বিবেচনার বলিহারি, অমন বুদ্ধির টেকির কাছে গেছ বুদ্ধি নিতে!

ভরাডুবি (সর্বনাশ): ব্যাবসা তো ভালোই গুছিয়েছিলে, এমন ভরাডুবি হলো কীভাবে?

ভিজে বিড়াল (কপট বাঙ্কি): সাবধান, আমাদের চারদিকে ভিজে বিড়ালের অভাব নেই।

ভিটায় ঘুঘু চৰানো (নিঃস্ব করা): ও হমকি দিয়ে বলেছে, আমার ভিটায় নাকি ঘুঘু চৰাবে।

ভুইফোড় (নতুন আগমন): ভুইফোড় সাংবাদিকদের কারণে প্রকৃত সাংবাদিকের সম্মান ক্ষণ্ণ হচ্ছে।

মগের মুলুক (আরাজকতা): দেশ তো আর মগের মুলুক হয়ে যাবানি যে, এমন দুর্ব্যাপক করে পার পেয়ে যাবে।

মণিকাঞ্জন যোগ (উপযুক্ত মিলন): যেমন বর তেমন কলে – এ যেন মণিকাঞ্জন যোগ।

মানিক জোড় (গভীর সম্পর্ক): সহকর্মীদের এমন মানিক জোড় খুব কমই দেখা যায়।

লেফাফা দুরস্ত (বাইরে পরিপাটি): লোকটি লেফাফা দুরস্ত হলে কী হবে, আসলে মূর্খ।

সঙ্গমে চড়া (প্রচণ্ড উত্তেজনা): এসব দুর্ব্যাপক দেখে তার মেজাজ সঙ্গমে চড়ে গেল।

সোনায় সোহাগা (উপযুক্ত মিলন): বর-কনেকে খুব সুন্দর মানিয়েছে, এ যেন সোনায় সোহাগা।

হাতটান (চুরির অভ্যাস): লোকটির হাতটানের অভ্যাস আছে, সাবধানে থেকো।

হাতেখড়ি (শিক্ষার শুরু): ওন্দাদ রিভল ইসলামের কাছে তাঁর সংগীত চর্চার হাতেখড়ি হয়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক টিক (✓) দাও।

১. বাকেয়ের বর্গ যখন বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে কী বলে?

- ক. প্রত্যয় খ. বাগুধারা গ. সমাস ঘ. কারক

২. কী প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষা প্রাণবন্ত ও বাক্য অধিক ব্যঙ্গনা সৃষ্টি করতে পারে?

- ক. বাগুধারা খ. প্রত্যয় গ. কারক ঘ. সমাস

৩. বাগুধারা ব্যবহারের সময়ে ভাষা ব্যবহারকারীকে কোন বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?

- ক. শব্দ খ. অর্থ গ. প্রয়োগ ঘ. বর্গ

৪. বাগুধারা অতীত কালের কোন ঘটনার আরক?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ক. সামাজিক-অর্থনৈতিক | খ. সামাজিক-রাজনৈতিক |
| গ. সামাজিক-মানসিক | ঘ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক |

৫. নিচের কোনটি 'আক্ষের যষ্টি' অর্থ প্রকাশ করছে?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ক. ভাগ্যের খেলা | খ. দুর্লভ বন্ধ |
| গ. অসম্ভব কঢ়না | ঘ. একমাত্র অবলম্বন |

৬. 'দৃঢ় সংকল্প' অর্থ কোন বাগুধারার মধ্যে রয়েছে?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. একচোখা | খ. এক কথার মানুষ |
| গ. উড়ন্টচণ্ডী | ঘ. কংস মামা |

৭. নিচের কোন অর্থটি 'কৈ মাছের প্রাপ' বাগুধারার সঠিক অর্থ প্রকাশ করে?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক. সংকীর্ণমনা লোক | খ. খুব অলস |
| গ. খুব চালাক | ঘ. যা সহজে মরে না |

৮. 'পটল তোলা'-এর সমার্থক বাগুধারা কোনটি?

- | | |
|-----------------|------------|
| ক. অঙ্কা পাওয়া | খ. তালকানা |
| গ. ডুব মারা | ঘ. ভরাডুবি |

পরিচ্ছেদ ৪১

প্রতিশব্দ

যেসব শব্দের অর্থ অভিমুখ বা প্রায় সমান, সেসব শব্দকে প্রতিশব্দ বলে। যেমন 'ঘর' শব্দের প্রতিশব্দ 'গৃহ', 'নির্বাচন' শব্দের প্রতিশব্দ 'বাছাই', 'কথা' শব্দের প্রতিশব্দ 'বাণী' ইত্যাদি। বাকেয়ের প্রকাশকে সাবলীল ও বাকেয়ের অর্থকে সুস্পষ্ট করতে যথাযথ প্রতিশব্দ খুঁজে নিতে হয়। প্রতিশব্দ সব সময়ে প্রতিষ্ঠাপনযোগ্য না-ও হতে পারে – প্রসঙ্গের উপরে প্রতিশব্দের ব্যবহার নির্ভর করে। যেমন 'গৃহহীন'-কে 'ভবনহীন' বলা যায় না, 'নির্বাচন কমিশন'-কে 'বাছাই কমিশন' বলা যায় না, কিংবা বক্তব্য মুখে 'কথার ঘই ফোটে' বলা গেলেও 'বাণীর ঘই ফোটে' বলা যায় না।

নিচে কিছু শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হলো।

অক্ষমাত্ম : আচমকা, হঠাত, সহসা, অতর্কিত, দৈবাত্ম।

অকাল : অসময়, অবেলা, দুর্দিন, অনুভ সময়, কুকুরণ, দুর্সময়।

অক্ষয় : চিরস্তন, ক্ষয়হীন, অশেষ, অনন্ত, অনিঃশেষ, অন্তহীন, অন্তবিহীন, অবিনাশী।

অতিথি : যেহমান, অভ্যাগত, আগমনিক, নিমত্তিত, আমত্তিত, কুটুম্ব।

অস্ফুত : উপ্স্টি, আজব, আজগুবি, তাজব, বিশ্বাকর, আশৰ্য, অভিনব, অঘাতিবিক।

অনেক : বেশি, বহু, প্রচুর, প্রভৃতি, পর্যাপ্ত, অধিক, অত্যন্ত, অতিশয়, অতিরিক্ত, অতাধিক, বাঢ়তি, দেদার।

অক্ষকার : আঁধার, তিমির, তমসা।

অবকাশ : সময়, ফুরসত, অবসর, ছুটি, সুযোগ।

অভাব : অনটন, দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা, দুরবস্থা, গরিবি, অসচ্ছলতা, অপ্রাচুর্য।

অলস : আলসে, নিঞ্জিয়, নিষ্কর্মা, অকর্মা, শ্রমকাতর, অকেজো, অকর্মণ্য, শ্রমবিমুখ, নিরদ্যম, জড়প্রকৃতি।

অশ্ব : ঘোড়া, ঘোটক, হয়, তুরগ, তুরজাম।

আইন : বিধান, কানুন, ধারা, নিয়ম।

আকাশ : গগন, আসমান, খ, অস্বর, বোম, নভ, অতরীক, দ্যুলোক, নৌলিমা।

আঙ্গন : আঁঁঁি, অনল, বহি, পাবক, হুতাশন।

আনন্দ : খুশি, আমোদ, মজা, পুলক, হর্ষ, আহুদ, স্ফূর্তি, সংস্কোষ, পরিতোষ, প্রমোদ, উন্নাস, উচ্ছাস।

ইচ্ছা : আকাঙ্ক্ষা, আশা, অভিলাষ, প্রার্থনা, চাওয়া, স্পৃহা, অভিধায়, সাধ, অভিরচ্চি, প্রবৃত্তি, মনোরথ, সৈঙ্গা, অভীক্ষা, বাসনা, কামনা, বাঞ্ছা।

উন্নম	: শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ, ভালো, উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, সেরা, অতুলনীয়, প্রধান।
একতা	: একজ্য, মিলন, একত্ব, অভেদ, অভিমত।
কঠিন	: শক্ত, দৃঢ়, কঠোর, কড়া, জটিল, কঢ়ক।
কথা	: উক্তি, বাক্য, বচন, কথন, বাণী, ভাষণ, বিবৃতি, জবান, বুলি, বোল, বাক।
কল্যা	: মেহে, দুহিতা, আত্মাজা, নন্দিনী, তনয়া, পুত্রী, ঝি।
কপাল	: ললাটি, বরাত, ভাল, অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি, নসির।
কবুতর	: কপোত, পায়রা, পারাবত, লোটিন।
কষ্ট	: যত্নণা, দুঃখ, ক্রেশ, আয়াস, পরিশ্রম, মেহনত।
কান	: কর্ণ, শ্রবণ, শুন্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়।
কান্না	: ক্রন্দন, কাঁদা, রোদন, অশ্রুপাত।
কিরণ	: রশ্মি, শিখা, আলোকচ্ছটা, কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশ।
কুল	: বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, জাত, বর্ণ।
কূল	: তীর, তট, বেলাভূমি, সৈকত, ধার, বালুকাবেলা, কিনারা, পুলিন, পাড়।
খবর	: সংবাদ, বার্তা, তথ্য, সমাচার, বিবরণ, সন্ধান, বৃত্তান্ত, খৌজখবর।
খাদ্য	: খাবার, খানা, ভোজ্য, ভক্ষ্য, আহার্য, অন্ন, রসদ।
খারাপ	: মন্দ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র, অশ্রীল।
খৌজ	: সন্ধান, অবেষণ, অনুসন্ধান, খৌজা, তালশি।
গভীর	: অগাধ, অতল, গহন, প্রগাঢ়, নিবিড়।
গৃহ	: বাড়ি, ঘর, আলয়, ভবন, নিলয়, নিকেতন, সদন, আগার, আবাস, বাটি, কুটির।
চাঁদ	: চন্দ, শঙ্কী, শশধর, শশাঙ্ক, বিধু, সোম, নিশাকর, সুধাংশু, সুধাকর, ইন্দু, সিতাংশু, হিমাংশু,
	মৃগাঙ্ক।
চুল	: কেশ, অলক, চিকুর, কুস্তল, কবরী।
চোখ	: চক্ষু, নয়ন, আঁখি, অঙ্গি, নেত্র, লোচন।
জন্ম	: উৎপত্তি, উত্তৰ, সৃষ্টি, ভূমিষ্ঠ, জনম, আবির্ভাব।
ঝড়	: ঝঝঝা, তুফান, সাইক্রোন, বাটিকা, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়।
ঝোক	: টান, প্রবণতা, আকর্ষণ।
ঠিক	: যথাযথ, সত্য, সঠিক, যথার্থ, উপযুক্ত, নির্ভুল, ন্যায্য, ভালো।
ঠাণ্ডা	: বিদ্রূপ, শ্রেষ্ঠ, মশকরা, উপহাস, রসিকতা।
চেউ	: তরঙ্গা, কল্লোল, উর্মি, বীচি, হিল্লোল, লহরী।
তৃষ্ণা	: পিপাসা, তিয়াসা, তেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা।
তৈরি	: গঠন, নির্মাণ, গড়া, বানানো, প্রস্তুত।
দয়া	: অনুগ্রহ, করণা, কৃপা, অনুকূল্পা, মায়া।

দলিল	: নথি, চুক্তিপত্র, কাগজপত্র, পাট্টা, দস্তাবেজ।
দিন	: দিবস, দিবা, অহ, অহু, বার, রোজ, বাসর, অষ্টপ্রহর।
দেহ	: শরীর, গা, গাত্র, বপু, তনু, অঙ্গ, অবয়ব, কাঠামো, আকৃতি।
নতুন	: নবীন, আনন্দকর, আধুনিক, অধুনা, অবচিন।
নদী	: নদ, গাঙ, স্ন্যাতশ্চিনী, তটিনী, প্রবাহিনী, নির্বারিণী, কল্লোলিনী।
নারী	: মানবী, মহিলা, স্ত্রী, স্ত্রীলোক, মেয়ে, ললনা, অঙ্গানা, বনিতা।
নিত্য	: সতত, সর্বদা, প্রত্যহ, নিয়মিত, চির, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অনন্ত, রোজ।
পদ্ম	: কমল, উৎপল, পজকজ, কুমুদ, কুবলয়, শতদল, অরবিন্দ, রাজীব, নলিনী, সরোজ।
পর্বত	: পাহাড়, অন্দি, ভূধর, গিরি, শেল, আচল।
পাখি	: পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গা, খগ, খেচর, চিড়িয়া, পাখপাখালি।
পাথর	: পাথাণ, প্রস্তর, শিলা, উপল, অশ্বা, কঙ্কর।
পানি	: জল, সলিল, নীর, পয়ঃ, বারি, অপ, উদক, জীবন, অস্তু।
পুত্র	: ছেলে, আত্মজ, নন্দন, দুলাল, সুত, তনয়, খোকা, কুমার।
পৃথিবী	: জগৎ, ভূবন, সংসার, বিশ্ব, ধরণী, ধরিত্বী, বসুমতী, বসুন্ধরা, পৃথী, দুনিয়া, ভূ, ভূমঙ্গল, মর্ত্য, বসুধা, অবনী, মহী, মেদিনী, ক্ষিতি।
বন	: অরণ্য, জঙ্গল, কানন, বনানী, বনবাদাড়, কুঞ্জ, কান্তর, বিপিন, অটবী।
বাতাস	: বায়ু, হাওয়া, পবন, সমীর, সমীরণ, অনিল, মরুৎ, প্রভঙ্গন।
বিদ্যুৎ	: তড়িৎ, বিজলি, বিজুরি, অশনি, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, দামিনী, চপলা।
বিবাহ	: বিয়ে, পরিণয়, পাণিত্বাহণ, উদ্বাহ, নিকা, শাদি।
বৃক্ষ	: গাছ, তরু, দ্রুম, শাথী, পাদপ, মহীরাহ, উষ্টিদ।
ব্যবধান	: ফাঁক, ছিদ্র, অন্তর, তফাত, তেদ, পার্থক্য।
মন	: অন্তর, দিল, পরান, চিন্ত, হৃদয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ, অন্তরাত্মা।
মা	: জননী, মাতা, মাত্ৰ, মাতৃকা, আমা, গর্ভধারিণী, জন্মাত্রী, প্রসূতি।
মৃত্যু	: মরণ, ইষ্টেকাল, বিনাশ, নিপাত, পরলোকগমন, লোকান্তর, চিরবিদায়, দেহত্যাগ, শেষনিষ্ঠাস ত্যাগ, ইহলীলা-সংবরণ, পঞ্চতৃপ্রাণি।
মেঘ	: জলদ, জলধর, নীরদ, বারিদ, ঘন, জীমৃত, অন্দ, অস্তুবাহ।
যুদ্ধ	: লড়াই, সংঘর্ষ, সংগ্রাম, সমর, যুদ্ধবিহুহ, রণ, সংঘাত।
রাজা	: নৃপতি, নৃপ, সন্ত্রাট, বাদশাহ, নৃপেন্দ্র, নরপতি, ভূপতি, ভূপাল।
রাত	: রাত্রি, রজনী, নিশি, নিশা, নিশীথা, নিশীথিনী, যামিনী, শবরী, বিভাবরী।
রানি	: মহিষী, সন্মাজী, বেগম, রাজী, রাজপত্নী।
সমুদ্র	: সাগর, সিঙ্গু, সায়র, দরিয়া, জলধি, অকুল, পাথার, বারিধি, রত্নাকর, নীলামু, পয়োধি, বারীন্দ্র, অর্ণব, পারাবার।

সাপ	: সর্প, অহি, ফণী, নাগ, ভূজগ, ভূজঙ্গা, আশীর্বিষ, উরগ, বিষধর, পঞ্চগঁ।
সিংহ	: কেশরী, পশ্চরাজ, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ।
সুন্দর	: মনোরম, মনোহর, শোভন, সুদৃশ, চারু, রমণীয়, রম্য, কমলীয়, কাণ্ঠিমান, লাবণ্যময়,
	সুদৰ্শন, ললিত।
সূর্য	: রবি, তপন, ভানু, ভাস্কর, আদিত্য, সরিতা, প্রভাকর, দিবাকর, বিভাবসু, দিনমণি, মার্ত্তও,
	অংশুমালী, অরূপ।
স্ত্রী	: পত্নী, ভার্যা, সহধূমিণী, অর্ধাঙ্গিণী, দারা, জায়া, বধু, বট, বিবি, বেগম, গৃহিণী।
স্বর্ণ	: সোনা, সুবর্ণ, কাঞ্চন, কনক, হিরণ, হিরণ্য, হেম।
স্বামী	: পতি, কান্ত, নাথ, বল্লভ, দয়িত।
হাত	: হষ্ট, কর, বাহু, ভূজ, পাণি।
হাতি	: গজ, হষ্টী, করী, দ্বিপ, বারণ, মাতঙ্গা, কুঁঝর, দষ্টী, দ্বিদ, পিল।
হীন	: নীচ, অধম, নিন্দনীয়, অবনত, গরিব, অক্ষম, শূন্য, ক্ষীণ।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. প্রতিশব্দ কী?

ক. অভিন্ন শব্দ খ. ভিন্ন শব্দ গ. ভিন্নার্থক শব্দ ঘ. বিপরীত শব্দ

২. 'আইন' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি?

ক. কানুন খ. নিয়ম গ. বিধান ঘ. শশী

৩. একটি শব্দের অনুজ্ঞাপ, অবিকল ও নিকটবর্তী অর্থ প্রকাশকে কী বলে?

ক. প্রতিশব্দ খ. ভিন্নার্থক শব্দ গ. বিপরীত শব্দ ঘ. সমোচ্চারিত শব্দ

৪. নিচের কোনটি 'গৃহ' শব্দের প্রতিশব্দ নয়?

ক. নয়ন খ. আলয় গ. ঘর ঘ. বাড়ি

৫. 'পৃথিবী' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?

ক. অবনী খ. জননী গ. নীর ঘ. জীবন

৬. আদিত্য, সরিতা, রবি, দিবাকর ইত্যাদি কোন শব্দের প্রতিশব্দ?

ক. অর্ণব খ. সূর্য গ. নৃপ ঘ. গিরি

পরিচেদ ৪২

বিপরীত শব্দ

যেসব শব্দ পরল্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বিপরীত শব্দ বলে। বিপরীত শব্দ একে অন্যের পরিপূরক। যেমন, বিবাহিত-অবিবাহিত; পুরুষ-নারী; জীবিত-মৃত; পিতা-মাতা ইত্যাদি। এসব শব্দযুগলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর একটিকে অধীকার করার মানে অন্যটিকে স্থাকার করে নেওয়া। যদি কারো সম্পর্কে বলা হয় তিনি ‘বিবাহিত’, তবে বোবায় যে তিনি ‘অবিবাহিত’ নন। আবার যদি বলা হয় তিনি ‘অবিবাহিত’, তবে বোবায় তিনি ‘বিবাহিত’ নন।

শব্দের পূর্বে অ, অন, অনা, অপ, অব, অবি, দূর, না, নি, নির প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত করে বিপরীত শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন – চেনা থেকে অচেনা; আদর থেকে অনাদর; নশ্বর থেকে অবিনশ্বর। তবে এমন বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর বিপরীত শব্দ গঠনগতভাবে আলাদা। যেমন – ধূমী-গরিব, আদি-আন্ত, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি।

নিচে কিছু শব্দ এবং তার বিপরীত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
অঙ্গ	পঞ্চাং
অচল	সচল
অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অধম	উত্তম
অধমর্ম	উত্তমর্ম
অনুকূল	প্রতিকূল
অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুরাগ	বিরাগ
অন্তর	বাহির
অন্তরঙ্গ	বাহিরঙ্গ
অপ্রতিভ	সপ্রতিভ
অভিজ্ঞ	অনাভিজ্ঞ
অর্থ	অনর্থ
অন্ত	অধিক
অষ্টি	নাষ্টি
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আচার	অনাচার

শব্দ	বিপরীত শব্দ
আত্মীয়	অনাত্মীয়
আদান	প্রদান
আপন	পৱ
আবশ্যক	অনাবশ্যক
আবির্ভাব	তিরোভাব
আমদানি	রঞ্জনি
আয়	ব্যয়
আশা	নিরাশা
আশু	বিলম্ব
আস্তিক	নাস্তিক
আস্থা	অনাস্থা
ইন্সফা	যোগদান
ইহলোক	পরলোক
ইথা	উথা
উচ্চ	নীচ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উৎকৃষ্টা	শান্তি
উৎসাহ	নিরসাহ

শব্দ	বিপরীত শব্দ
উত্তর	দক্ষিণ
উত্থান	পতন
উদয়	অন্ত
উদ্বিষ্ট	নিরবিষ্ট
উন্নতি	অবনতি
উপসর্গ	অনুসর্গ
উপস্থিত	অনুপস্থিত
উপশম	বৃদ্ধি
উর্ধ্ব	অধ
এলোমেলো	গোছানো
ওন্তাদ	সাগরেদ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ
কৃত্রিম	স্থান্তরিক
কৃপণ	উদার
কেজো	অকেজো
কোমল	কর্কশ
খাঁটি	ভেজাল

খাতক	মহাজন
খালিক	অধিক
খুঁত	নিখুঁত
খুচরা	পাইকারি
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গৃঢ়	ব্যক্ত
গৃহী	সহ্যাসী
গ্রহণ	বর্জন
ঘাটতি	বাঢ়তি
ঘাত	প্রতিঘাত
ঘাতক	পালক
চেতন	অচেতন
জড়	চেতন
জয়	পরাজয়
জাগরণ	নিদা
জোয়ার	ভাটা
জ্বানী	মূর্খ
জ্বেয়	অজ্বেয়
জ্বলন	শৰ্বিপদ
টাটকা	বাসি
ঠকা	জেতা
তফাত	কাছে
তিরক্ষার	পুরক্ষার
তেজী	লিঙ্গেজ
ত্বরিত	শুথ
দাতা	গ্রহীতা
দীর্ঘ	ক্রয়
দুর্মতি	সুমতি
দুষ্ট	শিষ্ট
দূর	নিকট
দোষী	নির্দোষ
ধৰ্মী	দরিদ্র
ধৰ্ম	অধৰ্ম
ধৃষ্ট	ন্য
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
নিন্দিত	জাহাত
নিন্দা	প্রশংসা
পঙ্গ	সফল
পথ	বিপথ

পাপী	নিষ্পাপ
পুষ্ট	শ্বেণ
পূর্ব	পশ্চিম
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
প্রফুল্ল	বিমর্শ
প্রবল	দুর্বল
প্রভু	ভূত্য
প্রখরতা	মিঞ্চতা
প্রাচী	প্রতীচী
প্রাচ্য	প্রতীচ্য
বংশন	মুক্তি
বলবান	দুর্বল
বাড়ুলে	সংসারী
বাচাল	হঞ্চাভাষী
বাদী	বিবাদী
বিচেছন	সক্রি
বিশেষ	সামান্য
ব্যৰ্থ	সার্থক
ভয়	সাহস
ভর্দেসনা	প্রশংসা
ভিতর	বাহির
ভিতু	সাহসী
ভীরু	নির্ভৌক
ভূত	ভবিষ্যৎ
ভেঁতা	ধারালো
মান	অপমান
মিলন	বিরহ
মুখ্য	গৌণ
মৃদু	প্রবল
মৌন	মুখর
যাচিত	অযাচিত
যুক্ত	বিযুক্ত
রত	বিরত
রদ	চালু
রসিক	বেরসিক
রিক্ত	পূর্ণ
রূগ্ণ	সুস্থ
রোগ	নীরোগ
লঘু	গুরু

লাভ	ক্ষতি
লেজ	মাথা
শিষ্ট	অশিষ্ট
শীত্র	বিলম্ব
সওয়াল	জবাব
সংহত	বিভক্ত
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
সজীব	নিজীব
সম্ভব্য	অপচয়
সদয়	নির্দয়
সঙ্কাৰ	বিৱোধ
সমষ্ট	অংশ
সম্ভল	নিঃসম্ভল
সৱেব	নীৱেব
সৱস	নীৱস
সাকাৰ	নিৱাকাৰ
সাচ্চা	ভুয়া
সার্থক	ব্যৰ্থ
সুকৃত	দুকৃত
সুন্দৰ	কুৎসিত
সুবহ	দুৰ্বহ
সুৱার্তি	নিন্দা
সুলভ	দুর্লভ
সুশীল	দৃংশীল
সুশ্রী	বিশ্রী
সৃষ্টি	ধৰ্মস
ছাবৰ	অছাবৰ
ছিৰ	চৰকল
ছনামে	বেনামে
ছবাস	প্ৰবাস
ছমত	প্ৰমত
স্মৃতি	বিস্মৃতি
হক	নাহক
হৱণ	পুৱণ
হৱদম	হঠাত
হাৰ	জিত
হাল	সাবেক
হালকা	ভাৱী
হাস	বৃদ্ধি

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. সাধারণত কতটি শব্দ পরম্পরাত শব্দ হয়?
 - ক. একটি খ. দুটি গ. তিনটি ঘ. চারটি
২. বিপরীত শব্দ একে অন্যের কী?
 - ক. সমার্থক খ. পরিপূরক গ. ভিন্নার্থক ঘ. সদার্থক
৩. 'হাস' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
 - ক. বৃক্ষ খ. বর্ধন গ. বেশি ঘ. অনেক
৪. 'অতিবৃষ্টি' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
 - ক. ভারী বৃষ্টি খ. খুব বৃষ্টি গ. অল্প বৃষ্টি ঘ. অনাবৃষ্টি
৫. নিচের কোনটি 'ভূত' শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে?
 - ক. ভালো খ. পেতনি গ. ভবিষ্যৎ ঘ. ভীকৃ
৬. 'ভাটা' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
 - ক. তেজ খ. জোয়ার গ. ছাবর ঘ. ভারী
৭. 'চেতন' শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করাছে নিচের কোন শব্দটি?
 - ক. সচেতন খ. অচেতন গ. অবচেতন ঘ. অসচেতন

পরিচেদ ৪৩

শব্দজোড়

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর উচ্চারণ এক অথবা প্রায় এক, কিন্তু অর্থ ভিন্ন; এমন যুগল শব্দকে শব্দজোড় বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের বালান ভিন্ন হয়, তবে উচ্চারণ এক হওয়ায় কালে শুনে এদের পার্থক্য করা যায় না। বাক্যে ব্যবহৃত হলে প্রসঙ্গ বিবেচনায় এসব শব্দের পার্থক্য বোঝা যায়।

নিচে কিছু শব্দজোড়ের উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

অকুল - নীচ বংশ
অকুল - তীরহীন
অণু - সুন্দরম অংশ
অনু - পশ্চাত
অনিষ্ট - ক্ষতি
অনিষ্ট - নিষ্ঠাহীন
অন্ত্য - শেষ
অন্তঃ - তিতৰ
অন্ন - ভাত
অন্য - অপর
অন্যান্য - অপরাপর
অন্যন্য - একক
অপচয় - ক্ষতি
অবচয় - চয়ন
অপত্য - সন্তান
অপথ্য - যা পথ্য নয়
অবগত - জানা
অপগত - দূরীভূত
অবদান - কীর্তি
অবধান - মনোযোগ
অবিনীত - উদ্ধৃত
অভিনীত - অভিনয় করা
অবিরাম - অনবরত
অভিরাম - সুন্দর

অবিহিত - অন্যায়
অভিহিত - কথিত
অর্ধ - দাম
অর্ধ্য - পূজার উপকরণ
অশক্ত - অক্ষম
অসক্ত - নির্লিঙ্গ
অশ্ব - ঘোড়া
অশ্বা - পাথর
অঁশ - তন্তু
আঁষ - আমিয়
আদা - মসলাবিশেষ
আধা - অর্ধেক
আপণ - দোকান
আপন - নিজ
আবরণ - আচ্ছাদন
আভরণ - অলংকার
আবৃতি - আবরণ
আবৃত্তি - কবিতাপাঠ
আভাস - ইজ্জিত
আবাস - বাসস্থান
আশা - আকাঙ্ক্ষা
আসা - আগমন
আসক্তি - অনুরাগ
আসতি - নৈকট্য

ইঞ্জি - ধোপার যত্ন
জ্বী - পত্রী
উদ্যত - প্রবৃত্ত
উদ্বৃত - অবিনীত
উপাদান - উপকরণ
উপাধান - বালিশ
ওষধি - একবার ফলা গাছ
ওষষধি - ভেষজ উদ্ভিদ
ওষ্ঠ - ওপরের ঠোঁট
ওষ্ট্য - ঠোঁট সম্পর্কিত
কটি - কোমর
কোটি - শত লক্ষ
কড়া - আংটা
করা - কৃত
কৃতক - কৃত
কৃতু - বজা
কপাল - ললাট
কপোল - গাল
কমল - পদ্ম
কোমল - নরম
কৰী - হাতি
কড়ি - অর্ধ
কাঁচা - অপকৃ
কাচা - ধোয়া

কঁচি - কাস্টে
কাছি - মোটা দড়ি
কাঁটা - কন্টক
কাটা - কর্তন
কাঁদা - ক্রন্দন
কাদা - পাক
কাক - পাখিবিশেষ
কাঁথ - কাঁখাল
কি - ত্রিয়াবিশেষণ
কী - বিশেষণ/সর্বনাম
কিল - মুষ্টির আঘাত
কীল - খিল
কুজন - খারাপ লোক
কৃজন - পাখির ডাক
কুট - পর্বত
কৃট - জটিল
কুল - বংশ
কূল - তীর
কৃত - যা করা হয়েছে
ক্রীত - কেনা
কৃতজ্ঞ - উপকার
ঝীকারকারী
কৃতম্ব - উপকারীর
ক্ষতিকারী
কৃতি - কাজ
কৃতী - কর্মকুশল
ক্রোড় - কোল
ক্রেম - কোটি
খড় - তণ
খর - তীব্র
খন্দর - কাপড়
খদ্দের - গ্রাহক
খরা - রৌদ্র
ক্ররা - ক্ররণ
খুর - পশুর পায়ের অংশ
কুর - কামানোর অঙ্গ

গৰ্ব - অহংকার
গৰ্ত - পেট
গা - শরীর
গাঁ - গ্রাম
গাথা - কাহিনি
গাঁথা - গ্রন্থ
গাধা - গৰ্দন
গাঁদা - ফুলবিশেষ
গোড়া - মূল অংশ
গোঁড়া - রক্ষণশীল
ঘড়া - বড় কলসি
গড়া - তৈরি করা
ঘৱ - বাসগৃহ
গড় - তৈরি করা
ঘোড়া - অশ্ব
ঘোরা - ঘূর্ণন
চড় - চপেটাইত
চৱ - ভূমিবিশেষ
চাৱা - ছেটো গাছ
চাড়া - জেগে ওঠা
চিৱ - দীৰ্ঘ
চীৱ - ছিঁড়বজা
চুৱ - নেশাইত
চুৱ - চূৰ্ণ
চৃত - আম
চৃত - শ্বলিত
ছাঁদ - আকৃতি
ছাদ - চাল
ছাড় - ত্যাগ
ছাৱ - অধম
ছোড়া - বালক
ছোৱা - ছুৱি
জড় - অচেতন
জুৱ - বোগবিশেষ
জমক - সমারোহ
যমক - জোড়া

জলা - জলাশয়
জুলা - পোড়া
জাম - ফলবিশেষ
ঘাম - প্রহর
জাল - ফাঁদ
জ্বাল - অগ্নিশিখা
জালা - মাটির বড়ো পাত্র
জ্বালা - ঘৃণা
জিভ - জিহ্বা
জীৱ - প্রাণী
জোৱ - শক্তি
জোড় - জোড়া
জ্যোষ্ঠ - বড়ো
জ্যৈষ্ঠ - বাংলা দ্বিতীয় মাস
জ্যোতি - আলো
ঘতি - বিরাম
ঝানু - পাকা
ঝানু - হাঁটু
ঝুড়ি - চাঙাড়ি
ঝুৱি - বটের শিকড়
টিকা - রোগ প্রতিরোধক
টীকা - ব্যাখ্যা
ঠোকা - মৃদু আঘাত
ঠকা - প্রতারিত হওয়া
ডাকা - আহান করা
ডাকা - আবৃত
ডাল - শাখা
ডাল - বর্ম
ডোল - ধান রাখার পাত্র
ডোল - বাদ্যযন্ত্র
ডাক - বাদ্যযন্ত্র
ডাক - যোগাযোগ ব্যবস্থা
তত্ত্ব - গৃঢ় অর্থ
তথ্য - জ্ঞাতব্য বিষয়
তড়িৎ - বিদ্যুৎ
তুরিত - দ্রুত

তরণী - নৌকা
তরুণী - যুবতী
তারা - লক্ষ্মি
তাড়া - তাড়না
তোড়া - গুচ্ছ
তোরা - তোমরা
দন্ত - দাঁত
দন্ত্য - দাঁত-বিষয়ক
দার - ক্রী
দ্বার - দরজা
দারা - ক্রী
দ্বারা - দিয়ে
দিন - দিবস
দীন - দরিদ্র
দীপ - প্রদীপ
দীপ - জলবেষ্টিত ভূখণ্ড
দৃতী - নারী সংবাদবাহক
দৃতি - আলো
দৃষ্ট - বলিষ্ঠ
দীপ্ত - উজ্জ্বল
দেশ - রাজ্য
দেষ - দিংসা
ধরণ - ধরা
ধরন - প্রকার
ধাতৃ - বিধাতা
ধাত্রী - দাই
ধাপ - সিঁড়ির সোপান
দাপ - দাপট
ধূম - প্রাচুর্য
ধূম - ধোয়া
ধোয়া - ধোত
ধোয়া - ধূম
নভ - আকাশ
নব - নতুন
নারী - ক্রীলোক
নাড়ি - শিরা

নিতি - রোজ
নীতি - নিয়ম
নিত্য - প্রতিদিন
নৃত্য - নাচ
নিবৃত - আবৃত
নিভৃত - গোপন
নিরন্ত - অক্ষুন্ন
নিরন্ত - ক্ষান্ত
নীড় - পাখির বাসা
নীর - পানি
পঙ্ক - পাখা
পঙ্ক - চোখের পাতার লোম
পটল - অধ্যায়
পটোল - সবজিবিশেষ
পটোশ - রাসায়নিকবিশেষ
পটাস - ধৰন্যাত্মক শব্দ
পদ্য - কবিতা
পঞ্চ - কমল
পরা - পরিধান করা
পড়া - পাঠ
পরিচ্ছন্দ - পোশাক
পরিচ্ছেদ - অধ্যায়
পরিষদ - সভা
পরিষদ - সভাসদ
পটি - উভিদবিশেষ
পাঠ - পড়া
পানি - জল
পাণি - হাত
পার - তৌর
পাঢ় - প্রান্ত
পারা - পারদ
পাড়া - মহল্লা
পারি - সমর্থ হই
পাড়ি - পারাপার
পিঠ - পৃষ্ঠ
পীঠ - ছান

পিন - আলপিন
পীন - ছুল
পুত - পুত্র
পৃত - পৰিত্র
পুরি - লুচি
পুরী - নিকেতন
পুরুষ - মর
পুরুষ - কঠোর
পূর্বাভাষ - মুখবদ্ধ
পূর্বাভাস - পূর্বসংকেত
প্রকার - রকম
প্রাকার - দেয়াল
প্রকৃত - যথার্থ
প্রাকৃত - স্বাভাবিক
প্রসাদ - অনুগ্রহ
প্রাসাদ - বড়ো দালান
ফোটা - বিন্দু
ফোটা - প্রকৃতিত
বর্ধা - ঘাতু
বর্ণা - অক্ষুবিশেষ
বা - অথবা
বাঁ - বাম
বাক - কথা
বাঁক - বাঁকা
বাইশ - ২২ সংখ্যা
বাইস - ধারালো যত্ন
বাধা - বিঘ্ন
বাঁধা - বন্ধন
বাড়ি - ঘর
বারি - পানি
বাণ - শর
বান - বন্যা
বাণী - কথা
বানি - গয়নার মজুরি
বাদি - ফরিয়াদি
বাদী - মতাদর্শী

বাসি - টাটকা নয়
বাসী - বসবাসকারী
বিচি - বীজ
বীচি - চেউ
বিস্ত - ধন
বৃত্ত - গোলাকার
বিনা - ব্যতীত
বীণা - বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
বিশ - ২০ সংখ্যা
বিষ - গরুল
বিশ্মিত - চমৎকৃত
বিশ্মৃত - ভুলে যাওয়া
বৃক্ষ - বোটা
বৃন্দ - সমূহ
বেশি - অনেক
বেশী - বেশধারী
বৌজা - বঙ্গ
বোৰা - ভার
ভজন - প্রার্থনা
তোজন - আহার
ভাষ - কথা
ভাস - দীপ্তি
ভাষা - কথা
ভাসা - ভেসে থাকা
মতি - বুদ্ধি
মোতি - মুক্তা
মরা - মৃত
মড়া - মৃতদেহ
মাস - ৩০ দিন
মাষ - ডালবিশেষ
মুখ - বদন
মূক - বোবা
মুখ্যপত্র - ভূমিকা
মুখ্যপাত্র - প্রতিনিধি
মূর্খ - জ্ঞানহীন
মুখ্য - প্রধান

মোড়ক - আচ্ছাদনী
মড়ক - মহামারী
যজ্ঞ - উৎসব
যোগ্য - উপযুক্ত
যুগ - কাল
যোগ - মিলন
যুতি - পরিমাণ
যুথী - রথের আরোহী
যুক্ত - শত সহস্র
যুক্ষ্য - উদ্দেশ্য
যুষ্ঠন - বাতি
যুষ্ঠন - লুটতরাজ
যোশ - সামান্য
যোস - ফিতা
যুক - জাতিবিশেষ
যুখ - সাধ
যুকল - আশ
যুকল - সব
যুন - বছর
যুন - শব্দ
যুব - লাশ
যুব - সকল
যুমন - যম
যুমন - আদালতের আদেশ
যুয়া - বিহানা
যুজ্জা - সাজ
যুর - তির
যুর - সুর
যুরণ - আশ্রয়
যুরণ - স্মৃতি
যুশা - ফলবিশেষ
যুসা - বোন
যুদ - আবাদ
যুধ - ইচ্ছা
যুদী - বিয়ে
যুদী - অশ্বারোহী

শান্ত - শিষ্ট
সান্ত - সসীম
শাপ - অভিশাপ
সাপ - সর্প
শারি - ত্রী শালিক
সারি - পঞ্জতি
শাল - গাছবিশেষ
সাল - বছর
শিকার - মৃগয়া
শীকার - অঙীকার
শিল - পাথর
শীল - চরিত্র
শীষ - ধানের মঞ্জরি
শিস - ধৰনিবিশেষ
শুচি - পৰিত্র
সূচি - তালিকা
শোনা - শ্রবণ করা
সোনা - সূর্য
শ্রবণ - কান
শ্রবণ - শ্রবণ
শুশ্রূ - শাশ্বতি
শুশ্রূ - দাঢ়ি
সর্গ - অধ্যায়
স্বর্গ - বেহেশ্ত
সমর্প - বলবান
সামর্য্য - যোগ্যাতা
সম্প্রতি - আজকাল
সম্প্রতি - সঞ্চাব
সাম্প্রক - অক্ষর সংবলিত
স্বাম্পক - দন্তখত
সাধু - সৎ
স্বাদু - স্বাদযুক্ত
হাড় - অঙ্গ
হার - গলার মালা

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. দুটি শব্দের উচ্চারণ এক বা প্রায় এক কিন্তু অর্থ আলাদা, সেগুলোকে কী বলে?
 ক. বর্গ খ. প্রবাদ গ. শব্দজোড় ঘ. শব্দচৈত
২. শব্দজোড়ে শব্দের অর্থের পার্থক্য বোঝা যায় কীভাবে?
 ক. প্রসঙ্গ বিবেচনায় খ. সমাজ বিবেচনায় গ. স্থান বিবেচনায় ঘ. কাল বিবেচনায়
৩. 'অনু' এবং 'অণু' – এই শব্দ দুটির মধ্যে তফাত কোন ফেরতে?
 ক. বানানে খ. উচ্চারণে গ. অর্থে ঘ. বানানে ও অর্থে
৪. 'নিযৃত' ও 'নিভৃত' – শব্দজোড়ের মধ্যে যিনি কোথায়?
 ক. উচ্চারণে খ. বানানে গ. অর্থে ঘ. শব্দশ্রেণিতে

পরিচ্ছেদ ৪৪

অনুচ্ছেদ

একাধিক বাক্য দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচিত হয়। আবার বহু অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে তৈরি হয় প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি গদ্যরচনা। এদিক থেকে অনুচ্ছেদ হলো গদ্যরচনার একক। একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে বিশেষ একটি ভাবের প্রকাশ ঘটে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করা হয়। তাই অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো ভাব বা বিষয়ের দিক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। ভালো অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে একটি গদ্যরচনা আকর্ষণীয় হয়। শিক্ষার্থীকে তাই ভালোভাবে অনুচ্ছেদ লিখতে শেখা দরকার। অনুচ্ছেদ রচনার সময়ে যেসব বিষয় মনে রাখতে হয়, সেগুলো নিম্নরূপ:

- ক. অনুচ্ছেদে সব সময়ে একটি ভাব বা একটি বিষয় থাকে।
- খ. একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একাধিক ভাব বা বিষয়ের অবতারণা করা ঠিক নয়।
- গ. একটি বাক্য দিয়েও একটি অনুচ্ছেদ হয়। তবে দশ থেকে পনেরো বাক্যের অনুচ্ছেদই হলো আদর্শ অনুচ্ছেদ।
- ঘ. অনেক সময়ে যৌক্তিক কারণে অনুচ্ছেদ দীর্ঘতর হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভাব বা বিষয়ের সূক্ষ্মতর বিভাজন বিবেচনায় নিয়ে একটি অনুচ্ছেদকে একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা যায়।
- ঙ. অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে মূল ভাব বা বিষয়ের উল্লেখ করা হয়।
- চ. অনুচ্ছেদের পরের বাক্যগুলোতে প্রথম বাক্যে উল্লিখিত ভাব বা বিষয়ের বিস্তার ঘটানো হয়ে থাকে।
- ছ. অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে থাকে ভাব বা বিষয়ের সমাপ্তির ইঙ্গিত।

নিচে অনুচ্ছেদের কয়েকটি নমুনা তৃলে ধরা হলো।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম-বরকত-রফিক-জবারসহ বেশ কয়েকজন। মাতৃভাষার জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ ইতিহাসে এক নজরবিহীন ঘটনা। তখন থেকেই দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেক্সের সাধারণ সম্মেলনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্বে দিনটি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে পালিত হচ্ছে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে এভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভাষা-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্থীরতা মেলে। এর একটি নতুন মাত্রাও তৈরি হয়। পৃথিবীর মাতৃভাষাসমূহের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে এবং পৃথিবীর কোনো ভাষা যাতে হারিয়ে না যায় তা রোধ করতে এই দিবস অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়। ‘শহিদ দিবস’ বাংলাদেশের জাতীয় দিবস, যা সমস্ত বিশ্বের ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যা চর্চার প্রতিষ্ঠানকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে যেমন জ্ঞান বিতরণ করা হয়, অন্যদিকে তেমন নতুন জ্ঞান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিগুলোতে জ্ঞান বিতরণ করা হয় এবং যাঁরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেন তাঁদের এমফিল ও পিএইচডি ডিপ্রি প্রদান করা হয়। যাঁরা জ্ঞান বিতরণের সঙ্গে জড়িত তাঁরা অধ্যাপক নামে এবং যাঁরা জ্ঞান সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত তাঁরা গবেষক নামে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশাখাগুলোকে সাধারণত মানবিক, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, আইন, চারকলা, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি শৃঙ্খলা বা অনুষদে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে উপমহাদেশে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল যার নাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এর বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের সীমানার অন্তর্বে। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো চালু আছে তার নাম আল কারাওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মরক্কোর ফেজ শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এগুলো বিভিন্ন শ্রেণিনামে পরিচিত: স্বায়ন্ত্রশাসিত, সরকারি, বেসরকারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, প্রকৌশল, মেডিকেল, বিশেষায়িত, কেন্দ্রীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বকে কল্যাণমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বৈশাখী মেলা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে দেশের শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলা অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই; কোথাও এক দিন, কোথাও এক সপ্তাহ, আবার কোথাও মাসব্যাপী বৈশাখী মেলা চলে। নতুন বছরে মানুষের আনন্দ-অনুভূতি প্রকাশের একটা উপলক্ষ এই বৈশাখী মেলা। মেলায় আগত পরিচিতজনের পরিচয়ের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোক-উৎসবের মাধ্যমে এই মিলনমেলা আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। বলীখেলা, ঘোড়াদোড়, লাঠিখেলা, হাড়ডু প্রভৃতি ত্রীড়ানুষ্ঠান বৈশাখী মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। মেলা উপলক্ষে নানা ধরনের লোকগানের আসর বসে। সাধারণত গ্রামের হাটে, বাজারে, নদীর তীরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নিচে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় যেসব পণ্য বিক্রি হয়, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের পরিমাণ বেশি। বৈশাখী মেলায় গিয়ে তালপাতায় তৈরি হাতপাথা কেনেন না এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক হালকা খাবার ও মিষ্টাই মেলার আকর্ষণ বাড়ায়। মেলায় বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রীর কেনা-বেচা হয় ঠিকই, তবে বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষের সমাবেশ বৈশাখী মেলার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ।

বইমেলা

বইমেলা হলো বইকে উপলক্ষ করে লেখক ও পাঠকের মিলনমেলা। আনন্দঘন পরিবেশে বই কেনা-বেচার সুযোগ ঘটে বইমেলায়। এই মেলাতে বইয়ের প্রকাশকগণ তাঁদের নতুন ও পুরনো বই নিয়ে দোকান সাজান, পাঠক সেখান থেকে তাঁর পছন্দের বই দেখেওনে কিনতে পারেন। এটা বইমেলার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা। জার্মানির ফ্রান্কফুর্ট শহরে বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে বইমেলার সূচনা হয় ১৯৭২ সালে মুক্তধারার প্রকাশক চিন্তরঙ্গন সাহার উদ্যোগে। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হয় বাংলা একাডেমি ‘অমর একুশে এভিমেলা’। এই মেলায় শুধু বই কেনা-বেচাই নয়, নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও একাডেমিক কর্মকাণ্ড বাংলা একাডেমি গ্রহণ করে। ২০১৪ সাল থেকে বইমেলা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী সোহৃণাদী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর এই মেলার উদ্বোধন করেন। বইমেলা মানুষের মধ্যে পাঠ্যভাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; বিশেষভাবে শিশু-কিশোররা বাবা-মার সাথে বইমেলায় গিয়ে নিজেদের পছন্দের বইটি সংগ্রহ করতে পারে, নতুন নতুন বইয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। বইমেলাকে কেন্দ্র করে অনেক লেখক তাঁদের নতুন বই প্রকাশ করেন; পাঠকও নতুন নতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

জানুয়ার

জানুয়ার বলতে এমন ছাপনা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করা হয়। অতীত কালের গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করাই জানুয়ার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় পৃথিবীর প্রথম জানুয়ার ছাপিত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত জানুয়ারগুলোর মধ্যে ফ্রাসের ল্যান্ডর ও গিমে মিউজিয়াম, ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইতালির উপিজি মিউজিয়াম, রাশিয়ার হারিতেজ মিউজিয়াম উল্লেখযোগ্য। ঢাকার শাহবাগে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো জানুয়ার অবস্থিত। এর নাম বাংলাদেশ জাতীয় জানুয়ার। সুন্দর অতীত থেকে নিকট অতীত পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব ধরনের পুরাকীর্তি এখানে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জানুয়ারের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জানুয়ার, চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জানুয়ার, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জানুয়ার, নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ স্লোকশিল্প জানুয়ার ইত্যাদি। জানুয়ারের পুরাকীর্তিসমূহ নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। যে জাতির ঐতিহ্য যতো সমৃদ্ধ, সে জাতির জানুয়ারও ততো সমৃদ্ধ।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিস্তৃত একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত। নানা ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ এই সুন্দরবনে বিচ্চির বন্যপ্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন বিস্তৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের ভাঙ্গার হিসেবে সুন্দরবন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা ধরনের কাঠ, মধু, মোম ও মৎস্য। প্রায় চারশো নদী ও খাল এবং প্রায় দুইশো দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে যেসব গাছ জন্মে এর মধ্যে সুন্দরী, গোলপাতা, কেওড়া, গেওয়া, গরান, বাইন, ধুন্দুল, পশুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনে বাস করে রংগেল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মাঝা হরিণ, বন্য শূকর, বানর, বনবিড়াল, সজার ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। বিচ্চির প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে সুন্দরবন মুখর থাকে। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

রেলগাড়ি

সমান্তরাল ধাতব পাতের উপরে চলা গাড়িকে রেলগাড়ি বলে। রেলগাড়িতে অনেকগুলো কামরা বা বণি সারিবদ্ধভাবে যুক্ত থাকে। বাণিয় ইঞ্জিন উজ্জ্বালনের সূত্র ধরে রেলগাড়ির জন্ম। বর্তমান বিশ্বে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের কাজে এই গাড়ি অত্যন্ত জনপ্রিয়। জর্জ স্টিফেনসনের প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ডে ১৮২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্বের প্রথম রেলগাড়ি চলাচল শুরু করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে রেলগাড়ির যাত্রা শুরু হয়। ১৮৬২ সালে দর্শনা থেকে কৃষ্ণিয়ার জগতি পর্যন্ত ৫৩.১১ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন করা হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম রেল পথ। বাংলাদেশে রেলগাড়ি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। রেলপথ তিন ধরনের: ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও ন্যারোগেজ। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ, এই দুই ধরনের রেলপথ চালু আছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ জেলায় বর্তমানে রেলগাড়ি চলাচল করে, এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গেও বাংলাদেশের রেলযোগ্যাযোগ রয়েছে। রেলগাড়িতে ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও নিরাপদ।

স্বাধীনতা দিবস

ছাকিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরান্তর বিজয় লাভ করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সামরিক সরকার ঘৃত্যজ্ঞ শুরু করে। ওই সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত হতো পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বার্থে। ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পৌঁছে মার্চ মধ্যরাতে বাংলাদেশের উপর গণহত্যা শুরু করে। ১৯৪৭ সাল থেকে চারিশ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি পূর্ব বাংলার উপরে যে নিপীড়ন ও শোষণ চালিয়েছে, নয় মাসের রাজক্ষমী মুক্তিযুদ্ধে তার অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়, তাই এই দিন হলো বাংলাদেশের বিজয় দিবস। অন্যদিকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকেই এ দেশের মানুষ স্বাধীন, কেননা ঐ তারিখেই স্বাধীনতার জন্য শুরু হয়েছিল মুক্তিযুক্ত।

জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। পৃষ্ঠাবীর প্রতিটি দেশের আলাদা জাতীয় পতাকা রয়েছে। সাধারণত এক খঙ্গ কাপড় দিয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি করা হয়। এর আকার সুনির্দিষ্ট। আয়তাকার পতাকাই বেশি। যে দণ্ডের সঙ্গে পতাকাটি বেঁধে টাঙানো হয়, সেই দণ্ডকে বলে পতাকা-দণ্ড। সরকারি অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া জাতীয় দিবসগুলোতে দেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা শোভা পায়। আন্তর্জাতিক খেলাধূলার সময়ে কোনো দেশের খেলোয়াড়দের সমর্থন করার সময়ে সমর্থকেরা সেই দেশের পতাকা উড়িয়ে থাকে। জাতীয় শোক দিবসে এবং সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী কোনো শোক পালন করার সময়ে জাতীয় পতাকাকে অর্ধনমিত করা হয়, অর্থাৎ পতাকা-দণ্ডের উপর দিকে পতাকার প্রান্তের সমান অংশ বাদ দিয়ে পতাকাটি টাঙানো হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। এর পাঁচটি পরিমাপ রয়েছে - ১০ ফুট : ৬ ফুট, ৫ ফুট : ৩ ফুট, ২.৫ ফুট : ১.৫ ফুট, ১৫ ইঞ্চি : ৯ ইঞ্চি, এবং ১০ ইঞ্চি : ৬ ইঞ্চি। 'প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ছেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃন্ত'। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজ রং সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যকে নির্দেশ করে এবং উদীয়মান সূর্যের মতো এর লাল বৃন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মা�ৎসর্গকারীদের নির্দেশ করে।

জাতীয় সংগীত

রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত দেশপ্রেমমূলক গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির সূচনায় বা জাতীয় দিবসসমূহ পালনের সময়ে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিদিন সকালের সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময়ে সমবেত সকলকে উঠে দাঁড়াতে হয়। এটা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সামিল। আন্তর্জাতিক ঝৌড়া প্রতিযোগিতায় খেলা শুরুর আগেও প্রতিযোগীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইন: 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাটুল গানের সুরে গানটি রচনা করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। গানটির কথায় বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় সংগীত দেশের মানুষকে নিজ দেশের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শেখায়।

কম্পিউটার

কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন। কম্পিউটার শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'কম্পিউট' থেকে, যার অর্থ হিসাব বা গণনা করা। প্রথম দিকে কম্পিউটার শব্দ হিসাব করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু কালক্রমে কম্পিউটারের এমন বিকাশ ঘটেছে যে, একুশ শব্দকের সূচনায় এসে কম্পিউটার মানুষের জীবনযাত্রার সকল কাজের নিয়ন্ত্রণী হয়ে উঠেছে। অসংখ্য বিজ্ঞানীর বহু বছরের সাধনার ফলে কম্পিউটার প্রযুক্তির এই অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। দাঙ্গরিক কাজ, লেখালেখি, শিক্ষকতা, প্রকাশনা, বাণিজ্য, যোগাযোগ, বিনোদনসহ সব ধরনের কাজ এখন পুরোপুরি কম্পিউটার-নির্ভর। নানা ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের কাজে শিক্ষার্থী ও গবেষককে কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হয়। কম্পিউটারের বাহ্যিক যন্ত্রাংশকে বলে হার্ডওয়্যার বা যন্ত্রপাতি। হার্ডওয়্যারের মধ্যে থাকে কিবোর্ড, মাউস, র্যাম, মাদারবোর্ড, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। যেসব প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটার কাজ করে সেগুলোকে বলে সফটওয়্যার। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়; এর মানে কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা দেশের সব মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা।

মোবাইল ফোন

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় এমন ফোনকে বলে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আবিক্ষারের আগে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য ধরের নির্দিষ্ট ছানে টেলিফোন নামক যন্ত্র রাখতে হতো। এর সংক্ষিপ্ত নাম ফোন। বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসে তারের মাধ্যমে ফোনগুলো যুক্ত থাকত। অন্যদিকে মোবাইল ফোন তারবিহীন প্রযুক্তি হওয়ায় এটি যেখানে খুশি সেখানে বহন করা যায়। মোবাইল ফোনকে কখনো সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন নামে অভিহিত করা হয়। মোবাইল ফোনে আজকাল কথা বলার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধা আছে যেসব মোবাইল ফোনে, সেগুলোকে বলে স্মার্ট ফোন। এই স্মার্ট ফোনে কথা বলা যায়, ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, গান শোনা যায়, নাটক দেখা যায়, রেডিও শোনা যায়, টিভি দেখা যায়। অপরাধী শনাক্ত করার কাজেও আজকাল মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

পদ্মা নদী

পদ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী। ভারতের গঙ্গা নদীর ধারা বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময়ে পদ্মা নাম গ্রহণ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদীতে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি পদ্মা নামে পরিচিত। উৎপত্তি ও প্রবাহ বিবেচনায় পদ্মা আন্তর্জাতিক একটি নদীর অংশবিশেষের নাম। মূল নদীটির নাম গঙ্গা। গঙ্গা নদীর উৎস হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ। বাংলাদেশে প্রবেশের সময়ে গঙ্গার দক্ষিণমুখী একটি শাখা ভাগীরথী নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে সাগরে মেশে। মূল ধারাটি পদ্মা নাম নিয়ে গোয়ালদের কাছে পৌছানোর পর সেখানে উভর দিক থেকে আসা যমুনা নদী তার সঙ্গে মেশে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী পদ্মা নদীর উভর তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীর সর্বোচ্চ গভীরতা দেড় হাজার ফুটের বেশি এবং গড় গভীরতা প্রায় এক হাজার ফুট। মালদহ জেলার ফারাক্কাবাদে পদ্মা নদীর সূচনায় একটি বাধ দিয়ে ভারত সরকার পদ্মা নদীর পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পদ্মা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে একাধিক রেল ও সড়ক সেতু: একটি দুর্ধরন্দীর কাছে এবং অন্যটি মাওয়ার কাছে। পদ্মা নদীর ইলিশের স্বাদ বিশ্বজোড়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের অন্যতম উপাদান হিসেবে পদ্মা নদীর নাম উচ্চারিত হতো।

জন্মদিনের সন্দ্যা

প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রিয় তার জন্মদিন। এই দিনের সন্দ্যায় তার প্রিয়জনেরা যদি আয়োজন করে জন্মদিনের অনুষ্ঠান, তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকে! জন্মদিনের সন্দ্যায় আমন্ত্রিতরা যথন একে একে হাজির হয়, শুভেচ্ছা জানায়, শ্মারক হিসেবে কিছু না কিছু উপহার হাতে তুলে দেয়, তখন তা মনকে খুশিতে ভরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে কেক কাটা হয়। জন্মদিনের গান আর করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠে ঘর। সকলের চোখেমুখে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেক কাটার পরে থাকে নেশভোজ। নেশভোজে থাকে ভালো খাবারের ব্যবস্থা। সবার জন্মদিনের সন্দ্যা যে এমন আনন্দের সঙ্গে কাটে, তা নয়। যাদের প্রিয়জনেরা সচ্ছল নয়, তাদের জন্মদিনের সন্দ্যা হয়তো কোনো রকম আয়োজন ছাড়াই শেষ হয়। তবে আয়োজন হোক বা না হোক, জন্মদিনের সন্দ্যা মানে জীবন থেকে একটা বছর হারিয়ে যাওয়া আর নতুন একটা বছরের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

পরিচ্ছেদ ৪৫

সারাংশ ও সারমর্ম

সাধারণত গদ্যরচনার অন্তর্নির্দিত বক্তব্যকে সংক্ষেপে লেখার নাম সারাংশ, আর কাব্যভাষায় লেখা কোনো রচনার মূলভাবকে সংক্ষেপে লেখার নাম সারমর্ম। সারাংশকে সারসংক্ষেপ এবং সারমর্মকে মর্মার্থও বলা হয়ে থাকে। একটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা পেতে সারাংশ ও সারমর্ম বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সারাংশ ও সারমর্ম লেখা শিখতে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারে:

- ক. প্রদত্ত রচনার বিবরণ ও ভাবকে অনুসরণ করে সারাংশ ও সারমর্ম লিখতে হয়।
- খ. অনধিক চার বাক্য বা চল্লিশ শব্দের মধ্যে সারাংশ ও সারমর্ম সীমিত রাখা দরকার।
- গ. প্রদত্ত রচনার মূল কথা যাতে সারাংশ ও সারমর্মে বাদ না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।
- ঘ. সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময়ে উদাহরণ, উদ্ভৃতি, পরিসংখ্যান, তথ্য-উপাদি ইত্যাদি পুরোপুরি বাদ দিতে হয়।
- ঙ. সারাংশ ও সারমর্মের ভাষায় কোনো ধরনের কাব্যধর্মিতা রাখা যায় না। ভাষা হতে হয় দ্ব্যর্থহীন ও আবেগবর্জিত।
- চ. সারাংশ ও সারমর্মে পুনরাবৃত্তি পুরোপুরি বজালীয়।
- ছ. সারাংশ বা সারমর্ম লেখার সময়ে নিজস্ব বক্তব্য, মন্তব্য বা মত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই।

নিচে সারাংশ ও সারমর্ম রচনার কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

সারাংশ

১

এ কথা নিশ্চিত যে, জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি জাতীয় জীবনে উভয়নের গতিকে শুধু করে। সমাজ ও পরিবারের জীবনেও তা নানা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। অধিক জনসংখ্যার ভাবে ন্যূজ সমাজ তার সদস্যদের সামাজিক অধিকারের নিষ্ঠ্যতা দিতে পারে না। যেমন, শিক্ষালাভের অধিকার একটি সামাজিক অধিকার। কিন্তু দারিদ্র্যাপীড়িত সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা এখনও শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বণ্ধিত। এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের অগ্রগতি ছবির হয়ে পড়তে বাধ্য। দেশের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বণ্ধিত করা মানে হলো সম্ভাবনাময় বিশাল জনশক্তির অপচয় ঘটানো।

সারাংশ: জনসংখ্যার অধিক বৃদ্ধি দেশের উন্নতির অস্তরায়। এতে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ শিক্ষার মতো সামাজিক অধিকার পায় না। ফলে দেশের বিপুল জনশক্তির অপচয় ঘটে।

২

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রাদীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মূল্যবান পদার্থ বটে। কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হইলেও বিদ্যালাভের নিমিত্ত বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে।

সারাংশ: বিদ্যা মূল্যবান বটে, তবে চরিত্রের মূল্য আরো বেশি। যার চরিত্র ভালো নয়, তার জ্ঞান দিয়ে কোনো ভালো ফল আশা করা যায় না। সাপের মাথায় মণি থাকলেও তা ভয়ংকর; চরিত্রাদীন বিদ্বান হলেও তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

৩

সমাজের কাজ কেবল মানুষকে টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। যন্ত্রপাদ তুলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। গ্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নির্বেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতির অহংকার ও ধর্মগত অহংকার – এ সবের লাল নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব-প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় তা আন্তরিকতাদীন ও উপলব্ধিদীন বুলি মাত্র।

সারাংশ: সমাজ একটি সামবায়িক সংগঠন। সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এখানে ভালো-মন্দ উভয় শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি থাকে। অহংকারী ও স্বার্থপর মানুষ সমাজে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না, বরং অসহায়তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

৪

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই; কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময়ে অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উভাপে সন্তানের পরিপূর্ণি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃস্নেহের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হ্যারাইয়া আসল শক্তির রহ্যাদা বুবিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্দান সে পায় না – দুর্বল, অসহায় পক্ষিশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয়ে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ত্রুট্যে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরিনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যকু বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্য মাতৃস্নেহ সে কথা বোঝে না – দুর্বলের প্রতি সে ছিরলক্ষ্য, অসহায় সন্তানের প্রতি মমতার অন্ত নাই – অলসকে সে প্রাপ্তিপাত করিয়া সেবা করে – ভীরুতার দুর্দশার কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়।

সারাংশ: অতিরিক্ত মাতৃস্নেহ সন্তানের জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। অধিক স্নেহে সন্তানের মধ্যে স্বনির্ভরতা আসে না; সে অসহায় হয়ে পড়ে। অন্য মাতৃস্নেহ দুর্বলতাকে প্রশংস দেয়।

৫

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস – একে হঠাতে বড়া থেকে তুলে ফেলা কঠিন; মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সঙ্গাহে অস্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয় মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভ দিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সঙ্গাহে তুমি দুইদিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে তখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাতে জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা কোরো না। তাহলে সব পঙ্গ হবে।

সারাংশ: মানুষ অভ্যাসের দাস। কোনো অভ্যাসকে একদিনে বদলানো যায় না। অভ্যাস বদলানোর জন্য নিয়মিত চেষ্টা করতে হয়। নিজেকে চরিত্বান করতে চাইলে ধীরে ধীরে মিথ্যাচার ত্যাগ করার চেষ্টা করতে হবে।

৬

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্পে কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘূমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশৈলের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ হ্রির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিষ্ঠুরতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দক্ষ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

সারাংশ: লাইব্রেরির সঙ্গে নীরব মহাসাগরের তুলনা করা যায়। যুগ যুগ ধরে অগণিত জ্ঞানী-গুণী মানুষের চিন্তা-ভাবনা বইয়ের পাতায় ছায়িত্ব লাভ করে। মানুষের অর্জিত জ্ঞান এই বইয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরিতে সঞ্চিত হয়ে আছে।

৭

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মশুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে। বস্তুত চরিত্রবলেই মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শক্তি যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক – এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শক্তা পোষণ করো, তুমি পরদুঃখকাতর ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় – চরিত্বান মানে এই।

সারাংশ: চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্ম মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করে। চরিত্রগুণেই মানুষ অন্যের শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে। যিনি সত্যবাদী, বিনয়ী, জ্ঞানী, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ, স্বাধীনতাত্ত্বিক ও সজ্জন তিনিই চরিত্রবান।

৮

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যেসব অসাধ্য সাধন হচ্ছে, তাহাও বহু লোকের শুন্দি চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মানুষ বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথম আগুন জ্বালাইতে শিখিল, কে প্রথম ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এই মাত্র জানি যে, প্রথমে যাহারা নৃতন কোনো প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাহাদিগকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরও অনেকে তাহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাতত মনে হয়, তাহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। প্রবাল ধীপ যেন্নপ একটু একটু করিয়া আয়তনে বৃদ্ধি হয়, জন রাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে।

সারাংশ: বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান অনয়ীকার্য। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির পিছনে রায়েছে অগণিত মানুষের নিরস্তর কর্মপ্রচেষ্টা। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায় যুগ যুগ ধরে নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে এই সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে।

৯

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আবার যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু! যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

সারাংশ: সুবিধাবাদীদের উপর্যুক্তি সুসময়ে দেখা যায়। দুঃখের দিনে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময়ে এই সুসময়ের বঙ্গুরা কোনো উপকারে আসে না।

১০

অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব-পূরণে এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্রে বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই হ্রাস-ছ্রিবর হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীগণ অপরের অভাব দ্বারা করিতে সর্বদা ব্যস্ত। জগতে অভাব আছে বলিয়াই মানুষ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম। সুতরাং অভাব

হইতেই সেবাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই সেবাধর্মের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বসূলভ গুণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

সারাংশ: জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে বলেই মানুষ পূর্ণতার খোঁজ করে। অভাব দূর করার জন্যই সে কর্মপ্রচেষ্টায় রত থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যের অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে ওঠে।

সারমর্ম

১

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কড়ু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?

সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পওশ্বম,
ফল চাহে, — সেও অতি নির্বোধ, অধম।
খেয়া-তরী চ'লে গেলে বসে এসে তীরে,
কিসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে?

সারমর্ম: নৈতিকতা শেখার যথার্থ সময় শিশুকাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে না পারলে জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি অসময়ে অতিশ্রামেও কাঞ্চিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না।

২

কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদুর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর!
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মাগ্নির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
গ্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাধনে যবে মিলি পরম্পরে,
স্বর্গ অসিয়া দাঢ়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

সারমর্ম: স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তি ঘটে পরকালে — এমনটিই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু পৃথিবীতেই স্বর্গ কিংবা নরক রচনা করা সম্ভব। গ্রীতি ও প্রেমেই স্বর্গীয় সুখ আসে; হিংসা ও কুপ্রবৃত্তি দেয় নরক-যন্ত্রণা।

৩

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে ছান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ-পিঠে।
চলে যেতে হবে আমাদের।

চলে যাব — তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপথে পৃথিবীর সরাবো জঙ্গল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি —
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম: নতুনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পুরাতনকে চলে যেতে হয়। বর্তমান পৃথিবী নানা সংকটে জর্জরিত।
নতুন প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সুখকর ও বাসযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব পুরাতন প্রজন্মের।

৪

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঘণ!
হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, শুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উদ্ধান।

সারমর্ম: শ্রমজীবী মানুষের কঠোর শ্রম ও ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। ধনিকশ্রেণির দ্বারা নিপীড়িত
হলেও তারা সত্যিকারের মহৎ মানুষ। একদিন তাদের নবজাগরণের মধ্য দিয়ে এ বিশ্বে নতুন দিনের সূচনা
ঘটবে।

৫

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঢ়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস —
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ঝতি?
শুনিয়া দুষ্প্র হাসি কল বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

সারমর্ম: শস্যসম্পদ অর্জন করা কষ্টসাধ্য। তাই মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও শ্রমের এত মূল্য। অন্যের করণার উপরে নির্ভরশীল হলে মানুষের মর্যাদা বাড়ে না। কষ্ট করে পাওয়া ফলের মধ্যে মানুষের গৌরব নিহিত।

৬

ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়

অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবিধি!

দাঢ়াইত ছিরভাবে, চলিত না হায়!

মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!

ভবিষ্যৎ-আঙ্ক মৃচ মানব-সকল

ঘূরিতেছে কর্মফেত্ত্বে বর্তুল আকার;

তব ইন্দুজালে মুঝ: পেয়ে তব বল

যুবিছে জীবন-যুদ্ধ হায়! অনিবার।

নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,

নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।

সারমর্ম: আশা জীবন-সংসারের অদৃশ্য চালিকাশক্তি। আশা না থাকলে মানবজীবন হ্রাসিত ও জড়তায় পর্যবসিত হতো। আশা আছে বলেই এর মন্ত্র-মায়ায় মানুষ সামনে এগিয়ে চলে, সমৃদ্ধির লক্ষ্যে জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

৭

নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি-গান,

ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ

এ বিশ্বের সব আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভালো -

আকাশ বাতাস জল, বিবি-শশী, তারকার আলো।

সকলেরই সাথে মোর হয়ে গেছে বহু জানা-শোনা,

কত কি-যে মাখামাখি, কত কি-যে মায়া-মন্ত্র বোনা।

বাতাস আমারে ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,

অনন্তের কত কথা কহে নিতি নীলিমা আকাশ।

ঠাঁদের মধুর হাসি, বিশ্বমুখে পুলক চুম্বন,

মিটিমিটি চেয়ে থাকা তারকার করণ নয়ন,

বসন্ত নিদাঘ-শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,

দিকে দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম-ভালবাসাবাসি।

সারমর্ম: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীকে অপৰাপ করেছে। প্রকৃতি মানুষের মনকে পুলকিত করে; আবার প্রকৃতির প্রেমে মানুষের মন বাঁধা পড়ে। এই মায়া ত্যাগ করে কেউই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে চায় না।

৮

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুবা,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

বক্তু আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

সারমর্ম: নবীনের কর্মচক্ষলতায় পৃথিবী নতুন রূপে সাজে। যারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা নতুন পরিবর্তনকে ভয় পায়। তাকে প্রাণশক্তিতে সবাইকে উজীবিত হতে হবে।

৯

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রংপুরপে তীব্র দৃঢ়ে যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে,
উর্ধ্বে দুহাত বাড়াস।

সারমর্ম: বিপদ ও দৃঢ়ে কাতর হলে চলবে না। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। সংগ্রাম ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

১০

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
 সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
 সিঁথির সিদুর গেল হরিদাসীর।
 তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা,
 শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এলো
 দানবের মতো চিৎকার করতে করতে,
 তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
 ছাত্রাবাস, বন্ডি উজাড় হলো। রিকমেললেস রাইফেল
 আর মেশিনগান থই ফোটালো যত্নত্ব।
 তুমি আসবে ব'লে ছাই হলো আমের পর হাম।
 তুমি আসবে ব'লে বিশ্বস্ত পাঢ়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
 ভঁঁড়ুপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
 তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
 অবুবা শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।

সারমর্ম: অনেক ভ্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। শক্তবাহিনীর চৰম
 আক্ৰমণ ও নির্মমতাৰ শিকার হয়েছে নাৱী, শিশুসহ আপামৰ জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মানুষেৰ জীবনেৰ
 বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে কোনো মূল্য দিয়ে মাপা যাব না।

পরিচ্ছেদ ৪৬

ভাব-সম্প্রসারণ

কোনো কবিতা বা গদ্যরচনার অংশকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করাকে ভাব-সম্প্রসারণ বলে। কবিতার বেলায় সেইসব পঞ্জিক্রি ভাব-সম্প্রসারণ দরকার হয়, যেগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য বা তত্ত্ব থাকে। অন্যদিকে গদ্যরচনার সেইসব বাক্য ভাব-সম্প্রসারণের জন্য ঠিক করা হয়, সাধারণত যা প্রবাদ বা প্রবচনের মর্যাদায় উন্নীত। ভাব-সম্প্রসারণ করার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা যেতে পারে:

- ক. ভাব-সম্প্রসারণকে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়: প্রথম অংশে ভাবের অর্থ, দ্বিতীয় অংশে ভাবের ব্যাখ্যা এবং তৃতীয় অংশে ভাবের তাৎপর্য।
- খ. ভাব-সম্প্রসারণের এই অংশগুলোকে আলাদা তিনটি অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা যায়।
- গ. ভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তি দেখাতে হয়, উদাহরণ দিতে হয়, তুলনা করতে হয়।
- ঘ. ভাব-সম্প্রসারণের বাক্যগুলো যাতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।
- ঙ. প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- চ. ভাব-সম্প্রসারণে আলাদা কোনো শিরোনামের দরকার হয় না।
- ছ. মূল ভাবটি ক্লপক বা প্রতীকের আড়ালে থাকলে তাকে স্পষ্ট করতে হয়।
- জ. ভাব-সম্প্রসারণ করার সময়ে প্রদত্ত অংশের রচয়িতার নাম উল্লেখ করতে হয় না।
- ঝ. কমবেশি ২০০ শব্দ অথবা অনধিক ২০টি বাকেয়ের মধ্যে ভাব-সম্প্রসারণ সীমিত থাকা উচিত।

নিচে ভাব-সম্প্রসারণের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো।

১.

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

ভাব-সম্প্রসারণ: যে অন্যায় করে এবং যে সেই অন্যায় সহ্য করে, তারা উভয়ে সমান অপরাধী – উভয়ে সমান ঘৃণার পাত্র।

আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারীকে অপরাধী মনে করা হয়। তাই তার জন্য শাস্তির বিধান থাকে। আবার অনেক মানুষ আছে তারা সরাসরি অন্যায় করে না, কিন্তু পেছনে থেকে অন্যায়কারীকে সহায়তা করে বা অন্যায় করতে উৎসাহিত করে। আইনের আওতায় এরাও কখনো কখনো অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। আবার, এমনও লোক থাকে – যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যায় করে না, অন্যায় ঘটার সময়ে শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আইনের চোখে তাদের অপরাধী বলা যায় না। আইনের চোখে অপরাধী না হলেও এই নীরব দর্শকেরাও এক অর্থে অন্যায় ঘটাতে সহযোগিতা করে। কেননা, অন্যায় সংঘটিত হওয়ার সময়ে ওইসব দর্শক যদি সরব প্রতিবাদীর ভূমিকা পালন করত, তাহলে অন্যায় ঘটত না। আইনের চোখে এরা হয়তো অপরাধী নয়, কিন্তু বিবেকের দায় থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া যায় না। সমাজ থেকে অন্যায়কে দূর করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিবেকের দায়সম্পন্ন সচেতন মানুষের উপস্থিতিও জরুরি, যারা অন্যায়ের প্রতিবাদে সব সময়ে সোচ্চার হবে, সরব হবে। অপরাধী যাতে অপরাধ করার সুযোগ না পায়, সবাইকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

অন্যায়কাৰীকে যথাযথভাৱে শাস্তি দিলে অন্যায় প্ৰশ্ৰয় পায় না। আবাৰ অন্যায় কৰতে না দিলে অন্যায়েৰ ঘটনা ঘটে না। তাতে সমাজ থেকে অন্যায় চিৰতৰে দূৰ হয়। তাই অন্যায়কাৰী এবং অন্যায়-সহজকাৰী উভয়ই সমাজে বিনৰণীয়।

২.

আপনি আচাৰি ধৰ্ম শিখাও অপৰে।

ভাৰ-সম্প্ৰসাৱণ: ব্যক্তিৰ জীবনচৰণেৰ মধ্যে যা নেই, তা অন্যকে উপদেশ আকাৰে দেওয়া যাব না। অন্যকে উপদেশ দেওয়াৰ আগে নিজেকে তা পালন কৰে দেখাতে হয়। এৱে ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন কৰতে আঙুৰিকভাৱে উদৃঢ় হয়।

কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন কৰা তাৰ চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না কৰে, তাহলে উপদেশ-গ্ৰহণকাৰীৰ কাছে এৰ গুৰুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকাৰী যদি সেই উপদেশেৰ পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন কৰে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্ৰহণকাৰী উপদেশ পালনেৰ দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তাৰ জীবনচৰণে সংক্ৰিয় প্ৰভাৱ হৈলৈ। সাধাৱণত ধৰ্মপৰ্বতক, ধৰ্মপ্ৰচাৰক, ভজনী ব্যক্তি বা জীবনে প্ৰতিষ্ঠাপাণ্ডেৰ তৱফ থেকে উপদেশ-বাণী বৰ্ষিত হয়ে থাকে। এন্দেৰ দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন কৰতে দিখা কৰে না। তবে উপদেশ হিসেবে বৰ্ষিত কথাটুকু তাৰা নিজেদেৱ জীবনেও অনুসৰণ কৰেন কি-না – এ বিষয়ে তাঁদেৱকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যাবা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তাৰা নিজেৱাই পালন কৰতে অভ্যন্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ-গ্ৰহণকাৰীৰ কাছে সেইভাৱে গ্ৰহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহৱণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান কৰে, আবাৰ সে যদি অন্যকে ধূমপান কৰতে নিষেধ কৰে, তাহলে তা হাস্যকৰ উপদেশে পৰিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ কৰতে অন্যকে উদৃঢ় কৰাৰ আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি কৰতে অভ্যন্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্ৰহণকাৰী উপদেশেৰ পাশাপাশি উপদেশ পালনেৰ নজিৱণ গ্ৰহণ কৰতে পাৱে।

কাউকে উপদেশ দেওয়াৰ মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজাৰ ভান কৰা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন কৰা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সৰ্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন কৰেন, অন্যকেও তা পালন কৰতে বলেন।

৩.

কুধাৰ রাজ্য পৃথিবী গদ্যময়;
পূৰ্ণিমা-চাঁদ যেন বালসানো রুটি।

ভাৰ-সম্প্ৰসাৱণ: কুধাৰ্ত মানুষেৰ একমাত্ৰ আকাঙ্ক্ষা কুলিবৃত্তি। সব কিছুৰ মধ্যেই সে কুধা নিবৃত্তিৰ কথা ভাৱে। তখন কোনো কিছু সুন্দৰ কি অসুন্দৰ, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরের তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম স্ফুর্ধা। স্ফুর্ধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই স্ফুর্ধিবৃত্তির মূল চালিকাশক্তি। স্ফুর্ধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই স্ফুর্ধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুস্থির মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু স্ফুর্ধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়ো জোর একখানা বালসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

স্ফুর্ধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। স্ফুর্ধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্দের কাঠিন্যাটুকু সে ভালো উপলক্ষ করতে পারে; কাব্যের কোমলতা তার কাছে অর্থহীন।

৪.

গ্রহণত বিদ্যা আর পরহত্তে ধন,
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।

ভাব-সম্প্রসারণ: ধন-সম্পদ যদি নিজের নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে দরকারের সময়ে তা কোনো কাজে আসে না। একইভাবে জ্ঞান যদি শুধু বইয়ের পাতায় আটকে থাকে, সে-বিদ্যা ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারে না।

মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রামাণ-লক্ষ জ্ঞান বইয়ের মধ্যে সংঘিত থাকে। বই পাঠ করলে পৃথিবীর সব ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কেউ যদি নিয়মিত বই পড়ে তাহলে সে ধীরে ধীরে নিজেকে জ্ঞানী করে তুলতে পারবে। বই থেকে অর্জিত এই জ্ঞান দিয়ে সে নিজের বা অন্যের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। বই থেকে আহরিত জ্ঞান থেকে সে নিজে যেমন আলোকিত হতে পারে, অন্যকেও আলোকিত করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান যদি বইয়ের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকে, তাহলে তা কারো কোনো কাজে আসে না। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হাজার হাজার বই কিনলেন আর তা দিয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলেন। লাইব্রেরির তাকে তাকে বইগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। কিন্তু জ্ঞানের কোনো বিষয়ে কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, তিনি তার ব্যাখ্যাযোগ্য জবাব দিতে ব্যর্থ হবেন। আবার বইয়ের বিদ্যা না বুবো কেবল ঠোটছ বা মুখস্থ করলেই হবে না। এই বিদ্যার প্রায়োগিক দিকটিও উপলক্ষ করতে হবে। অনেকটা জায়গা-জমি বা অর্থের

মতো । নিজের সম্পদ-সম্পত্তি অন্যের হাতে থাকলে তা ভোগ করা যায় না । অন্যের কাছে থাকা অর্থ আর বইয়ের পাতার সীমাবদ্ধ জ্ঞান এভাবে সমার্থক হয়ে যায় ।

বইকে শুধু পরীক্ষা পাশের উপকরণ মনে করলে চলবে না । বইয়ের জ্ঞানকে জীবনে কাজে লাগাতে পারলে তবেই সার্থকতা ।

৫.

জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো ।

ভাব-সম্প্রসারণ: কর্মের দ্বারাই মানুষ পৃথিবীর বুকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পায় । কোনো মানুষের জন্ম যে বৎশেই হোক না কেন, কাজই তার পরিচয় নির্ধারণ করে ।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয় । তখন পিছনে পড়ে থাকে তার ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজ । কাজ ভালো হলে বহু কাল যাবৎ মানুষ তা মনে রাখে । আর কাজ খারাপ হলে যুগ যুগ ধরে সকলে তার নিন্দা করে । বৎশমর্যাদার উপরে এইসব সুনাম বা দুর্নাম নির্ভর করে না । বৎশে কেউ একজন সুনাম করলে সেই বৎশের মর্যাদা বাড়ে । তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই মর্যাদা চিরছায়ী । কেননা, একই বৎশে কোনো কুলাঙ্গার জন্ম নিলে সেই মর্যাদা ভঙ্গিত হতে পারে । আবার, অনেকে খুব সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়েছেন । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জিমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন দরিদ্র পরিবারে । এ দুজন ব্যক্তি বৎশ পরিচয়ে নয়, বরং কর্ম দ্বারা মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন ।

মানুষের পরিচয় কখনোই তার বৎশ বা পরিবারের মর্যাদা-অমর্যাদার উপর নির্ভর করে না – নির্ভর করে তার নিজ নিজ কর্ম ও সুকৃতির উপর । বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মানবসেবা – পছন্দসই যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করে অমর হতে পারে ।

৬.

দুর্জন বিদ্঵ান হইলেও পরিত্যাজ্য ।

ভাব-সম্প্রসারণ: দুর্জন মানে খারাপ লোক । খারাপ লোক যতই শিক্ষিত হোক না কেন, তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত ।

সাধারণত মিথ্যাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রাইন লোককে এককথায় দুর্জন বলা হয়। যারা খারাপ লোক, তাদের কথায় ও আচরণে খারাপ স্বভাব প্রকাশ পায়। খারাপ লোক শিক্ষিত হতে পারে, উচ্চশিক্ষিত হতে পারে; আবার নিরক্ষরও হতে পারে। অর্থাৎ কারো খারাপ হওয়ার সঙ্গে শিক্ষিত হওয়া বা না-হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যারা খারাপ লোকের সঙ্গে মেশে, তাদের সবাই খারাপ লোক মনে করে। এজন্য খারাপ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করতে হয় এবং তেমন লোকের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। একসময়ে এই বিশ্বাস করা হতো—কোনো কোনো বিষধর সাপের মাথায় মণি আছে। কিন্তু মণি আছে বলে সাপের সঙ্গে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তেমনি দুর্জন লোক শিক্ষিত হলেও তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। দুর্জন লোক অপরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কখনো পায় না। তার কাছ থেকে সঙ্গীর কিছু শেষার নেই। এমনকি, দুর্জনের কারণে সঙ্গীর বিপদও হতে পারে। বিপরীতভাবে, ভালো লোক নিরক্ষর হলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা ক্ষতিকর। ভালো লোকের কাছ থেকে তার সঙ্গীর বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

সচরিত্র গঠন করা বিদ্যা অর্জন করার চেয়েও কঠিন কাজ। তাই যিনি চরিত্রাবান, তার বিদ্যা থাক বা না-থাক, তার সঙ্গ প্রত্যাশিত। অন্যদিকে চরিত্রাইন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা ক্ষতিকর।

৭.

প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

ভাব-সম্প্রসারণ: খাদ্য গ্রহণ করে, শারীরিকভাবে বাড়ে আর বৎশ বৃদ্ধি করে—মোটামুটি এসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো কিছুর প্রাণ আছে বলে মনে করা হয়। মানুষেরও প্রাণ আছে, কিন্তু মানুষের থাকে এর অতিরিক্ত আর একটি সত্তা, তা হলো মন।

মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব—সেরা প্রাণী। মূল কারণ তার মন আছে। এই মনের মাধ্যমে মানুষ তার চারপাশের জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। তার মধ্যে ভালো-মন্দের ধারণা সৃষ্টি করে, নৈতিকতার জন্য দেয়। এমনকি এই মন দিয়ে সে গড়ে তোলে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক বোধ থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে এইসব উপাদান থাকে না। ইতর প্রাণীর মন থাকে না বলে তার সংস্কৃতি নেই, তার ভালো-মন্দের বোধ নেই, তার নৈতিকতার বালাই নেই। মানুষের মন এভাবে অন্যান্য প্রাণী থেকে তাকে আলাদা করে। মনকে আবার অনেক সময়ে ভালো কিছুর কেন্দ্র হিসেবেও ভাবা হয়। যেমন, যখন কোনো ব্যক্তির দানশীলতার কথা বলা হয়, তখন বলা হয়, তাঁর মন আছে। আবার কোনো লোককে যখন চরম স্বার্থপূর্ব ও কৃপণ হিসেবে চিত্রিত করার দরকার হয়, তখন বলা হয়, লোকটার মন ছোটো। এদিক দিয়ে মন হলো মানুষের ভালো-মন্দ পরিমাপের এক ধরনের মাপকাঠি।

মানুষের মন আছে বলেই সে মানবিক গুণের অধিকারী। আর যার মন নেই, অবশ্যই সে ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনীয়। সেই ইতর প্রাণী হতে পারে চরমভাবে হিন্দু অথবা একান্তই গোবেচারা কোনো পও, পাখি বা মাছ।

৮.

বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।

ভাব-সম্প্রসারণ: জ্ঞান আহরণ করার আশা নিয়ে মানুষ বই কেনে। আর এই বই কেনার জন্য যে অর্থ-ব্যয় হয়, অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় তা খুব নগণ্য।

বই মানুষের জ্ঞানচক্ষ খুলে দিয়ে মনের জগতকে প্রসারিত করে। কৃপমুক্তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বই অংশী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের সূচনায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দার্শনিকগণ বলেছিলেন, ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বৃক্ষ সেখানে আড়ষ্ট, মৃক্তি সেখানে অসম্ভব’। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী জ্ঞানের সীমানা বাড়াতে, বৃক্ষকে বঙ্গনহীন করতে, আর মানুষের মৃক্তি আনতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। সব মানুষই খাদ্য, বক্তৃ, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে। মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করার আরো অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো উপায় – বই কেনা। বই কিনে কেউ নিঃস্থ হয় না। কারণ, একটা বইয়ের অর্থমূল্য বেশি নয়। বরং একটি বই কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অনেকে অন্যান্য কাজে ব্যয় করে থাকে। ব্যক্তিকে আলোকিত করতে একটি বই যেভাবে ভূমিকা রাখে, তাতে বই কেনার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বোকামি। একটা বই অনেক সময়ে মানুষের জীবনকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে।

বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বই কেনার ও তা পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

৯.

বার্ধক্য তাহাই – যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যাকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ভাব-সম্প্রসারণ: কেবল বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্ধক্যকে বিচার করা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও কর্মসূহার তারতম্য মানুষকে তরুণ ও বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে।

মানুষ শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ বার্ধক্য ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক সংক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সুবাইকে মানসিকভাবে জরাহস্ত করতে পারে না। এদের কর্মশক্তি ও মানসিক-শক্তি অনেক তরুণকে হার মানায়। পক্ষান্তরে, এমন অনেক তরুণ রয়েছে – যারা নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না, অঙ্গবিশ্বাস ও গতানুগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, সত্যকে দ্বিকার করতে কৃষ্ণিত হয়। তারা আসলে তারুণ্যের খেলসে বার্ধক্যকে লালন করে। আর যেসব বয়োবৃক্ষ ব্যক্তি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ইতিবাচক ভাবনায় জীবনকে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের অযিত্বক্তি ধারণ করে। তরুণেরা সব সময়ে আলোর পথের যাত্রী। কঠিন সত্যকে মেলে নিয়ে তারা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে। ব্যক্তির আলোয় কুসংস্কারকে বাতিল করে তারা প্রতিষ্ঠা করে নতুন সত্য। তারা ধৰ্ম ও মৃত্যুকে পিছনে ফেলে সৃষ্টির আনন্দে এগিয়ে যায়। তারুণ্যের এই বোধ ও অনুভূতি যে কোনো বয়সের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। প্রকৃত বন্ধু তারা, যারা তারুণ্যের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিতে চায় না, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে অঙ্গীকার করে, নতুন সূর্যের আলোয় অবস্থিত্বোধ করে। তারা তারুণ্যের অংশ্যাত্মায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে বিষ্ণ সৃষ্টি করে।

বার্ধক্যের পরিচয় বয়সে নয়, পশ্চাদ্মুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

১০.

বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অক্ষ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্কু।

ভাব-সম্প্রসারণ: বিদ্যা মানুষের জীবনকে উন্নত করে। তাই বিদ্যা অর্জন অত্যাবশ্যক। তবে যে বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সংযোগ নেই, সে বিদ্যা অকার্যকর।

মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিদ্যাচর্চা করতে হয়। প্রকৃত বিদ্যান ব্যক্তি জীবনকে মঠীয়ান করে গড়ে তোলেন। তিনি নিজে যেমন আলোকিত হন, তেমনি আলোকিত করেন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে। অপরদিকে বিদ্যাহীন মানুষ সমাজের বোবাঞ্ছুর্প। সে অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থাকে। একমাত্র বিদ্যাই পারে সেই অজ্ঞানতার অক্ষকার থেকে তাকে মুক্ত করতে। একজন প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ জীবনের বাস্তবতাকে ভালোভাবে উপলক্ষ্য করতে পারে। বিদ্যা তাকে জ্ঞানী করে, বিদ্যাই তার চিন্তা-ভাবনা ও আচার-ব্যবহারকে পরিশালিত করে। এমনকি সংকৃতিবান ও উদার দৃষ্টির মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেও বিদ্যার কোনো বিকল্প নেই। তবে কিন্তু বিদ্যা মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব বিদ্যা অর্জন করা অর্থহীন। মুখ্য বিদ্যা আর গ্রহণগত বিদ্যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কোনো কাজে আসে না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায় না, কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে না, এমনকি জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। এমন বিদ্যা অবশ্যই কাষ্টিক নয়।

প্রকৃত শিক্ষা জীবনের সব দিককে আলোকিত করে। সেই আলোয় উজ্জ্বলিত হয় ব্যক্তি ও সমাজ। অন্যদিকে যে বিদ্যা জীবনকে ইতিবাচক পথে চালিত করতে পারে না, সে বিদ্যা মূল্যহীন।

১১.

মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

ভাব-সম্প্রসারণ: দীর্ঘ জীবন নয়, বরং মহৎ কর্মের মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। কর্মগুণে মানুষ অন্যের হন্দরে জায়গা করে নেয়।

মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকে না। একেক মানুষ একেক রকম আয়ু ভোগ করে পৃথিবী থেকে বিদ্যয় নেয়। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্যদের কাছে বিশ্মৃত হয়ে যায়। কারণ, তাদের জীবন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে উল্লেখ করার মতো হয় না। জীবন্দশ্শায় তারা এমন কোনো কাজ করে যেতে পারে না, যার কারণে মানুষ তাদের আরণ করবে। তাই দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়েও সেসব ব্যক্তি জীবনকে গৌরবান্বিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা অন্যুর জীবনে নিজেকে অরণ্যীয় করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁদের নাম উচ্চারিত হয়। পৃথিবীতে মহৎ হন্দয়ের মানুষ

মানবতার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন, দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রাণ দিতেও কুষ্ঠাবোধ করেন না। একুশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে গভীর জীবনবোধ ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেই রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, তাঁরা সকলেই ছিলেন বয়সের দিক দিয়ে একেবারে তরুণ। অর্থাৎ স্মরণীয়-বরণীয় হওয়ার জন্য বয়স গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জীবনটা বেশি দিনের কি কম দিনের, সেটা মোটেই বিবেচ নয়। বিবেচ হলো মহৎ কর্ম করে বেঁচে থাকা। মহৎ কর্মের মাধ্যমে যাঁরা জীবনকে মহিমাধূত করে তুলতে পারেন, প্রকৃত অর্থে তাঁরাই দীর্ঘজীবী বা চিরজীবী।

১২.

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি, অঙ্ককারেই ফিরে আসে।

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষের জীবনে সুখ বা দুঃখ চিরহায়ী নয়। সুখের পরে দুঃখ আসে, আবার দুঃখের পরে সুখ আসে। এজন্য সুখে যেমন অতিরিক্ত আত্মহারা হতে নেই, তেমনি বিপদেও দৈর্ঘ্যহারা হওয়া ঠিক নয়।

আকাশ যখন মেঘে আচ্ছন্ন হয়, সূর্য বা চাঁদের আলো তখন ঠিকমতো পৃথিবীতে পৌছায় না। ফলে দিনের বেলায় সূর্য দেখা যায় না, রাতের বেলায় চাঁদ দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনা খুবই সামান্যিক। দিনের অধিকাংশ সময়ে সূর্য দেখা যায়। একইভাবে মেঘও চাঁদকে বেশিক্ষণ আড়াল করে রাখতে পারে না। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের হাসি তাই সবারই দেখার সুযোগ হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে মেঘের আড়াল যেমন সত্য, মেঘহীন আকাশও সত্য। একইভাবে মানুষের জীবনেও কখনো কখনো দুঃখ-দুর্দশার কালো মেঘ হাজির হয়। মনে হয়, এই দুর্দশা যেন আর কাটিবে না। দুর্বলচিত্তের মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, মানুষের জীবনে কোনো কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। জীবন-আকাশের এই কালো মেঘও বাস্তব মেঘের মতো সামান্যিক। এজন্য বিপদে ভেঙ্গে না পড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে হয়।

মানুষের জীবনে কোনো দুঃসময়ই চিরহায়ী বা অনিবার্য নয়। দৈর্ঘ্য ধরে দুঃসময়কে অতিক্রম করতে পারলেই সুখ-সূর্য বা সুখ-চাঁদের দেখা মেলে। জীবন তখন পুনরায় সুন্দর ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

১৩.

ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

ভাব-সম্প্রসারণ: ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ব্যক্তির লোভ-লালসা। তাই ভোগ নয়, ত্যাগের চর্চাই মানুষের সুন্দর গুণাবলিকে উৎকর্ষ দান করে।

ভোগ ও ত্যাগ দুটি বিপরীত বিষয়। মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের আশায় ভোগে মন্ত হয়; অন্যদিকে মানসিক তৃষ্ণির আশায় ত্যাগ ঘৰাকৰ করে। ভোগ সাময়িক সুখ আনতে পারে। তবে যিনি ত্যাগে কৃষ্টিত হন না, তিনি অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। ভোগের নিমিত্তে মানুষ জড়িয়ে যায় পঞ্চিলতায় - হিংসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা ও ষষ্ঠচারিতাকে আপন করে নেয়। ভোগবাদী মানুষ তাদের সম্পদ কখনো পরার্থে ব্যয় করে না, পরের দুঃখে কাতর হয় না; বরং হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সুযোগের সঙ্কান করে। মানবিকতা ও পরার্থপরতা তাদের কাছে অর্থহীন। তাই সমাজের মানুষের কাছেও তাদের কোনো মর্যাদা থাকে না। তারা জন্মগতভাবে মানুষ হলেও তাদের মনুষ্যত্ব আসলে বিকশিত হয় না। আবার কিছু মানুষ ভোগের চেয়ে ত্যাগকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মানুষের বিপদে তাঁরা ছুটে যান, নিজের সুবিধার কথা না ভেবে বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবেন, দুঃখীজনের দুঃখ দূর করতে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে আলন্দ পান। ভোগবাদী মানুষের ভ্রান্ত ধারণা - ভোগের মধ্যেই সকল সুখ। তাই তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাস-ব্যবসনে মঞ্চ হয়। তারা ভোগের মাধ্যমে সুখী হতে চায় বটে, তবে তারা প্রকৃত সুখের সঙ্কান পায় না। বরং যেসব মানুষ নির্দিষ্ট অন্যের জন্য ত্যাগ ঘৰাকৰ করতে প্রস্তুত থাকেন, তাঁদের দ্বারা সমাজ যেমন উপকৃত হয়, তাঁরা নিজেরাও এসব কাজের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন।

ত্যাগের মহীমা অসীম। মনুষ্যত্ব বিকাশে ত্যাগের চর্চার কোনো বিকল্প নেই। ভোগ মনুষ্যত্বকে লজ্জা ও হীনতায় ডুবিয়ে রাখে।

১৪.

যে নদী হারায়ে স্নোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

ভাৰ-সম্প্ৰসাৱণ: গতিশীলতা প্রাণের ধৰ্ম। যেখানে গতি নেই, চৰ্ষণলতা নেই, সেখানে ছৰিবৰতা জঁকে বসে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় - সকল ক্ষেত্ৰেই ছৰিবৰতা যাবতীয় অৰ্জন ধৰ্ম করে দেয়। তাই কৃতিত্ব, সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য গতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই।

নদীৰ ধৰ্ম বয়ে চলা। স্নোতই তাৰ গৌৱব। স্নোত না থাকলে নদী ধীৱে ধীৱে মৰে যায়। স্নোতেৰ টানে বিশাল জলৱাশি পাহাড় থেকে সমুদ্ৰের দিকে খেয়ে চলে। এই স্নোতই নদীকে প্রাণেৰ স্পন্দনে জাগিয়ে রাখে, দুই পাড়ে জন্ম দেয় নতুন নতুন সভ্যতার। তাৰ গতিচাঞ্চল্যে ফুটে ওঠে জীবনেৰ বলিষ্ঠ প্ৰকাশ। সব জলাল ভাসিয়ে নিয়ে সব বৰকমেৰ পৰিলক্ষ থেকে নদীকে মুক্ত রাখে স্নোত। তবে কখনো যদি এই স্নোত থেমে যায়, কৃকৃ হয় কোনো গতিৰ সীমায়, তবে নদী তাৰ গৌৱব হারায়। নদীৰ বুকে জন্ম নেয় অসংখ্য জলজ উষ্ণিদ, আৰৰ্জনায় ঢেকে যায় টলমলে জলেৰ ধাৰা। গতিচাঞ্চল্য, ছন্দময়তা আৰ জলকল্পেৰ হাৰিয়ে নদীটি নিঝীৰ

হয়ে পড়ে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি নদীৰ মতো – গতিময়তায় তাৰ প্ৰাণ; গতিহীনতায় তাৰ মৃত্যু। আশুনিকতা, উন্নয়ন, অগতি, সমৃদ্ধি – প্ৰতিটি ধাৰণাৰ সঙ্গে উদ্যম, গতিময়তা ও পৱিবৰ্তনশীলতাৰ যোগ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা সমাজ যদি প্ৰাচীনতাকে আৰক্ষে ধৰে নতুন সময়ে টিকে থাকতে চায়, তবে ওই ব্যক্তি বা সমাজ নতুন সময়েৰ দাবিকে উপেক্ষা কৰল। অযৌক্তিক বিশ্বাস, মিথ্যা ও সংকীৰ্ণ সংস্কাৱ আৱ অচল ভাৰনাৰ নাগপাৰ্শ থেকে বেৱিয়ে যে জাতি পৱিবৰ্তনকে মেনে নিতে পাৰে না, তাৰা স্বোত্থীন নদীৰ মতো ছবিৰ হয়ে পড়ে। তাতে যুক্ত হয় মিথ্যা সংস্কাৱেৰ নতুন নতুন জঞ্জাল। রূপ্দ্ব হয় সম্ভাৰনাৰ সকল দ্বাৰ। আৱ যে জাতি একটি স্বাভাৱিক চলনধৰ্ম মেনে নতুনকে স্বাগত জানায়, নিঃসকোচে আলিঙ্গন কৰে নতুন সভ্যতাকে, সংস্কাৱেৰ নাগপাৰ্শ ছিন্ন কৰে নতুন জ্ঞানকে গ্ৰহণ কৰে, সে জাতিকে কখনো ছবিৰতা পেয়ে বসে না।

পৱিবৰ্তন আৱ অগতিৰ প্ৰধান শৰ্ত গতিশীলতা। সবকিছু ছবিৰ থাকলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতাৰ এতখানি অগস্তৰতা ঘটতো না।

১৫.

যে সহে, সে রহে।

ভাৰ-সম্প্ৰসাৱণ: এ সংসাৱে দুঃসময়ে যে ধৈৰ্য ধৰে, ইতিবাচক মনোভাৱ নিয়ে সুসময়েৰ অপেক্ষা কৰে, সে কখনো পৱাজিত হয় না। ধৈৰ্যশীলৱাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়।

পৃথিবীতে জীবন একদিকে যেমন পৱল উপভোগ্য, অন্যদিকে পৱাজয়, লাঞ্ছনা, হতাশা ও দুর্দশাৰ কশাঘাতে জৰ্জিৰিত। রোগ-শোক ও অভাৱ-অভিযোগ সংসাৱেৰ নিত্যদিনেৰ চিত্ৰ। তাই পীড়িত মানুষ যত্নগায় অসহায়বোধ কৰে, আঘাতে-অপমানে জজ্জিৰিত হয়, পৱাজয়েৰ গুণিতে নিমগ্ন হয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ে। কিন্তু ভেংে পড়ল চলবে না। খাৱাপ সময়কে মোকাবেলা কৰতে হবে। জীবনে পৱাজয় থাকে। সে পৱাজয় মেনে নিয়ে পৱবৰ্তী যুদ্ধজয়েৰ সংকল্পে ব্ৰতী হওয়াই বুদ্ধিমানেৰ কাজ। এজন্য দৱকাৱ অটৱ ধৈৰ্য, ছিৱ সংকল্প এবং যথাযথ পৱিকল্পনা। এমন কিন্তু আঘাত আছে, যাৱ বিপৰীতে প্ৰতিক্ৰিয়া না দেখিয়ে ধৈৰ্য ধৰলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। কাৰণ, সময় সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসক। নিজেৰ কৰা ভুলেও সব পৱিকল্পনা ভেঙ্গে যেতে পাৰে, অযোগ্যতাৰ দায়ে ভোগ কৰতে হতে পাৰে কঠিন দণ্ড। তখন ভেংে না পড়ে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। নতুন প্ৰতিক্ৰিয়া নিয়ে সবকিছু শুক্ৰ কৰতে হবে। তাহলেই মোচন কৰা সম্ভব হবে পূৰ্বেৰ গুণি। বিপদে অসহায়তাকে বৱণ কৰে হ্যাত-পা গুটিয়ে থাকাৰ মধ্যে নয়, তাকে মোকাবিলা কৱাৰ মধ্যেই মানুষেৰ সংগ্ৰামশীলতাৰ পৱিচয়।

জীবনে যত প্ৰতিকূলতাই আসুক না কেন, তাকে ধৈৰ্যেৰ সঙ্গে ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে মোকাবেলা কৰতে হয়। কাৰণ, জীবনে দুঃসময় না এলে সড়াই কৱা শেখা যায় না।

পরিচ্ছেদ ৪৭

চিঠিপত্র

বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষকে চিঠিপত্র লিখতে হয়। ব্যক্তিগত সংবাদ জানতে বা জানতে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতি বা নিয়ম মান্য করতে, আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জ্ঞাপনে, ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য — এ রকম নানা কারণে পত্র লেখা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্রের নমুনা এই পরিচ্ছেদে দেখানো হলো।

ব্যক্তিগত পত্র

আত্মীয়-সংজন এবং পরিচিত-অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে লিখিত যোগাযোগের উপায় হিসেবে ব্যক্তিগত পত্রের জন্য। ইন্টারনেট প্রযুক্তির যুগেও ব্যক্তিগত পত্রের কদর কমেনি, বরং ধরন বদলেছে। পূর্বে প্রধানত ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পত্রের আদান-প্রদান হতো। বর্তমানে ডাকের পাশাপাশি ই-মেইল আকারেও ব্যক্তিগত পত্রের আদান-প্রদান হয়। ব্যক্তিগত পত্রে মানুষের শিক্ষা, বৃক্ষিক্ষা, রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তিগত পত্রের গঠনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য গঠিত হতেও দেখা যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছিন্নপত্র’, ‘রাশিয়ার চিঠি’, ‘জাপান-যাত্রী’ ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত চিঠি লেখার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। পত্রের শুরুতে পত্রচনার তারিখ ও ছানের নাম উল্লেখ করতে হয়। যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তার সঙ্গে পত্রলেখকের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে তাকে কীভাবে সম্মোধন করা হবে। সাধারণত গুরুজনকে শুক্রেয়, মাননীয় ইত্যাদি সম্মোধন করা হয়। বয়সে ছোটো কাউকে পত্র লিখলে দ্রোহের, কল্যাণীয় ইত্যাদি সম্মোধন করা হয়। বন্ধু বা প্রিয়জনের ক্ষেত্রে প্রিয়, প্রাতিভাজনেশ্বু দিয়ে সম্মোধন করা হয়ে থাকে। অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নাম বা পদবির আগে প্রিয় বা জনাব লিখে সম্মোধনের কাজ সারা যায়। পত্রের মূল বক্তব্যে যাবার আগে সৌজন্য প্রকাশক কথাবার্তা লেখা হয়ে থাকে। সহজ, সরল ও হস্যঘাসী করে লেখার উপরই চিঠির সার্ধকতা নির্ভর করে। চিঠির পূর্বাপর বক্তব্যের সামঞ্জস্য, সংগতি ও ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। পত্রের শেষে ‘ইতি’ লেখার একটি রেওয়াজ বাংলায় প্রচলিত আছে। এরপর সম্পর্ক অনুযায়ী বিদায় সম্ভাষণ লিখে চিঠির শেষে নাম লিখতে হয়। লিখিত চিঠিটি ডাকযোগে গেলে খামের উপরে নাম-ঠিকানা লিখতে হয়, ই-মেইল আকারে পাঠালে নির্দিষ্ট জায়গায় ই-মেইল ঠিকানা ও চিঠির বিষয় লিখতে হয়।

এখানে কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রের নমুনা উল্লেখ করা হলো।

১. মাতার কাছে পুত্রের চিঠি

২. সেপ্টেম্বর ২০১৯
মতিবাল, ঢাকা

শ্রদ্ধেয় মা

আমার সালাম নিয়ো। আশা করি ভালো আছ।

আমি নিরাপদে ছাত্রাবাসে পৌছেছি। যদিও আসার পথে বাড়ির কথা ভেবে আমার মন খারাপ লাগছিল। প্রতিবারই বাড়ি থেকে আসার সময়ে আমার এ রকম হয়। এসেই জানতে পারলাম আগামী ১০ই নভেম্বর থেকে আমাদের প্রাক-নির্বাচন পরীক্ষা শুরু হবে। তাই পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার জন্য আশীর্বাদ কোরো। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় খানিকটা ছেদ পড়েছিল। তাই এখন বেশি পরিশ্রম করে লেখাপড়ার সাময়িক ক্ষতি পুরিয়ে নিচ্ছি। মা, আমি তোমাকে আমার জীবনের লক্ষ্যের কথা জানিয়েছি। আমি সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করার চেষ্টা করব। আসার সময়ে মেহরাবকে কিছুটা অসুস্থ দেখে এসেছি। এখন ও কেমন আছে, জানিয়ো। বাবাকে শরীরের প্রতি যত্ন নিতে বোলো। আমার জন্য চিঞ্চা কোরো না। আমি এখন ভালো আছি। ইতি

তোমার দ্রোহের
মাহের

ডাকে পাঠানোর জন্য খাম:

প্রেরক মাহের আবদুল্লাহ ২৪ আরামবাগ মতিবাল ঢাকা ১০০০	ডাকটিকিট প্রাপক ফারজানা রাহমান প্রয়ত্নে: আবদুল্লাহ আল মামুন গ্রাম: কামরানির চর ডাকঘর: পাঁচগাঁও উপজেলা: আড়াইহাজার জেলা: নারায়ণগঞ্জ
--	--

২. কন্যার কাছে পিতার চিঠি

২৩ নভেম্বর ২০১৯
তেজগাঁও, ঢাকা

দ্রেছের প্রাপ্তি

আমার আশীর্বাদ নিয়ো। আশা করি ভালো আছ।

গত চিঠিতে তোমার প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল জেনেছি। প্রায় সবগুলো বিষয়ে ভালো করেছ। গণিতে খানিকটা কম নদর পেয়েছ। এতে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। গণিতের কোন বিষয়গুলো বুঝাতে এখনও সমস্যা হচ্ছে, তা আগে শনাক্ত করো। প্রয়োজনে তোমার ক্লাসের গণিত শিক্ষকের সহযোগিতা নাও। মুখ্য না করে বুঝে পড়ার চেষ্টা কোরো। সামনে তোমার নির্বাচনী পরীক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষারও খুব বেশি দেরি নেই। তাই এই সময়টা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। জীবনে প্রতিটি মুহূর্তকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। পরীক্ষা শিক্ষকাজীবনের একটি অংশ। তাই পরীক্ষাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই সময়ে কীভাবে সৃষ্টি থেকে নিয়মানুযায়ী পড়াশোনা করা যায়, সেদিকে খেয়াল রেখো। বেশি বাত জেগে না, যথাসময়ে খাবার খেয়ো। আমরা বাসার সবাই ভালো আছি। ইতি

তোমার বাবা
অনিবৃক্ষ রায়

ই-মেইলে পাঠানোর জন্য ঠিকানা ও বিষয়:

প্রেরক: aniruddharay@gmail.com

প্রতি: praptiray@gmail.com

বিষয়: উপদেশ

৩. ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
সোবহানবাগ, ঢাকা

প্রিয় মতি

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এহণ করিস। অনেকদিন হলো তোর কোনো চিঠি পাচ্ছ না। ক্যাডেট কলেজের বন্ধুদের পেয়ে আমার কথা কি ভুলে গেছিস? আজ তোকে লিখতে বসেছি এক ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জানাতে। গত মাসী পূর্ণিমার ছুটিতে আমি আর সীমান্ত গিয়েছিলাম ঐতিহাসিক ছাপত্য নির্দশন

লালবাগ কেল্লা দেখতে। ইতিহাসের বইয়ে শায়েস্তা খাঁর কথা পড়েছি। সেই শায়েস্তা খাঁর আমলে নির্মিত ঢাকার প্রায় চারশো বছরের পুরানো ছাপনা এই লালবাগ কেল্লা। এর প্রাকৃতিক শোভা, প্রাচীন ছাপত্য-সৌন্দর্যের কথা চিঠিতে লিখে পুরোপুরি তোকে বোঝাতে পারব না।

আমরা সেদিন সকালেই লালবাগের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। পুরান ঢাকার লালবাগে এর অবস্থান। দর্শনার্থীদের জন্য ঢেকার প্রবেশ পথে টিকিট কাউন্টার। সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলাম। ভিতরে প্রবেশ করার পর কয়েকজন বিদেশি দর্শনার্থীকে দেখলাম। ফটকের ভিতরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক নয়নভিরাম সৌন্দর্য। মুঘল ছাপত্য, মসজিদ, উন্মুক্ত মাঠ, সুসজিত ফুলের বাগান দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু ১৬৭৮ সালে। তৎকালীন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র সুবেদার আজম শাহ এই কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে এর মূল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। লালবাগ কেল্লা মোঘল আমলের ঐতিহাসিক নির্দশন। এটি তৈরিতে একই সাথে ব্যবহার করা হয়েছে কষ্টি পাথর, মার্বেল পাথর এবং রং-বেরঙের টালি। লালবাগ কেল্লার তিনটি বিশাল দরজার মধ্যে যে দরজাটি বর্তমানে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া আছে, সেই দরজা দিয়ে চুকলে বরাবর সোজা চোখে পড়ে পরি বিবির সমাধি। পরি বিবি ছিলেন শায়েস্তা খাঁর অকালপ্রয়াত কন্যা। কেল্লার চতুরে আরো রয়েছে কেন্দ্ৰস্থলের দরবার হল ও হাম্মামখানা, উন্ডৱ-পশ্চিমাংশের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট শাহী মসজিদ ও একটি জাদুঘর। দর্শনার্থীদের জন্য বসার জায়গা আছে। ছাপনাগুলো ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের খুব ভালো লেগেছে। সময় পেলে তুইও একবার দেখে আসিস বাংলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লালবাগ কেল্লা। ভালো থাকিস। ইতি

তোর বন্ধু
দীপ্তি

ডাকে পাঠানোর জন্য খাম:

<p>প্রেরক দীপ্তি সরকার ১৯ সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার সোবহানবাগ ঢাকা</p>	<p>প্রাপক মতিউর রহমান নজরুল হাউস, কক্ষ নম্বর: ৩০ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ডাকঘর: মির্জাপুর টাঙ্গাইল</p>
--	--

৪. লেখকের কাছে পাঠকের চিঠি

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
মিরাবাজার, সিলেট

জনাব আহমদ সাদিক

আমার শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করছন। আমি আপনার পূর্বপরিচিত নই। আমি আপনার বইয়ের একজন পাঠক। এবারের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত আপনার 'বাংলাদেশের প্রাচিক-উৎসব' বইটি আমি পড়েছি। বইটি বইমেলা থেকেই সংগ্রহ করেছি। প্রত্যাশা ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আপনার আক্ষর সংবলিত বইটি পাব। কিন্তু সেদিন আপনি স্টলে আসেননি। আমাকেও পরদিন সিলেটে ফিরতে হয়েছে।

'বাংলাদেশের প্রাচিক-উৎসব' বইটি পড়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। মূলধারার উৎসবের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রাচিক অঞ্চলে যে কত উৎসব আছে, তা আপনার বই পড়ার আগে জানতে পারিনি। আপনি একজন নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। এই বই রচনায় আপনার সেই যোগ্যতার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। আমি বেশি খুশি হয়েছি এই জন্য যে, সিলেট অঞ্চলের মণিপুরি, খাসিয়া ও চা শ্রমিকদের উৎসবের কথা আপনার বইয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। বইটির ভাষা ও অধ্যায়-বিভাজন আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। ৩১২ পৃষ্ঠার বইটি আমি দুই দিনে পড়ে শেষ করেছি।

আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রত্যাশা রইল। যদি কখনও সিলেটে আসেন, আমাকে জানালে ও আমাদের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করলে খুশি হব। আপনার জন্য শুভ কামনা। ইতি

আতিকুল ইসলাম

ই-মেইলে পাঠানোর জন্য ঠিকানা ও বিষয়:

প্রেরক: atikulislam@gmail.com

প্রতি: ahmadsadik@gmail.com

বিষয়: শুভেচ্ছা বার্তা

আমন্ত্রণপত্র

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানোর পত্রকে আমন্ত্রণপত্র বলে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস, জন্মবার্ষিকী, বিবাহ, মৃত্যবার্ষিকী, সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা, নাগরিক সংবর্ধনা, নাট্য-উৎসব, লোক-উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র রচনা করা হয়। আমন্ত্রণপত্র সাধারণত মুদ্রিত হয়। অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট তারিখের কিছুদিন পূর্বে আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করা হয়। অনেক সময়ে আমন্ত্রণপত্রের উপরের দিকে অনুষ্ঠানের শিরোনাম লেখা থাকতে পারে। এখানে দুটি আমন্ত্রণপত্রের নমুনা উল্লেখ করা হলো:

১. রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র

রবীন্দ্র জয়ন্তী ১৪২৮

সুধী

আগামী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৮ শনিবার ৮ই মে ২০২১ সকাল ১০টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জামালপুর জিলা কুলের সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে কুল-মিলনযাতনে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপর্যুক্ত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন জামালপুর জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আখতার জামান। ‘রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন’ বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন সরকারি বিনোদ বিহারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. আয়াজ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আউয়াল ফয়সাল।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

মুশ্ফিক রোহান

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

জামালপুর জিলা কুল ছাত্রসংসদ

অনুষ্ঠানসূচি

- | | |
|---------|--|
| ১০:০০ : | অতিথিদের আসন গ্রহণ |
| ১০:০৫ : | ‘রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ |
| ১০:৩০ : | প্রধান অতিথির ভাষণ |
| ১০:৪৫ : | সভাপতির ভাষণ |
| ১১:০০ : | সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তি |
| ১১:৩০ : | নাটক ‘চিরকুমার সভা’ |
| ১২:০০ : | অনুষ্ঠানের সমাপ্তি |

২. নাগরিক সংবর্ধনা উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র

সুধী

আগামী ১৯শে মার্চ ২০২১ শুক্রবার বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কুমিল্লা টাউন হল মিলনায়তনে অধ্যাপক-গবেষক নুরজল আলমের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আকতার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কথাসাহিত্যিক নোমান রায়হান।

অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করছি।

বিপুল বর্মণ

আব্রাহাম

নুরজল আলম সংবর্ধনা পরিযদ

অনুষ্ঠানসূচি

৪:৩০	অতিথিদের আসন গ্রহণ
৪:৩৫	সূচনা সংগীত
৪:৫০	স্বাগত বক্তব্য
৫:০০	সংবর্ধনা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
৫:১০	উন্নয়ন পরিধান ও ক্রেস্ট প্রদান
৫:১৫	বিশেষ অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য
৫:৪৫	প্রধান অতিথির বক্তব্য
৫:৫৫	অধ্যাপক নুরজল আলমের প্রতিক্রিয়া
৬:১০	সভাপতির বক্তব্য
৬:৩০	সমাপ্তি ঘোষণা

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি

ছানীয় বা জাতীয় কোনো সমস্যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে এক ধরনের পত্র মুদ্রিত হয়। এসব পত্রের একটি শিরোনাম থাকে। এতে সাধারণত কোনো সম্বোধন থাকে না। তবে পত্রলেখকের নাম ও পরিচয় মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় এই ধরনের পত্র পাঠাতে পত্রিকা-সম্পাদকের বরাবর আলাদা একটি চিঠি লিখতে হয়।

নিচে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে দুটি চিঠির নমুনা উল্লেখ করা হলো।

১. স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্দশার কথা জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য চিঠি

৩ জুন ২০২১

সম্পাদক

দৈনিক সমকাল

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা

ঢাকা ১২১৫

বিষয়: ‘চিঠিপত্র’ কলামে প্রকাশের জন্য পত্র।

মহোদয়

আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিকে সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই।

বিনীত

জামাতুল মাওয়া

জুলগাঁও, শ্রীবদ্বী, শেরপুর।

জুলগাঁও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে নজর দিন

শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার জুলগাঁও একটি সৌমান্তবর্তী গ্রাম। দুই দশক আগে কমিউনিটি স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় পাহাড়-চিলা-বন পরিবেষ্টিত দুর্গম এ-অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশেপাশের ছয়টি গ্রামের দশ হাজার মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য অন্তত পাঁচ জন চিকিৎসক থাকার কথা, আছেন তিন জন; তাঁরাও নিয়মিত আসেন না। ভবনটিও সংক্ষারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। নিয়মিত ঔষধের সরবরাহ নেই। সাধারণ মানুষ যথাযথ চিকিৎসা না পেয়েই ফিরে যাচ্ছে। ধনাত্য বাক্তিরা হয়তো জেলাশহরে বা ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা পেতে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

এলাকাবাসীর দাবি, এই কর্কণ অবস্থা থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে রক্ষা করা হোক। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। যথাযথ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে জুলগাঁও স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নিয়মিত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জুলগাঁও গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করে।

জাঘাতুল মাওয়া

জুলগাঁও, শেরপুর।

প্রেরক	প্রাপক	তাকাটিকিট
-----	-----	
-----	-----	

২. সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী চিঠি

২৫ এপ্রিল ২০১৯

সম্পাদক

দৈনিক প্রথম আলো

১৯ কারওয়ান বাজার

ঢাকা ১২১৫

বিষয়: ‘চিঠিপত্র’ কলামে প্রকাশের জন্য পত্র।

মহোদয়

আগন্তুর বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সড়ক-দুর্ঘটনার প্রতিকার সংক্রান্ত একটি পত্র এইসঙ্গে যুক্ত করা হলো। পত্রটি ছাপা হলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

বিনীত
লিটন রোজারিও
নীলক্ষেত, ঢাকা।

সড়ক দুর্ঘটনার অবসান চাই

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সমস্যা ও আতঙ্কের নাম সড়ক দুর্ঘটনা। প্রায়ই টেলিভিশনের পর্দায় ও পত্রিকার পাতায় চোখে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনার মর্মান্তিক খবর। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন অনেক মানুষ আহত ও নিহত হচ্ছে। একটি পত্রিকার তথ্য মতে, ২০২০ সালে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার সড়ক দুর্ঘটনায় সাত হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। মৃত্যুর মিছিল যেন থামছে না। আহত অনেকে দুর্বিধা জীবন যাপন করছে। এই ধরনের মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটি এখন জাতীয় সমস্যায় পরিগত হয়েছে। এর প্রতিকার জরুরি। প্রতিটি মানুষের প্রাণ মহামূল্যবান। তাই আমরা চাই না, সড়ক দুর্ঘটনায় আর একটি প্রাণও বারে পড়ুক। এই সমস্যার ছায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আমাদের দেশে সাধারণত কয়েকটি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে থাকে: যেমন – অনুপযোগী রাস্তা, ত্রুটিমুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ চালক, ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পথ্য পরিবহণ, ওভারটেকিং, ট্রাফিক আইন অমান্য করা ইত্যাদি। পথচারীদের ফুটপাথ, জেন্রো ক্রসিং, ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করার ফলেও অনেক সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। সমস্যা যেহেতু চিহ্নিত, সেহেতু এর থেকে মুক্তির পথ বের করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হবে না। রাস্তাগুলোকে নিয়মিত সংস্কার করার পাশাপাশি প্রয়োজনে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। আমরা আশা করি, সমস্যা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

লিটন রোজারিও
নীলক্ষেত, ঢাকা।

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
----- -----	----- -----	

মানপত্র

আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টিকে বরণ করা, বিদায় দেওয়া, সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানানোর জন্য যে পত্র রচনা করা হয়, তাকে মানপত্র বলে। মানপত্র সাধারণত বহু দর্শক-শ্রেতার উপস্থিতিতে পাঠ করা হয়। এ ধরনের পত্রের ভাষা খানিকটা অলংকারমণ্ডিত হতে পারে। তবে এর আয়তন সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাঁর বা যাঁদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পড়া হয়, মানপত্রে তাঁর বা তাঁদের দক্ষতা, যোগ্যতা, কৃতিত্ব প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মানপত্র সুন্দর হত্তাক্ষরে লিখে অথবা ছাপিয়ে বাধাই করা যেতে পারে।

নিচে দুটি মানপত্রের নমুনা দেখানো হলো।

১. এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে মানপত্র

বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের
২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে
মানপত্র

হে বিদ্যায়ী অছাজবৃন্দ

যেপথ একদিন তোমাদের নিয়ে এসেছিল এই বিদ্যালয়ের সবুজ আঙিনায়, আজ সেই পথই আবার তোমাদের ডাক দিয়েছে: 'কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত!' হৃদয়-বীণায় তাই আজ বাজছে বিদায়ের করণ সুর। শুভ হোক তোমাদের ভবিষ্যতের পথচলা। তোমরা আমাদের গ্রীতি ও শুঙ্গ গ্রহণ করো।

হে অছাজ সতীর্থবৃন্দ

এই বিদ্যালয়ে তোমাদের কেটেছে স্মৃতিময়, গ্রীতিময় অনেক দিন। তোমাদের প্রাণেচ্ছল পদতারে এই বিদ্যালয়ের আঙিনা ছিল মুখরিত। তোমাদের সাহচর্যে আমরাও নানাভাবে উপকৃত হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহসিঙ্গ গ্রীতিময় বক্ষন যেন অটুট থাকে আজীবন। এই বিদায় আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। একবার এই বিদ্যাময়ীর স্নেহতলে আশ্রয় নিলে তিনি কখনও কাউকে ঘন থেকে বিদায় দেন না। তোমরা শিক্ষাজীবনের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উঠীত হতে যাচ্ছ, যে জন্য তোমাদের অভিনন্দন। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় তোমাদের সাফল্য কামনা করি।

হে অপ্রিকবৃন্দ

নবজীবনের আহ্বানে, আলোকিত জীবনের সঙ্কানে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ নবদিগন্তের দিকে। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশের দুঃখ, দারিদ্র্য ও অক্ষকার ঘৃঢ়য়ে তোমরা গড়ে তুলবে সুধী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ – এ আমাদের প্রত্যাশা। তোমরাই আবে সোনালি উষার আলোকিত দিন।

তোমাদের নতুন অভিযাত্রা সফল হোক।

তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২১

তোমাদের গ্রীতিধন্য অনুজবৃন্দ

বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

২. খ্যাতিমান কবি বা সাহিত্যিকের আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র

রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে
নন্দিত কথাসাহিত্যিক জনাব আহমদের আগমনে
শুভার্থ্য

হে বরেণ্য অতিথি

বরেন্দ্ৰভূমি নামে খ্যাত রাজশাহী আজ আপনার পদধূলিতে ধন্য। রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার শুভাগমনে আমরা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। আপনার সাহচর্য পেয়ে আমরা উৎসাহিত ও উজ্জীবিত। আপনি আমাদের প্রাণতালা শুভার্থ্য গ্রহণ করুন।

হে নন্দিত কথাশিল্পী

বাংলাদেশের সমকালীন কথাসাহিত্যে আপনার অবদান অনন্য। নিম্নবিত্ত মানুষ ও মধ্যবিত্ত জীবন জৰুরাগে আপনার শৈলিক দক্ষতা বিশ্বাসকর ও চূড়াস্পর্শী। কথাশিল্পী হিসেবে আপনার উন্নত জীবনবোধ, শৈলিক চৈতন্য পাঠকদের মুক্ত করে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আপনার রয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা। আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা মুক্ত ও অভিভূত।

হে ভবিষ্যাতের দিশারি

আপনার লেখা আমাদের নতুন পথের দিশারী। নতুন প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ করে তুলতে আপনার লেখনী কাজ করে চলেছে নীরবে, নিভৃতে। আমাদের বিদ্যালয়ে আপনার আগমন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। বাংলাদেশের সাহিত্যের আকাশে আপনার সাহিত্যকর্ম চির-উজ্জ্বল সূর্যের মতো আলো ছড়াক। এই আমাদের একান্ত কামনা।

তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২১

শুভাসহ,
আপনার গুণমুক্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ
রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

আবেদনপত্র

ফুল-কলেজে কিংবা বিভিন্ন অফিসে বা সংস্থায় প্রতিষ্ঠান-প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখার প্রয়োজন হয়। এ ধরনের পত্রকে দরখাস্ত বা আবেদনপত্র বলে। আবেদনপত্রের আকার সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয়। সেখানে মূল প্রসঙ্গটি যথাযথভাবে উপস্থাপন করাটাই লক্ষ্য। এ ধরনের পত্রে অনেক সময়ে প্রমাণ ঘৰুপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করা হয়।

নিচে তিনটি আবেদনপত্রের নমুনা দেখানো হলো।

১. ছুটির জন্য আবেদন

১২ জুলাই ২০২১

প্রধান শিক্ষক

মতিবাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মতিবাল, ঢাকা

মাধ্যম: শ্রেণিশিক্ষক, নবম শ্রেণি

বিষয়: অনুপস্থিতির কারণে ছুটি প্রদানের আবেদন।

মহোদয়

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। জ্ঞরে আত্মসম্মত হওয়ার কারণে গত ১৬ই মে ২০২১ থেকে ১৮ই মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিনি) দিন আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি।

আমার অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিত ওই ৩ দিনের ছুটি মন্তব্য করতে আপনার সদয় মর্জিকামনা করছি।

বিনীত

মৌমিতা শৰ্বনন্দ

শ্রেণি: নবম

রোল নং: ১২

সংযুক্তি:

১. চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র

২. পাঠাগার স্থাপনের জন্যে আবেদন

৪ জুলাই ২০২১

চেয়ারম্যান
ফুলবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
বরগুনা সদর উপজেলা
বরগুনা

বিষয়: পাঠাগার স্থাপনের জন্যে আবেদন।

মহোদয়

আমরা বরগুনা জেলার সদর উপজেলার ফুলবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের বাসিন্দা। আমাদের ইউনিয়নের বাসিন্দাদের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। তাদের অনেকেই বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকুরিসহ নানা পেশায় যুক্ত। বর্তমানে এই ইউনিয়নে যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত অভূতপূর্ব উন্নয়নের কারণে নানা প্রকার সহশিক্ষাক্রম কর্মকাণ্ড এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়খ্রের বিষয়, এই ইউনিয়নে অব্যাহত শিক্ষা এহাগের জন্য কোনো পাঠাগার নেই। যেজন্য এই অঞ্চলের জনগণ নিয়মিতভাবে বই পাঠ করার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই অবস্থায় ফুলবুড়ি ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত

ফুলবুড়ি ইউনিয়নবাসীর পক্ষে
মোঃ হাবিবুর রহমান
গ্রাম: ফুলবুড়ি, ডাক্তার: ফুলবুড়ি, জেলা: বরগুনা।

৩. সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন

১০ অক্টোবর ২০২১

প্রধান শিক্ষক

কুলকান্দি শামসুজ্জাহার উচ্চ বিদ্যালয়

কুলকান্দি, ইসলামপুর

জামালপুর

বিষয়: বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

মহোদয়

সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, আপনার বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী। আমার ব্যক্তিগত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ:

১. নাম	:	রেখা আকুলুর
২. মাতার নাম	:	খোদেজা বেগম
৩. পিতার নাম	:	একরামুল হক
৪. বর্তমান ঠিকানা	:	৩৩ পশ্চিম নয়াপাড়া, জামালপুর সদর উপজেলা জেলা: জামালপুর
৫. ছায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: হরিণধরা, ডাকঘর: কুলকান্দি ইউনিয়ন: কুলকান্দি, উপজেলা: ইসলামপুর জেলা: জামালপুর
৬. জন্ম তারিখ	:	২৫ জুন ১৯৯৪
৭. জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি
৮. ধর্ম	:	ইসলাম
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	

পরীক্ষা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	পাশের বছর	বিভাগ	ফলাফল
এসএসসি	শহিদ সৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	ঢাকা	২০১১	মানবিক	জিপিএ ৪.০০

এইচএসসি	ইসলামপুর ডিগ্রি কলেজ	ঢাকা	২০১৩	মানবিক	জিপিএ ৪.৫০
বিএ (সম্মান)	জাহেদা শফির মহিলা কলেজ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৭	বাংলা	সিজিপিএ ৩.০০

আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং নথি অনুরোধ করছি।

নিবেদক

(স্বাক্ষর)

রেখা আক্তার

৩৩ পশ্চিম নয়াপাড়া

জামালপুর সদর উপজেলা

জেলা: জামালপুর

সংযুক্তি:

- ক. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের অনুলিপি
- খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি
- গ. দুই কপি ছবি
- ঘ. তিনশো টাকার পে-অর্ডার

ব্যাবসায়িক পত্র

নিজের প্রয়োজনে বা ব্যবসার কাজে অনেক সময়ে বিভিন্ন ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পত্র-বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের পত্রকে ব্যাবসায়িক পত্র বলে। এসব পত্রের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক থাকে।

নিচে দুটি ব্যাবসায়িক পত্রের নমুনা দেখানো হলো।

১. ডাকযোগে পুন্তক পাঠানোর আবেদন

৭ জানুয়ারি ২০২১

বিক্রয় কর্মকর্তা

অজন্তা প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০

বিষয়: ভিপি হিসেবে ডাকযোগে পুন্তক পাঠানোর আবেদন।

প্রিয় মহোদয়

আপনাদের প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত নিচের তালিকাভুক্ত বইগুলোর একটি করে কপি নিচের ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। ভিপি হিসেবে ডাকযোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলে বইগুলো গ্রহণের সময়ে আমি যাবতীয় অর্থ পরিশোধ করতে পারব। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানাই।

আপনার বিশ্বাস্ত

(স্বাক্ষর)

মকবুল হোসেন

৪৯ পাঁচড়িয়া, গোপালগঞ্জ

বইয়ের তালিকা:

১. ইকবাল সিরাজ, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস
২. নাজমুল হক, সঠিক নিয়মে লেখাপড়া
৩. মাহফুজা আকতা, ঘুরে এলাম বাগেরহাটি

২. ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন

৩০ আগস্ট ২০২১

ব্যবস্থাপক

সোনালী ব্যাংক লি.

কালীগঞ্জ শাখা, বিনাইদহ

বিষয়: ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন।

প্রিয় মহোদয়

আপনার ব্যাংকে আমাদের সম্পত্তি ও চলতি উভয় প্রকার হিসাব খোলা আছে। আপনি হয়তো অবগত যে, আমাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেসার্স জননী ট্রেডার্স দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের ব্যাংকে সুনামের সাথে লেনদেন পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি আমরা আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে আনুমানিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উক্ত ঋণের মূলধন এবং সুদের অর্থ আমরা মোট ৩৬ কিন্তু ত ৩ বছরে পরিশোধ করতে চাই। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের ব্যাংকের সকল শর্ত মেনে চলব। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা আপনাদের ব্যাংক থেকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ নিই এবং তা যথাসময়ে পরিশোধ করি।

আমাদের চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বাস

(স্বাক্ষর)

অনীক রহমান

স্বত্ত্বাধিকারী, মেসার্স জননী ট্রেডার্স

কালীগঞ্জ, বিনাইদহ

সোনালী ব্যাংকের সম্পত্তি হিসাব নং: ১১৭৭১৮

চলতি হিসাব নং: ১২৫২০১

সংযুক্তি:

১. ব্যবসা সম্প্রসারণের কর্মপরিকল্পনা

২. পূর্বের ঋণ পরিশোধের প্রমাণপত্র

পরিচ্ছেদ ৪৮

সংবাদ প্রতিবেদন

প্রচারমাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত বিবরণীকে সংবাদ প্রতিবেদন বলে। যিনি এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন, তাঁর নাম প্রতিবেদক। প্রতিবেদককে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয় এবং ঘটনার পক্ষপাতাইন বিবরণ তৈরি করতে হয়।

সংবাদ প্রতিবেদনের শুরুতে একটি শিরোনাম থাকে। এরপর প্রতিবেদকের নাম, ঘটনার স্থান ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

নিচে কয়েকটি প্রতিবেদনের নমুনা দেওয়া হলো।

১. বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ প্রতিবেদন

বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মনীষা তথ্যস্থান, বান্দরবান, ২৯ জানুয়ারি ২০২১ ॥ বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২৮শে জানুয়ারি ২০২১ রবিবার বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য নবীনবরণ এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুটিলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি উদয় কুমার চাকমা। তিনি বলেন, এই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নবীন শিক্ষার্থীদের তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার আহ্বান জানান এবং ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন।

এ বছর বিদ্যালয়টির মানবিক শাখা থেকে পদ্ধতি জন, বিজ্ঞান শাখা থেকে চল্লিশ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে পঁচিশ জনসহ সর্বমোট একশ পালেরো জন পরীক্ষার্থী আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজয় ত্রিপুরা এই নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী লিলিত সরকার, বালুটিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহিতুল আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এ দিনের সাড়মৰ আয়োজন সমাপ্ত হয়।

২. এলাকার সড়কের দুরবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন

সড়কের বেহাল দশা: যাত্রীদের দুর্ভোগ

হাসিবুল আলম, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২ জুলাই ২০২১ ॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক ঘুণ ধরে সড়কটির কোনো সংক্ষার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০১৯ সালের বন্যায় সড়কটির সুরক্ষির স্তর দেখে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়, এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য ছানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংক্ষার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩. বিদ্যালয়ে ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্যাপন সম্পর্কিত সংবাদ প্রতিবেদন

কুপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্যাপিত

জবেদ হোসেন, মিরপুর, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ॥ ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষে কুপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ দিনবাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রভাতক্রেরির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময়ে সবার কঠে ধ্রনিত হতে থাকে একুশের গান – ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’। ভাষা-শহিদদের প্রতি শুধু জানানোর পর শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিদের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। আবৃত্তি শেষে দেশাত্মক গান পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দল। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল আলোচনা-সভা। ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’-এর উপরে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আবেদুর রহমান। তিনি বলেন, ‘মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাঞ্ছিন্ন জাতিকে উদ্বৃক্ষ করেছিল স্বাধিকার আন্দোলনে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তা প্রেরণার উৎস।’ এরপর আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান।

৪. বৃক্ষরোপণ বিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদন

রৌমারীতে বৃক্ষরোপণ উৎসব

পিয়াস বাড়ৈ, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২২ জুলাই ২০২১ ॥ রৌমারী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল ২১শে জুলাই বুধবার রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়সহ উপজেলার দশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচ শত শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষের মধ্যে একটি ফলদ ও একটি বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়। এর আগে রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রৌমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আমীন। এ সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মোহাম্মদ আমীন পরিবেশের ভারসাম্য বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন হতে বলেন। প্রতি বছর প্রত্যক্ষের বাড়ির ফাঁকা জায়গায় অন্তত দুইটি গাছের চারা রোপণের পরামর্শ দেন। এরপর বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তর প্রান্তে একশো মেহগানি, শিশু ও সেগুন গাছের চারা রোপণ করা হয়।

৫. সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা বিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদন

চারুকলায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ॥ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন – বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরুষার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিন জন করে মোট হয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন এই চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়শা সুলতানা ও ড. আফজাল হোসেন খান। জয়নূল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরুষার বিতরণ করেন সাংস্কৃতিক মহী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

পরিচ্ছদ ৪৯

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ এক প্রকার গদ্য রচনা। কোনো বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞারিত ধারণা দিতে প্রবন্ধ রচিত হয়। সব ধরনের প্রবন্ধকে অস্তত ভিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা – বর্ণনামূলক প্রবন্ধ, চিত্তামূলক প্রবন্ধ ও ব্যক্তি অনুভূতিমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধের নমুনা অংশের ‘বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প’ বা ‘ভাষা আন্দোলন’ প্রবন্ধকে বলা যায় বর্ণনামূলক প্রবন্ধ, ‘সময়ানুবর্তিতা’ বা ‘মাদকাসত্তি’ প্রবন্ধকে বলা যায় চিত্তামূলক প্রবন্ধ, এবং ‘লংগ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা’ বা ‘কোনো ঘটনার স্মৃতি’ প্রবন্ধকে বলা যায় ব্যক্তি অনুভূতিমূলক প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ক. ভূমিকা হলো প্রবন্ধের প্রবেশক অংশ। এটি সাধারণত এক অনুচ্ছেদের হয়। এই অংশে প্রায়ই মূল আলোচনার ইঙ্গিত থাকে।
- খ. উপসংহার হলো প্রবন্ধের সমাপ্তি অংশ। প্রবন্ধের প্রকৃতি অনুযায়ী এখানে সাধারণত ফলাফল, সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি ছান পায়।
- গ. প্রবন্ধের মূল অংশ একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত হয়ে থাকে। অনুচ্ছেদগুলো যাতে সমরূপ থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। যুক্তি বা কালের অনুক্রম মনে রেখে অনুচ্ছেদগুলোর সমরূপতা ঠিক করা যেতে পারে।
- ঘ. বিশেষভাবে বর্ণনামূলক ও চিত্তামূলক প্রবন্ধের বেলায় অনুচ্ছেদগুলোর আলাদা শিরোনাম থাকে। এগুলোর নাম অনুচ্ছেদ-শিরোনাম। এসব শিরোনামের পরে কোলন যতি (:) দিয়ে লেখা শুরু করা যায়।
- ঙ. প্রবন্ধের ভাষা হওয়া উচিত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।
- চ. প্রবন্ধের প্রতিটি অনুচ্ছেদ লেখার সময়ে প্রবন্ধের শিরোনামের কথা মনে রাখতে হয়, তাতে প্রবন্ধের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রবেশ করতে পারে না।
- ছ. উক্তি ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত। অপরিহার্য না হলে উক্তি ব্যবহার করা ঠিক নয়। বিশেষভাবে বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে অন্য কোনো ভাষার উক্তি বজ্জিয়।
- জ. প্রবন্ধের নির্দিষ্ট কোনো আয়তন নেই। এমনকি এর অনুচ্ছেদসংখ্যাও নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা কমবেশি এক হাজার হতে পারে।

প্রবন্ধের কয়েকটি নমুনা নিচে দেখানো হলো।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

ভূমিকা: মানুষ ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। এই পছন্দকে কাজে লাগিয়ে ভ্রমণ-বাক্স এক ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যার নাম পর্যটন শিল্প। এই শিল্পের কাজ হলো কোনো অঞ্চলের দর্শনীয় স্থানগুলোর তথ্য ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে তুলে ধরা, ভ্রমণের সুবিনোবষ্ট করা এবং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা। বাংলাদেশের একাধিক বনাঞ্চল, পাহাড়-নদী-বারুনা, শস্যশোভিত মাঠ ও সবুজ প্রকৃতি, বিশের দীর্ঘতম সমুদ্র-সৈকত, নান্দনিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ও নির্দশন প্রভৃতি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

তাই বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। এগুলোর টানে বিপুল সংখ্যক বিদেশি পর্যটকের বাংলাদেশে আসার সুযোগ রয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ পর্যাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন-কেন্দ্রসমূহের দিকে তাকানো যাক।

সুন্দরবন: বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের অধিক জায়গা জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাধ্যক্ষ। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও বরগুনা জেলায় এর অবস্থান। সুন্দরী বৃক্ষ, গোলপাতাসহ নানা জাতের উদ্ভিদ এবং চিরাল হরিণ, বাঘ, বানর, হনুমানসহ নানা জাতের পশুপাখির আবাস এই সুন্দরবন। অভ্যন্তরে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খালে রয়েছে কুমির। রোমাঞ্চপ্রিয় পর্যটকগণ নৌযানে করে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যেতে পারেন। ভয় ও ভালো-লাগার অপূর্ব মিশেলের কারণে সুন্দরবন ভ্রমণ যে-কোনো পর্যটকের স্মৃতিতে ছাঁরী হয়ে থাকে।

সিলেটের রাতারগুল: সিলেট জেলার গোয়াইনঘাটে অবস্থিত রাতারগুল জলাবন বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির বন। এর আয়তন ৩ হাজার ৩২৫ একর। ১০ ফুট গভীর পানির উপর বনের গাছপালা জেগে থাকে। বর্ষাকালে পানির গভীরতা হয় ২০-৩০ ফুট পর্যন্ত। পর্যটকগণকে নৌকায় করে বনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এখানে উপভোগ করার মতো আছে কদম, হিজল, অঙ্গুন, ছাতিম প্রভৃতি গাছের সৌন্দর্য। বেড়াতে বেড়াতে দেখা হয়ে যায় বানর, বেজি, গুইসাপ, কিংবা সাদা বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি প্রভৃতি প্রাণী ও পাখির সঙ্গে।

সমুদ্র সৈকত: কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম (১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ) প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত। সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকরা ভিড় করেন কক্সবাজারে। সমুদ্র ছাড়াও কক্সবাজার জেলায় রয়েছে একাধিক স্কুন্দ্র জাতিসভার ধর্মীয় উপাসনালয় ও বৃক্ষ মূর্তি। ছাপতাশিলের বিচারে এগুলো অমূল্য। এছাড়া চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, কক্সবাজারের ইনানি, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, সুন্দরবনের কটকা প্রভৃতি সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণপিসাসুরা বেড়াতে যান। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত সেট্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে রয়েছে নারিকেল গাছ। দ্বীপ থেকে সমুদ্রের নীল জলরাশির সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং নানা রকমের প্রবাল দেখতে পর্যটকরা সেট্টমার্টিন দ্বীপে ভ্রমণ করেন।

পার্বত্য অঞ্চল: বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ অর্থাৎ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র। একদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মেঘ ছোঁয়ার আনন্দ, অন্যদিকে প্রাকৃতিক জলের উৎস বরনাধারা পর্যটকদের অভিভূত করে। রাঙ্গামাটির কাঙাই হৃদে নৌকায় ভেসে বেড়ানো যায়। হৃদের উপরে একটি সুন্দর্য ঝুলত সেতু রয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত আলুটিলা পাহাড়, রিসাং ঝরনা, মায়াবিনী লেক

প্রভৃতি ছানে ভ্রমণের হাতছানি পর্যটকরা অস্থায় করতে পারে না। সিলেটের জাফলং-এর পিয়াইন নদীতে মনোমুক্তকর পাথুরে জলের ধারা, মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ড ঝরনা; হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও পঞ্চগড়ের চা বাগান; শ্রীমঙ্গলের ইকোপার্ক প্রভৃতি ছান প্রায় সারাবছরই পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত থাকে। এ অঞ্চলসমূহে ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মানুষদের বর্ণিল জীবনচারণ পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের একমাত্র পার্বত্য দ্বীপ মহেশখালী। বিখ্যাত আদিনাথ মন্দির ও বড়ো রাখাইনপাড়া বৌদ্ধ মন্দির এই দ্বীপেই অবস্থিত।

পুরাকীর্তি: বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দর্শনগুলোর রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। পুরান ঢাকার লালবাগে অবস্থিত মুঘল ছাপত্য লালবাগ কেল্লা, বৃড়িগঙ্গার তীরে নির্মিত আহসান মঞ্জিল, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও-এ গড়ে গঠ্য অনুপম ছাপত্য শৈলীবিশিষ্ট পানাম নগর, কুমিল্লায় আবিস্তৃত প্রাচীন নগর ময়লামতী, বগুড়ার প্রাচীন পুরাকীর্তি মহাজ্ঞানগড়, নরসিংহী জেলার বেলাব উপজেলার অন্তর্গত আড়াই হাজার বছর পূর্বের প্রত্ননির্দর্শন সংবলিত উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রাম, নওগাঁ জেলায় আবিস্তৃত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বৌদ্ধবিহার পাহাড়পুর, বাগেরহাটের ঘাটগম্বুজ মসজিদসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক ছাপত্যকলার বহু নির্দর্শন।

ঐতিহাসিক ছাপনা: আরেক শ্রেণির ছাপত্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের শহিদদের মৃরণে ঢাকা মেডিকেল প্রাঙ্গণে ছাপিত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদদের প্রতি নিবেদিত ও ঢাকার সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ, ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত জাতীয় জাদুঘর, ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নিহত বৃক্ষজীবীদের মৃরণে ঢাকার মিরপুরে নির্মিত বৃক্ষজীবী স্মৃতিসৌধ, ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং এই উদ্যানে ছাপিত স্বাধীনতা জাদুঘর ইতিহাসপ্রেমী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অবস্থা: পর্যটন বিশ্বব্যাপী একটি সম্ভবনাময় খাত। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিশ্বজুড়ে পর্যটিকদের সম্মিলিত বার্ষিক ভ্রমণ-ব্যয় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এমন অনেক দেশ রয়েছে, যার প্রধান আয়ের উৎস পর্যটন। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প দিনে দিনে বিকাশ লাভ করছে। একদিকে বিদেশি পর্যটিকদের আগমন দেশের বৈদেশিক মুদুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে, অন্যদিকে দেশীয় পর্যটিকদের ভ্রমণ সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি বছর ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ দেশীয় পর্যটক বাংলাদেশের বিভিন্ন ছানে ভ্রমণ করে। এদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এই বিপুল সংখ্যক পর্যটিক বিভিন্ন ছানে চলাচল করায় পর্যটনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনীতি গতি লাভ করে। পরিবহণ, আবাসিক হোটেল, রেস্টোরাঁ, পোশাক, অলংকার প্রভৃতি ব্যবসায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে জড়িত। পর্যটনের বিকাশে অসংখ্য মানুষের জীবিকারণ ও সংস্থান হয়। বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, পর্যটন শিল্প থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত জিডিপি অর্জন করা সম্ভব।

পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব: একটি দেশের পর্যটন শিল্প বিকশিত হলে সেই দেশের সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধি হয়। পর্যটন এলাকায় অধিবাসীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি তৃরাষ্ট্রিত হয়। পর্যটকদের আগ্রহ রয়েছে এমন স্থান, স্থাপনা বা বিষয়ের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদেরও শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তারা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় তাগিদ অনুভব করে। এছাড়া পর্যটনের সূত্রে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মেলবন্ধন একটি মানবিক বিশ্ব তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

পর্যটন শিল্পের বিকাশে করণীয়: পৃথিবী ব্যাপী পর্যটন শিল্প এখন দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। বাংলাদেশে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর দিলে পর্যটন এলাকাগুলোতে পর্যটকদের যাতায়াত বাঢ়বে। প্রথমেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত যাতায়াত ব্যবস্থার দিকে। উন্নত পথ ও যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকলে পর্যটকরা নিরঙ্গসাহিত হবেন, এটাই ব্যাপক। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলসহ বেশকিছু পর্যটনকেন্দ্রে পৌছানোর সহজ পথ ও যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি। পর্যটকরা যাতে নির্ভর ও নিঃসংযোগে ভ্রমণ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অতিরিক্ত ভ্রমণ-ব্যয় পর্যটকদের ভ্রমণে নিরঙ্গসাহিত করে। তাই, যাতায়াত এবং ধাকা-খাওয়াসহ সংশ্লিষ্ট ব্যয় যাতে সীমার মধ্যে থাকে তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

উপসংহার: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থাপত্যকলা, স্থানীয় অধিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও সংস্কৃতি পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে পর্যটনকে একটি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ও স্থানীয় কৃপ দিতে দরকার রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও এর প্রয়োগ। স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটনকেন্দ্রের অধিবাসীদেরও পর্যটকদের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ করা উচিত। পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দেওয়া গেলে ভ্রমণের প্রতি তাদের উৎসাহ আরো বাঢ়বে। এর ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশের মানবিক সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিচয় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল হবে।

বাংলাদেশের উৎসব

ভূমিকা: উৎসব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মধ্যে নিহিত থাকে একটি জনপদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কিংবদন্তী এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস ও ভালো-মন্দ লাগার উপাদান। কোনো দেশ বা সমাজের উৎসব সম্পর্কে জানা থাকলে সেই দেশ বা সমাজের মানুষকেও অনেকখানি জানা হয়ে যায়। উৎসব হতে পারে কোনো জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক, আবার হতে পারে জনপদ বা ভূখণ্ডকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উৎসবের প্রচলন রয়েছে। তবে অধিকাংশ উৎসবই কোনো না কোনো খাতু বা মাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এসব উৎসব মানুষের মনে কেবল আনন্দেরই সংঘার করে না বরং এর মধ্য দিয়ে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি উৎসব সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

বাংলা বর্ষবরণ: বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সর্বজনীন উৎসব বাংলা বর্ষবরণ। পুরানো দিনের দুঃখ, ব্যথা, ক্লান্তি, গ্রানি ভুলে নতুনকে বরণ করে নেওয়ার উৎসব এটি। এই উৎসব বাংলাদেশের সর্বত্র পালিত হয়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষ এই উৎসব পালন করে। এ উপলক্ষে মেলা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ব্যবসায়ীরা এই দিনে হালখাতা নামে হিসাবের নতুন খাতা খোলেন এবং বকেয়া আদায় উপলক্ষে গ্রাহকদের নিমজ্জন করে মিষ্টিমুখ করান। বৈশাখের প্রথম দিনটিতে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে সামর্থ্য অনুযায়ী মজাদার খাবারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক আড়ম্বরে উদ্যাপন করা হয় বাংলা নববর্ষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারকলা অনুষদ থেকে বের করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। নতুন বছরের সূর্যোদয়ের মুহূর্তে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বৈসাবি: বাংলাদেশে তিনটি ফুল জাতিসভার বর্ষবরণ উৎসব 'বৈসাবি'। শব্দটি বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু – এই তিন নামের আদৃশ্বর নিয়ে গঠিত। বৈসু, সাংগ্রাই ও বিজু যথাক্রমে ত্রিপুরা, মাঝমা ও চাকমাদের বর্ষবরণ উৎসব। সাধারণত বছরের শেষ দুই দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন বাস্তরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বৈসাবি উদ্যাপিত হয়।

নবাম্বু: নবাম্বু হলো নতুন ধানের উৎসব। হেমন্ত কালে ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে। এ সময়ে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পিঠা তৈরির ধূম পড়ে যায়। আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজ ছাড়িয়ে পড়ে।

একুশে ফেক্রুয়ারি: একুশে ফেক্রুয়ারি বাংলাদেশের শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির দীর্ঘ দিনের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ইতিহাস। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিহিলকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। তাদের উপর তৎকালীন সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালায়। এতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। এই আত্মত্যাগ এবং দীর্ঘ সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৫৪ সালে বাংলা পায় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি। শহিদদের স্মৃতিকে মরণ করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে পরের বছর থেকেই দিনটি উদ্যাপিত হয়ে আসছে। নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ, শহিদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে দিবসটি পালিত হয়। শহিদদের আত্মান ও প্রথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো একুশে ফেক্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে একুশে ফেক্রুয়ারি দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রাচী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আর্থিভাব ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দিনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। অফিসে, বাড়িতে, সড়কে, যানবাহনে সর্বজন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভা পায়। এদিন জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ সারা দেশের স্মৃতিসৌধগুলোতে পুস্পত্তরক অর্পণ করা হয়। একই সঙ্গে শিশুকিশোরসহ বিভিন্ন বাহিনীর কুচকাওয়াজ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্যাপিত হয়।

বিজয় দিবস: ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানি দখলদারদের বিরক্তে দীর্ঘ নয় মাস রাজক্ষয়ী যুক্তের শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিযোৱারা বিজয় অর্জন করে। দিনটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের। তাই ডিসেম্বর এলাই সমগ্র দেশ লাল-সবুজে সেজে ওঠে। ১৬ই ডিসেম্বর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ সারা দেশের স্মৃতিসৌধগুলোতে পুস্পত্তরক অর্পণ করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উৎসব, ত্রীড়া অনুষ্ঠান ও বই মেলার আয়োজন করা হয়।

বইমেলা: বইমেলা বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বইমেলা - ফেন্স্যুরি মাস জুড়ে ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা। এই বইমেলা পরিণত হয় পাঠক ও লেখকের মিলনমেলায়। বইমেলায় অনেক লেখক তাঁদের নতুন বই যেমন প্রকাশ করেন, তেমনি পূর্বে প্রকাশিত বইও মেলায় পাওয়া যায়। বইমেলা এখন আর কেবল বই কেনাবেচার মেলা নয়, এটি পরিণত হয়েছে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক উৎসবে।

ঈদ: ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব। ঈদ মানে আনন্দ, খুশি। ঈদ আসে আনন্দ আর মিলনের বার্তা নিয়ে। এই দিনে ধনী-নির্ধন ভেদাভেদ ভূলে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেয়। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে সাড়েরে ঈদ উৎসব পালিত হয়। বছরে দুটি ঈদ। প্রথমে আসে ঈদ-উল ফিতর এবং পরে ঈদ-উল আজহা। রমজান মাসের শেষে হিজরি শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে ঈদ-উল ফিতর উদ্যাপিত হয়। জিলহজ মাসের দশম দিনে পালিত হয় ঈদ-উল আজহা। ঈদ-উল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। একে বলা হয় আত্মাগ্রে ঈদ। দুটি ঈদেই মুসলমানরা নতুন পোশাক পরে, ধনীরা গরিবদের দান করে। ঈদগাহে ঈদের নামাজের আয়োজন করা হয়। নামাজের পর একে অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি করে। বাড়িতে ভালো খাবারের আয়োজন করা হয়। নিজে খেয়ে এবং অন্যকে খাইয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়।

দুর্গা পূজা: হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা। শরৎকালে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তমী অষ্টমী নবমী এই তিনি দিন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সপ্তমীর আগের দিন ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন অনুষ্ঠান হয়। নবমীর পরদিন দশমীর উৎসবকে বলা হয় বিজয়া দশমী। বোধন থেকে বিসর্জনের দিনগুলো বাঙ্গলি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকে আনন্দলিত করে। পাঢ়ায় পাঢ়ায় তৈরি হয় পূজা মণ্ডপ, থাকে প্রসাদের আয়োজন। বিভিন্ন ছানে অনুষ্ঠিত হয় মেলা। দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আনন্দ নিয়ে পূজামণ্ডপে ঘুরতে যায়। অষ্টমীর দিন আনন্দ আর জাঁকজামক থাকে বেশি। রাতে হয় আরতি। দশমীর দিন দেবী-বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানিকতা।

বৃক্ষ পূর্ণিমা: বৃক্ষ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদযাপিত হয় বলে এর অন্য নাম বৈশাখী পূর্ণিমা। এই দিনের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, তিরোধান ও বোধিলাভের শূভ্র জড়িত। প্রার্থনা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে এবং ফানুশ উড়িয়ে এই উৎসব পালন করা হয়।

বড়ো দিন: বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা পালন করে বড়ো দিন। যিনি খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে তারা এ উৎসব পালন করে। প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর বড়ো দিনের উৎসব পালিত হয়। গির্জায় প্রার্থনা করে, কেক কেটে, চকলেট বিতরণ করে, গান গেয়ে এই উৎসব পালন করা হয়।

অন্যান্য উৎসব: এছাড়া সারা বছরই বাংলাদেশে কোনো না কোনো উৎসব পালিত হয়। যেমন: রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরাল জয়ন্তী, লালন-উৎসব, মধুমেলা, মহররম, ঈদ-ই মিলাদুন নবি, সরঞ্জাম পূজা, লক্ষ্মী পূজা, প্রবারণা পূর্ণিমা, ইস্টার সানডে ইত্যাদি।

উপসংহার: মানুষের জীবনে উৎসবের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। উৎসব মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী গড়ে তোলে। আনন্দমুখের উৎসব-প্রাঙ্গণে ঘুচে যায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। উৎসব ছাড়া সকল শ্রেণির মানুষের মিলনমেলার চির কল্পনাই করা যায় না। জাতীয় উৎসবগুলো মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করে। উৎসবের মধ্যে যে মূল্যবোধের বীজ আছে তাকে জাগ্রত করতে পারলে নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন রক্ষা পাবে, তেমনি মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে প্রীতি ও সৌহার্দ্য।

জগদীশচন্দ্র বসু

ভূমিকা: যাঁদের অবদানে আধুনিক বিজ্ঞান এমন উৎকর্ষের শীর্ষে আরোহণ করেছে, তাঁদের মধ্যে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর নাম সর্বজনৈকৃত। উপমহাদেশে তিনি ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক সীকৃতি পাওয়া বিজ্ঞানী। বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ প্রযুক্তির যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, তার পিছনে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান ছিল প্রারম্ভিক। তিনিই প্রথম বিনা তারে শব্দ প্রেরণের প্রযুক্তি বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। উকিদের প্রাণ আছে, এই ধারণা আবিক্ষার করে তিনি পৃথিবীর পরিবেশবিদ্যাতেও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার অহংকার।

জন্ম ও বাল্যকাল: জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষ বাস করতেন মুঙ্গীগঞ্জ জেলার রাড়িখাল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শঙ্গবানচন্দ্র বসু। তিনি পেশায় ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জগদীশের লেখাপড়া শুরু হয় ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে। পরে কলকাতার হোয়ার স্কুলে ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৮৮০ সালে বিএ পাশ করার পর তিনি ইংল্যান্ডে যান। এরপর ক্যাম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৮৫ সালে মাত্তুমিতে ফিরে এসে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন।

অধ্যাপনা জীবন: প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর অধ্যাপনা জীবন খুব সুখের ছিল না। নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। যেমন এখানে ব্রিটিশ ও দেশীয় অধ্যাপকদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এর প্রতিবাদে তিনি এক নাগাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বেতন গ্রহণ করেননি। এখানে গবেষণার করার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ছোটো একটি কক্ষকে গবেষণাগার বানিয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি তাঁর গবেষণার কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

পদার্থবিদ্যায় অবদান: পদার্থবিদ্যায় গবেষণায় জগদীশচন্দ্র বসুর মৌলিক আবিক্ষার হলো, বিনা তারে রেডিও সংকেত পাঠানোর যন্ত্র তৈরি করা। সে সময়ে তারের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শব্দ পাঠানো যেত। ১৮৯৫ সালে তিনি প্রথমবারের মতো বিনা তারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শব্দ পাঠাতে সক্ষম হন। মাইক্রোওয়েল গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান আছে। তিনিই প্রথম বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি রেডিও সংকেতকে শনাক্তকরণের জন্য অর্ধপরিবাহী জংশন ব্যবহার করেন। এই আবিক্ষার পেটেন্ট করে বাণিজ্যিক সুবিধা নেওয়ার বাদোলাতে তিনি সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এসব অবদানের কারণে প্রযুক্তি-পেশাজীবীদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ইনসিটিউট অব ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং' তাঁকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত করেছে।

জীববিজ্ঞানে অবদান: উঙ্গিদিবিদ্যাতেও জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান অনন্য। তিনি উঙ্গিদ শারীরতত্ত্বের উপর বহু কুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। উঙ্গিদের সূক্ষ্ম নড়াচড়া শনাক্ত করা এবং বিভিন্ন উঙ্গিপকে উঙ্গিদের সাড়া দেওয়া ইত্যাদি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। আবিষ্কার করেন উঙ্গিদের বৃক্ষি রেকর্ড করার জন্য ফ্রেক্সেগ্রাফ নামক যন্ত্র। উঙ্গিপকের প্রতি উঙ্গিদের সাড়া দেওয়ার প্রকৃতি যে বৈদ্যুতিক, সেটিও তিনি প্রমাণ করেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য কৃতিত্ব: ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর উঙ্গিদ শারীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনের উপর্যুক্ত সমস্ত অর্থ তিনি এই গবেষণাগার নির্মাণ করতে ও এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে ব্যয় করেন। বাংলা ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক হিসেবেও জগদীশচন্দ্র বসুর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'অব্যক্ত'

উপসংহার: ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন। পরাধীন দেশে বাস করেও আজীবন তিনি যে মৌলিক সাধনা করেছেন, তা এখন সমস্ত বিশ্বের অহংকার। আর্থিকভাবে তিনি যথেষ্ট সাত্ত্বল ছিলেন না; তা সত্ত্বেও তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার উৎস।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ভূমিকা: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে বলা হয় বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঝুঁপুর জেলার পায়রাবন্দ থামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায়। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন বাঙালি মুসলমান সমাজ, বিশেষত নারীসমাজ শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। তখন পর্দাগ্রহণ কঠোর শাসনে নারীসমাজ ছিল অবরোধবাসিনী। রোকেয়া পিছিয়ে পড়া সমাজের এই বৃহত্তর অংশকে শিক্ষা ও কর্মের আলোয় আলোকিত করতে নিজের জীবনকে নিবেদন করেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে নারী আজ শিক্ষাদীক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে, আদালতে সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

রোকেয়ার পরিবার ও সমাজ: রোকেয়ার পারিবারিক নাম রোকেয়া খাতুন। তাঁর পিতা জহির উদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী সাবের ছিলেন একজন জমিদার। তাঁর মাতার নাম রাহতুর্রেসা সাবেরা চৌধুরানী। রোকেয়ার দুই বোন করিমুর্রেসা ও হুমায়ুরা; তাঁর বড়ো দুই ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান সাবের। পারিবারিক প্রথা অনুসারে পাঁচ বছর বয়স থেকে পর্দার কঠোরতার মধ্যে রোকেয়াকে শৈশবকাল অতিবাহিত করতে হয়। শৈশবে আরবি-ফারসি-উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও রোকেয়ার পিতা বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাহাড়া তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ঘরের বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ মেয়েদের ছিল না। কিন্তু মেধাবী রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি ছিল প্রবল অগ্রহ।

পাঁচ বছর বয়সে মাঝের সঙ্গে কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি একজন ইংরেজ মেমের কাছে কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বোনের এই বিদ্যানুরাগ দেখে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষিত ভাই ইত্রাহিম সাবের ইংরেজি শেখান রোকেয়াকে। পিতার কঠোর নজর এড়িয়ে রোকেয়া বড়ো দুই ভাই-বোনের সহযোগিতায় বাংলা-ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহী ও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বোন করিমুল্লেসার অনুপ্রেরণায় রোকেয়া বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি একইসঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করেন। ১৮৯৮ সালে বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিবাহ হয়। স্বামীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা আর. এস. হোসেন নামে পরিচিত হন। স্বামীর ঐকান্তিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় রোকেয়া পড়াশোনা ও সাহিত্যচর্চা অব্যহত রাখেন। ১৯০৯ সালে তাঁর স্বামীর জীবনাবসান ঘটে।

নারীশিক্ষা বিষ্টার: বাংলার মুসলিমান সমাজে রোকেয়া দুই ভাবে অবদান রাখেন। প্রথমত, শিক্ষাবিষ্টারে এবং দ্বিতীয়ত, সাহিত্য সৃষ্টিতে। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে রোকেয়া তাঁর স্বামীর স্মরণে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে তাঁর নারীশিক্ষা বিষ্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯১১ সালে কলকাতায় স্কুলটি ছায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রোকেয়া মুসলিমান নারীদের সামনে আধুনিক শিক্ষার দরজা খুলে দেন। স্কুলটিতে ধীরে ধীরে ছাত্রীর সংখ্যা বৃক্ষি পায়। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়। রোকেয়া বাঙালি মুসলিমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য কেবল স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেননি, ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন। মেয়েদের স্কুলে নেওয়ার জন্য পৃথক গাড়িরও ব্যবস্থা করেন তিনি। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্যে অবদান: বাংলা সাহিত্যে রোকেয়ার আনুষ্ঠানিক পদার্পণ ঘটে ১৯০২ সালে কলকাতার ‘নবপ্রভা’ পত্রিকায় ‘পিপাসা’ নামক রচনা প্রকাশের মাধ্যমে। এরপর ‘নবনূর’, ‘সওগাত’, ‘মোহাম্মদী’ প্রভৃতি সমসাময়িক পত্ৰ-পত্ৰিকায় তিনি নিয়মিত লিখতে থাকেন। তাঁর লেখনী তৎকালীন মুসলিম সমাজকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। রক্ষণশীল সমাজ তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যকে সহজভাবে মেলে নিতে পারেন। রোকেয়া তাঁর লেখায় যেমন নারীমুক্তির কথা বলেছেন, পুরুষতাত্ত্বিক সমাজের ক্রটিগুলোকে নির্দেশ করেছেন, একইভাবে নারীর মানসিক দাসত্বেরও সমালোচনা করেছেন। নারীর অলংকারকে রোকেয়া দাসত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রোকেয়া তাঁর নারীবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ‘মতিচূর’ প্রথম খণ্ড (১৯০৪) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২২)। ‘সুলতানাজ ড্রিম’ (১৯০৮) তাঁর একটি ইংরেজি রচনা যা প্রবৰ্তী কালে ‘সুলতানাজ স্পন্স’ নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) ও ‘অবরোধবাসিনী’ (১৯৩১) তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। হাস্যরস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহয়ে পুরুষতাত্ত্বিক সমাজে নারীর অসম অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর সকল রচনাই নারীশিক্ষা বিষ্টার ও সমাজ সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

নারী জাগরণের অগ্রদৃত রোকেয়া: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন একজন সমাজসচেতন, সংক্ষারমুক্ত, দুরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রগতিশীল লেখক ও সমাজকর্মী। রোকেয়া মনে করতেন, পড়তে লিখতে পারাই নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো নারীকে তার অধিকার লাভে সক্ষম করে তোলা। প্রকৃত শিক্ষা একজন নারীকে ব্যাংসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। নারীর যাতে অন্যের গলছহ হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য না হয়, সে-বিষয়ে তিনি নারীদের সচেতন করতে সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে থান। শিক্ষাছাত্রে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯১৬ সালে ‘আঙ্গুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’ বা ‘মুসলিম নারীদের সমিতি’ গড়ে তোলেন। মুসলিম নারী সমাজকে সংগঠিত করতে ‘নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি’, ‘বেগম উইমেন্স এডুকেশনাল কলফারেন্স’, ‘নারীস্তীর্থ সংস্থা’ প্রভৃতি সংগঠনে যোগ দেন এবং নারীর উন্নয়নে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। তিনি ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে শুরুধার লেখনী ধারণ করেন। নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পুরুষের বহুবিবাহ, নারীদের বাল্যবিবাহ এবং পুরুষের একত্রফা তালাক প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। রোকেয়ার এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ হয়।

উপসংহার: সমাজ ও নারী কল্যাণ সাধনে রোকেয়ার অবদান অনন্তীকার্য। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রসরতার পেছনে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু নারীকে পিছনে রেখে সমাজের সার্বিক অগ্রগতি যে সম্ভব নয়, তা রোকেয়া গভীরভাবে উপলক্ষ্মি করেছিলেন। তাই রোকেয়ার সংগ্রাম ছিল পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা।

লঘুও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

ধান, নদী ও খালের জন্য বিখ্যাত বরিশাল। সেই বরিশালে যাওয়ার একটি সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাও আবার লঘুও! ছোটো খালার শুভ্রবাঢ়ি বরিশালে। গত মাসে যখন তাঁরা সপরিবার সেখানে যাচ্ছিলেন, আমাকেও যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করলেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। কারণ, বাসে, ট্রেনে, এমনকি নৌকায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে; কিন্তু লঘুও ভ্রমণের সুযোগ হয়নি। খালাতো ভাই রাজীবের মুখে লঘুও ভ্রমণের মজার মজার অনেক কথা শুনেছি। তাই আমি রাজি হতে মোটেও দেরি করিনি।

সক্ষ্য সাড়ে ছয়টায় আমরা সদরঘাটে পৌছলাম। ঘাটের টিকিট কিনে প্রবেশ করলাম জেটিতে। দেখলাম প্রকাণ্ড সব লঘুও জেটির সঙ্গে বাঁধা। প্রত্যেক অধ্যলের লঘুও আলাদা আলাদা করে রাখা। কর্মচারীরা নিজ নিজ লঘুও ওঠার জন্য যাত্রীদের জোর গলায় ডেকে চলেছে। জেটিতে প্রচুর মানুষ। নানা গন্তব্যের যাত্রীরা নিজেদের লঘুওটি খুঁজে নিচ্ছে। কেউ একা, কারো সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা। হকাররা তাদের পণ্য সাজিয়ে যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। হকাররা শুধু জেটিতেই নয়, নৌকায় করেও বিক্রি করছে তাদের জিনিসপত্র। নদীর ওপার থেকে ছোটো ছোটো নৌকায় যাত্রীরা এপারে আসছে।

প্রত্যেকটি লঘুই উজ্জ্বল আলোয় সজ্জিত। আমরা বড়ে একটি লঘুও উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নির্ধারিত ছানে ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস রাখলাম। লঘুটি ৪ তলাবিশিষ্ট। জিভেস করে জানতে পারলাম এর

দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ মিটার। বেশ কৌতুহল নিয়ে লক্ষণটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দোতলা ও তিন তলায় সারবাংধা বিলাসবহুল কক্ষ। নিচতলার পুরোটাই ডেক। নিচতলার ডেকের মেঝেতে যাত্রীরা চাদর বিছিয়ে নিজের শোয়ার ব্যবস্থা করছে। লক্ষের পিছন দিকে ইঞ্জিনরঞ্চ, রেন্ডেরাঁ ও একটি চায়ের দোকান। জানা গেল জরুরি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা ও রাখা হয়েছে। আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উহুল দিচ্ছে আনসার সদস্যরা।

রাত ৯টার দিকে লক্ষণ বরিশালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যদিও লক্ষণ ছাড়ার সময় ছিল সাড়ে আটটা। ধীরে ধীরে জেটির মানুষগুলো ছোটো হতে হতে কাপসা হয়ে গেল। আমরা ঘাট থেকে অনেক দূরে চলে এলাম। লক্ষের সারেং একটু পরপর সাইরেন বাজাচ্ছেন আর সার্চলাইট ফেলে পথটা দেখে নিচ্ছেন। অনেকক্ষণ চলার পর একটি বড়ো নদী দেখতে পেলাম। তীর দেখা যায় না। নদীটির নাম শুনলাম মেঘনা। এটি বাংলাদেশের গভীরতম ও প্রশংসন্তম নদী। রেলিং ধরে দাঁড়ালে যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোটো ছোটো নদী। আলোকবিন্দু চোখে পড়ে। খালা জানালেন ওগুলো মাছবরা নৌকা। নৌকাগুলো দেখে ‘পঞ্চানন্দীর মাঝি’ উপন্যাসের কথা মনে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরপর একটি দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভটভট আওয়াজ তুলে উল্টো দিকে যাচ্ছে কিংবা আমাদের লক্ষণ সেগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশের তারকারাজি আর নদীতে ভেসে থাকা আলোকবিন্দুগুলো অপরূপ দৃশ্য তৈরি করেছে। একসময় রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। লক্ষে রান্না করে ইলিশ মাছ ভাজা আর ভাল দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। খাওয়া শেষে বসলাম কেবিনের সামনে চেয়ারে। সবাই মিলে রাতের নৌর সৌন্দর্য উপভোগ করছি আর গল্প করছি।

ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। যাত্রীদের কেউ কেউ শয়ে পড়েছে আবার কেউ কেউ আড়ডা দিচ্ছে। ডেকে হকার তেমন দেখা যাচ্ছিল না। খালামণি বরিশালের বিখ্যাত ব্যক্তিদের গন্ত শোনাচ্ছেন। রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী অধিবীকুমার দত্ত, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, বীরশ্বেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, দার্শনিক আরজ আলী মাতুকর, ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের রচয়িতা বিজয় গুপ্ত, কুসুমকুমারী দাশ ও তাঁর পুত্র জীবনানন্দ দাশ, সুফিয়া কামাল, কামিনী রায়, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গানের রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং গানটির সুরকার আলতাফ মাহমুদসহ আরো অনেকের কথা জানলাম যারা এই বরিশালেরই মানুষ। প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের শহরে যাচ্ছি ভেবে রোমান্স অনুভব করলাম। হঠাৎ নৌপুলিশের একটি পিপড়বোট গতি কমিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অবৈধ মালামাল পরিবহণ রোধে এই অঙ্ককার রাতেও তারা উহুল দিচ্ছে। দূরে আরো কয়েকটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সারেং মাঝে মাঝে সাইরেন বাজাচ্ছে। একটু পরপরই সার্চলাইট ফেলে পথ দেখে নিচ্ছে। সারেঙের কক্ষে গিয়ে দেখলাম কত রকমের প্রযুক্তি তারা ব্যবহার করছে – রাডার, কম্পাস, জিপিএস ইত্যাদি।

হয়তো প্রথমবার লক্ষণ চড়াই বলে উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না। তবুও খালামণির কথায় শয়ে পড়লাম। তোর পাঁচটার দিকে খালামণি ডেকে তুললেন – ‘এই তোরা ওঠ! আমরা বরিশালে পৌছে গিয়েছি।’ ছড়মুড় করে উঠে পড়লাম। দেখলাম ঘাটে আরো কয়েকটি লক্ষণ বাঁধা। যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। ভিড় কমলে আমরাও ব্যাগগুলো নিয়ে নেমে পড়লাম। গত রাতটি আমার জীবনের স্মরণীয় একটি রাত হয়ে থাকবে। অসাধারণ একটি ভ্রমণের ভালো-লাগা নিয়ে আমরা পা ফেললাম জীবনানন্দের শহরে।

একটি বাড়ের রাত

বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ বিচ্ছি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এসব অভিজ্ঞতার কোনোটি আনন্দদায়ক, কোনোটি রোমাঞ্চকর আবার কোনোটি প্রচঙ্গ ভয়ের। যে ঘটনাগুলো মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়, আহত করে বা ভীতিবিহীন করে, মানুষ তা সহজে ভোলে না। একটি বাড়ের রাত তেমনই আমার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আমি যখনই সে-রাতের কথা ভাবি, ভয়ে শিউরে উঠি। অঙ্ককার রাত, ঝোড়ো বাতাসের গর্জন, সঙ্গে মুহূর্লারায় বৃষ্টি, হড়মুড় করে চালা ঘৰগুলোর ভেঙে পড়ার শব্দ, ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ – সবকিছু আমার মনে ছবির মতো ভেসে ওঠে।

সকাল থেকেই দীশান কোণে মেঘ জমছিল। কালো কালো পুঁজীভূত মেঘে দুপুরের পরই দিনের আলো হারিয়ে গেল। বাতাসও যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। বেতার ও টেলিভিশনে বারবার বিপদ সংকেত জানানো হচ্ছে। ছানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা সবাইকে নিরাপদ হানে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশনা দিচ্ছে। তা শব্দে মানুষও দলে দলে আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে। আমাদের পাকা দেয়ালে টিনের চালার বাড়ি। তাই বাবা বললেন, এখানে আমরা নিরাপদে থাকবো।

সন্ধ্যা হতে হতে প্রকৃতি এক অপরিচিত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে আগেভাগেই বাড়ি ফেরে। মাখিরা নিরাপদ হানে নৌকা বাঁধে। নদীর ধারে দেখা গেল বেশ কয়েকজন নারী চৱম উৎকর্ষ নিয়ে তাকিয়ে আছে অস্পষ্ট জেলে-নৌকাগুলোর দিকে। প্রিয়জনের জন্য কাতর অপেক্ষা, পাখিদের ব্যস্ত হয়ে নৌড়ে ফেরা, হাটুরেদের আতঙ্কিত পদক্ষেপ, থেকে থেকে গবাদি পশুর আর্তনাদ যেন আসন্ন বিপদের আভাস দিচ্ছিল। অল্পক্ষণেই অঙ্ককারের চাদরে চারপাশটা ঢেকে গেল। বিদ্যুৎ চমকে আভিনা থেকে দিগন্ত পর্যন্ত যেটুকু চোখে পড়ে, তার সবটাই আমার কাছে ভৃতৃত্বে লাগছিল।

সন্ধ্যার পর থেকে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। তা বাড়ো বৃষ্টিতে রূপ নিতে সময় নিল না। দানবীয় শক্তি নিয়ে বড় আছড়ে পড়ল আমাদের লোকালয়ে। আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বাবা-মার গা-য়ে বসে আছি। হারিকেনের আবছা আলোয় পরিবেশটা আরো থমথমে। এর মধ্যে বাড়েবৃষ্টির একটানা শব্দে কানে তালা লাগার মতো অবস্থা। বাবা বললেন, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চাল জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে বৃষ্টির পানি পড়তে আরম্ভ হলো। মনে হলো যে-কোনো সময়ে পুরো চালাটি আমাদের মাথার উপরে থাকে পড়বে। বাবা আমাদের নিয়ে একটি মজবুত খাটের নিচে অবস্থান নিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পায়ের নিচে পানির প্রবাহ টের পেলাম। বুবলাম দরজার নিচ দিয়ে ঘরে একটু একটু করে পানি চুকচে। তখনও পর্যন্ত বাবা খাটের নিচে থাকা নিরাপদ মনে করলেন। পাশের বাড়ি থেকে নারী-পুরুষের আর্তিত্বকার শোনা যাচ্ছিল। বাবা চিংকার করে তাদেরকে আমাদের ঘরে আসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই বিকট শব্দে কিছু একটা আছড়ে পড়লো বাড়ির একপাশে। বাতাসের প্রবল তোড়ে উড়ে গেল পিছনের বারান্দার চাল।

অল্পক্ষণ পরে প্রতিবেশীদের কয়েকজন কাকভেজা হয়ে হৃড়মুড় করে আমাদের ঘরে ঢুকল। তাদের একজনের মাথায় আঘাত লেগেছে। বাবা দেরি না করে কী একটা ওষুধ মেখে লোকটির মাথা গামছা দিয়ে বেঁধে দিলেন। তাকে ধরে একটি নিরাপদ জায়গায় বসালেন। শুনলাম একটা প্রকাণ্ড শিখুল গাছ উপড়ে গিয়ে তাদের ঘরের উপর পড়েছে। তারাই বললো, আমাদের গোয়ালঘরের চাল নাকি উড়ে গিয়েছে। গুরুগুলোর কথা ভেবে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল।

এক সময়ে বাতাসের বেগ খানিকটা কমে আসে। তখনও থেকে থেকে ভয়ানক শব্দে বাজ পড়েছে। বাবা-মা আমাকে শুকনো কাপড় বের করে দিলেন। প্রতিবেশীদের জন্যও কাপড়, কিছু শুকনো খাবার ও পানির ব্যবহা করে তাদেরকে মোটামুটি স্বাভাবিক করলেন। বাবা আহত লোকটিকে বারবার পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সে আগের চেয়ে ভালো বোধ করছে। আরো কিছুক্ষণ পর বাড় পুরোপুরি থেমে গেল। তবে সমস্ত রাতই আমরা বসে কাটালাম।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাবা দরজা-জানালা খুলে দিলেন। আমি বাইরে বেরিয়ে যা দেখলাম, এক কথায় তা অবিশ্বাস্য। বেশ কয়েকটি বড়ো গাছ উপড়ে পড়েছে। এখানে-সেখানে মৃত ও আহত পাখি পড়ে আছে। আমাদের ঘরের দুটি বারান্দার চাল উড়ে গেছে। অন্য একটি বাড়ির ঘরের চাল উড়ে এসে পড়েছে আমাদের উঠানে। গোয়ালঘরে ছুটে গিয়ে দেখি, এর চালা নেই – একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছড়ে পড়েছে সেখানে। আমাদের চারটি গরুর একটি বড়ো রকমের আঘাত পেয়েছে। কয়েক বাড়ি পরে কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গিয়ে দেখি, বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। রাঙ্গাঘাটের যে অবস্থা, তাতে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌছানোই কঠিন ব্যাপার। বাবা এবং আরো কয়েকজন যুবক মিলে একটি মাচা বানিয়ে লোকটিকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটলেন। আমি মাকে সাহায্য করতে গেলাম। মনে মনে বন্ধুদের কথা ভাবছি আর অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠছি।

সেদিনের রাতে বাড়ের যে দানবীয় তাওব দেখলাম, তা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। বাড় যেন তার প্রকাণ্ড গ্রাসে সবকিছু নিঃশেষ করতেই এসেছিল। ঘর, আঙিনা, বনবাদাড়, নদীর বাঁধ, মেঠো ও পাকা পথ – সর্বত্রই ধ্বংসলীলার ক্ষত। ওই রাতের পরে গ্রামবাসীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। আর মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে সহজ লেগেছিল আরো বেশি।

কৃষি উদ্যোগাত্মক

ভূমিকা: অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং জনবল কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত উপার্জনের প্রত্যাশায় যখন কোনো কাজ করার পরিকল্পনা করে, তখন তাকে উদ্যোগ বলে। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের বলে উদ্যোগাৎ। প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোগাৎ হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোগাৎ আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। বিপুল জনসংখ্যা, কৃষিজমির পরিমাণ হাস, বেকারতু - এ সবকিছুর ভিতরে একদল তরুণ কৃষিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছেন। শিক্ষিত তরুণদের কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক ও কৃষি উদ্যোগাৎ: কৃষক ও কৃষি উদ্যোগাৎ মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কৃষক তাঁর পণ্য বাজারে বিক্রির চেয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোকে বেশি গুরুত্ব দেন অথবা কিছুটা বিক্রির জন্য এবং কিছুটা পরিবারের চাহিদা মেটাতে ব্যয় করেন। অন্যদিকে, একজন কৃষি উদ্যোগাৎ মূল লক্ষ্য বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোগাৎকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির হতে হয় এবং তার কাজে প্রচুর ঝুঁকি থাকে।

কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রসমূহ: শস্য, প্রাণীসম্পদসহ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়কে কৃষি উদ্যোগের আওতায় আনা সম্ভব। তবে এফেতে উদ্যোগাত্মকে অবশ্যই মূলধন, জমির পরিমাণ, মাটির গুণাগুণ, অবকাঠামো, বালাই ব্যবহারণা, লোকবল, পরিবহণ ব্যবস্থা, বাজার ও চাহিদা, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ধান, গম, ডাল, আখ, পাট, ঘাস, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা, মধু, মাশরূম, রেশম, মাছ প্রভৃতির চাষ ও উৎপাদন; গুরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণীসম্পদের লালন-পালন; গাছের চারা, জৈব সার, বায়োগ্যাস, দুধ ও দুধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কৃষি উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

কৃষি উদ্যোগাৎ করণীয়: একজন কৃষি উদ্যোগাত্মকে নিম্নোক্ত করণীয় সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত:

- ক. উদ্যোগাত্মকে প্রথমেই তার পণ্যের বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে।
- খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গ. একজন কৃষি উদ্যোগাত্মকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারণ, তাঁর এই উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।
- ঘ. কৃষিখাতে উদ্যোগাত্মকে অনেক রকমের ঝুঁকি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।

- ঙ. উদ্যোক্তা যে ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের নিয়মিত খোজ-খবর রাখা জরুরি। উপর্যুক্ত খাবার, সার, কৌটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সম্প্রতি মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার উদ্যোক্তাদের সাফল্যে ভূমিকা রাখছে।
- চ. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এতে বড়ো ধরনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে অংশীদার নির্বাচন করা উচিত।
- ছ. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রমিক ও পণ্য পরিবহণ, বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের কথা চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ: কৃষির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন:

- ক. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষির ধরন অনুযায়ী স্বল্প সুদে বিভিন্ন অক্ষের খণ্ড প্রদান করছে।
- খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
- গ. বছরব্যাপী চাষ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল শস্য ক্যালেন্ডার' ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' দেওয়া আছে, যা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল ফলাতে সাহায্য করে। ১৬১২৩ নম্বরে ফেন করে কৃষিসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানাতে 'কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিদ্ব্যাদির বাজারদর, কৃষকপ্রাণ বাজারদর, সাক্ষাত্কৃত ও পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ করে।

উপসংহার: একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সতর্ক সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য চূড়ান্ত বিচারে খাবারের চাহিদা মেটাবে।

ভাষা আন্দোলন

ভূমিকা: ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন, যা চড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জবাব, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীর আতাদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল আরো আগে, অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত বিচারে ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্নয়ন ঘটে, অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিল করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। এটি একইসঙ্গে ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের বীজমুক্তি।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়: ১৯৪৭ সালে ইঞ্জাতিতভ্রের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উন্নত হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ – পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা) ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকার সংজ্ঞান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠে তমদুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এর কিছু দিন পরে ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিলাহ ঢাকায় এক ভাষণে ঘোষণা করেন: ‘উদুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্তে ‘না, না’ বলে চিৎকার করে ওঠে। তাঙ্কমিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদে তারা বলে, উর্দু নয় বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যেও গভীর ক্ষেত্রের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার সম-মর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে।

ভাষা আন্দোলনের ছিতীয় পর্যায়: ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাজা নাজিমুল্লিন আবারও উদ্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষেপে ফেটে পড়ে। ২৯শে জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরে প্রতিবাদী মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সমিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে দিনটিতে ঢাকা শহরে সকল প্রকার মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষেপ মিছিল শুরু করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি: ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের ফুল-কলেজের হাজার হাজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অঙ্গ হাতে সভাহলের চারদিক ধিরে রাখে। বেলা সোয়া এগারোটাৰ দিকে ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জনান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ হেফতার করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আরো অনেক ছাত্রকে হেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ফুক্স ছাত্ররা বিক্ষেপ মিছিল বের করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অভিহাতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত, জবরাসহ আরো অনেকে। শহিদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী আন্দোলন: ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আওন দাউ দাউ করে জুলে ওঠে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রা সহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। শহিদদের সৃতিকে অস্তুন করে রাখতে ওইদিন বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্ররা নির্মাণ করে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন বাইশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুন্দীন।

ভাষা আন্দোলনের অর্জন: ১৯৫২ সালের একুশে ফেক্রয়ারির আন্দোলন ভাষাকেন্দ্রিক হলেও তা পুরো বাঙালি জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। একুশের চেতনাকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহর ছিল ২১ দফা সংবলিত। ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৫৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেক্সো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেক্রয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলন-ভিত্তিক সাহিত্য: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন গতি লাভ করে। রচিত হয় ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক অনেক কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেক্রয়ারি' প্রকাশিত হয়। একই বছর মুনীর চৌধুরী কারাগারে বসে 'কবর' নাটক রচনা করেন। আবদুল গাফফার চৌধুরী লেখেন গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেক্রয়ারি'। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী; শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দৃষ্টিখনী বর্ণমালা'; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন 'মাগো, ওরা বলে' কবিতা। জহির রায়হান একুশেকে নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস 'আরেক ফালুন' (১৯৬৯)। এছাড়া ওই সময়পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্য চর্চার অন্যতম অনুপ্রোপণ।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এই যে, বাঙালি জাতি তার জাতীয়তাবোধ ও অধিকার সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। ভাষার প্রশ়্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবন্ধ হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠে একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরপর যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল সূচৃতি। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং ১৯৬৯-র গণঅভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখনও সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপসংহার: একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতিসন্তার পরিচয় নির্দেশক দিন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বীর ভাষা-শহিদদের অবদান জাতি শুদ্ধাভরে মরণ করে। তবে তাদের আত্মান তখনই সার্থক হবে, যখন বাংলাদেশের সর্বত্ত্বে বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা: মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ও রক্তাক্ত অধ্যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ। স্বাধীনতা হলো একটি জাতির আজগ্য লালিত স্বপ্ন। স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার মধ্যে যেমন গৌরব থাকে, তেমনি পরাধীনতায় থাকে গ্লানি। আর তাই পরাধীন হয়ে কেউ বাঁচতে চায় না। দাসত্বের শৃঙ্খলে কেউ বাঁধা পড়তে চায় না। বাঙালি জাতি ও চায়নি বছরের পর বছর ধরে শাসনে-শোষণে পাকিস্তানিদের দাস হয়ে থাকতে। তাই তারা শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিল আন্দোলনে, সোচ্চার হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পেয়েছিল তাদের ঘন্টের স্বাধীনতা।

পটভূমি: ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে জল্য নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুইটি পৃথক রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল দুটি অংশ – পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিয়া কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে সমান মর্যাদা দেয়নি। বরং সব সময় চেয়েছে পূর্ব পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখতে। পশ্চিম পাকিস্তান সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে জর্জিরিত করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানকে। শিল্প কারখানার কাঁচামালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান নির্ভর করতো পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। শ্রমিকদের অল্প বেতন দিয়ে উৎপাদনের কাজ করাতো। রাজস্ব থেকে আয়, রঙ্গানি আয় প্রতিতির সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লয়নে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় যেখানে ৯৫% ব্যয় হতো, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় ব্যয় হতো মাত্র ৫ শতাংশ। আবার, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরুদ্ধশৰ্বতে জয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কোনোভাবেই বাঙালিদের হাতে শাসনভার তুলে দিতে চায়নি। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, অবকাঠামোগত উল্লয়নে অবহেলা, মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপসহ সকল প্রকার বৈষম্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জোরালো করে তোলে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্নেষ ও বিকাশ: বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের উন্নেষ পূর্ব থেকে হলেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তা জোরালো হয়। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিলাহ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের একশে ফেব্রুয়ারি। ওই দিন ভাষার দাবিতে রাজপথে শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জবরাসহ অনেকে। ভাষা ও সংস্কৃতির উপর শাসকগোষ্ঠীর আঘাত ছিল বাঙালির কাছে তাদের অস্তিত্বের মূলে আঘাতস্থরূপ। একদিকে বাঙালিরা যেমন সংকটের প্রকৃতি ও গভীরতা বুঝতে পারে, অন্যদিকে তা মোকাবেলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৫৪-র নির্বাচনে মুজিবন্টের জয়লাভ, ১৯৬২-র গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬-র বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি, ১৯৬৯-র গণঅভূত্বান, ১৯৭০-র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় – এই প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটে এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত স্থীরূপ লাভ করে।

অপারেশন সার্টলাইট: ইতিহাসের ঘৃণিত গণহত্যা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের 'অপারেশন সার্টলাইট'। ওইদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় এবং ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন ছালে হামলা চালিয়ে হত্যা করে অসংখ্য নিরক্ষ বাঙালিকে। পরদিন থেকেই শুরু হয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম।

মুজিবনগর সরকার গঠন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এই দিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত সরকার ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের অস্ত্রকাননে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের অচ্ছায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। তখন থেকে এই জায়গার নতুন নাম হয় মুজিবনগর। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ চলতে থাকে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক পদক্ষেপ ছিল মুজিবনগর সরকার গঠন। এই সরকারের নেতৃত্বে নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন আদায়ে এই সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সশন্ত মুক্তিযুদ্ধ ও জনযুদ্ধ: ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরক্ষ জনগণের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাংলি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা সদস্যরা সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঢ়ায়। বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাংলিরা ছাড় দেয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহিদ হন। মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঝগ কোনো দিন শোধ হওয়ার নয়। জাতি চিরকাল মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠসন্তান হিসেবে মনে রাখবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বত্তরের বাংলি অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তাই এ যুদ্ধকে বলা হয় গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, সাংস্কৃতিক কর্মসূহ সর্বত্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে। জীবনের মাঝা ত্যাগ করে দেশকে শক্তিমূল্য করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য পুরো দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। তরা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় মিত্রবাহিনী যুক্ত হয়ে যৌথভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে। যুদ্ধে পর্যন্ত হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে জেনারেল নিয়াজী আজাসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় হয়।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী সক্রিয় ছিল কখনও সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনোৱা যুদ্ধক্ষেত্রের আড়ালে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা অসংখ্য।

অজানা-অচেনা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেবা-শুক্ষম্য করেছেন বহু নারী। চরম দুঃসময়ে পাকিস্তানি হানাদারের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। অনেক সময়ে পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের কাছে নারীর মান-মর্যাদা হারাতে হয়েছে এবং প্রাণও দিতে হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের এই সাহসী ও অঞ্চলী ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি ব্রহ্মপুর তাঁরা অনেকে রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলিদের অবদান: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলিরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে ছুটে গিয়েছেন। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। একেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাংলিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-বৃক্ষজীবীদের ভূমিকা: যুদ্ধের সময়ে দেশপ্রেম জগতকরণ, মনোবল বৃদ্ধিসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে মানুষকে উদ্বৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বৃক্ষজীবীদের ভূমিকা ও অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পত্রপত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাভিবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, আবৃত্তি, নাটক, কথিকা, জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চৱমপত্র' ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের বর্বরাচিত হত্যাকাণ্ডের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে দাঁড়ায়। ভারত সে সময়ে এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দেয়। তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের বিরোধিতা করলেও সে দেশের জনগণ, বৃক্ষজীবী ও রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গানের দল বিটলস-এর জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রাবিশঙ্কর 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর আয়োজন করেছিলেন। ফরাসি সাহিত্যিক আদ্বৈ মালরো, জঁ পল সার্টে-সহ অনেকেই তখন বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

উপসংহার: মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির অহংকার। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এনে দেয়। এই স্বাধীনতা ত্রিশ লক্ষ বীর শহিদের আত্মাগের বিনিময়ে অর্জিত, লক্ষ মা-বোনের সন্ত্রমের বিনিময়ে পাওয়া। তাই এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের নিরবেদিতপ্যাণ হওয়া উচিত। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো যেমন জরুরি, তেমনি নাগরিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে কর্তব্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের যথোর্থ অহংকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

সময়ানুবর্তিতা

ভূমিকা: ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করাই সময়ানুবর্তিতা। জীবনে সকলতা বয়ে আনার জন্য যেসব গুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে সময়ানুবর্তিতা একটি। মানবজীবনের সকল অনুষঙ্গ সময় দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। অনন্তের দিকে প্রবহমান সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোকেই সময়ানুবর্তিতা বলে। একবার সময়ের সম্বৃদ্ধার করতে না পারলে, পুনরায় আর তা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই সময়কে গুরুত্ব দিয়ে নিজ নিজ জীবন গঠনে সকলকে ঐকান্তিক হতে হয়। সময়ের কাজ সময়ে করলে জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়।

সময়ের বৈশিষ্ট্য: প্রবহমানতা সময়ের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান তথ্য গতিময়। একই জলপ্রবাহে যেমন দুইবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনি একই সময়কে দুইবার পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না। নদীর জলপ্রবাহ ভাটির টালে চলে গেলেও আবার জোয়ারে ফিরে আসে। কিন্তু অতিবাহিত সময় আর ফিরে আসে না।

সঠিক সময়ে উপযুক্ত কাজটি না করতে পারলে, অসময়ে শাতচেষ্টায়ও তা সার্থকভাবে করা যায় না। কথায় আছে, ‘সময়ের এক ফোঁড় আর অসময়ের দশ ফোঁড়’।

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব: মহাকালের হিসেবে মানবজীবন অতি ক্ষুদ্র। এই স্থলায় জীবনের প্রতিটি মৃত্যুই মূল্যবান। কেননা মহাকালের বিচারে মানুষ যে সময় পায়, তা অতি নগণ্য। তাই জীবনের প্রতিটি মৃত্যুরে সর্বোন্ম ব্যবহারে কাজ করা উচিত। যে ব্যক্তি সময়কে গুরুত্ব দিয়ে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করে, সে কোনো ধরনের বিড়ম্বনায় পড়ে না। এক জীবনে মানুষ যে পরিমাণ কাজ করতে পারে, তার একটি সীমা আছে। তাই কোনো কাজ ফেলে না রেখে যথাসময়ে তা সম্পন্ন করা উচিত।

সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি: একজন সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রতিভাব স্থানের রাখতে পারেন। সময়ানুবর্তিতা মানুষকে কাজের গুরুত্ব শেখায়। বিবেচক ব্যক্তি সময়ের গুরুত্ব বোঝেন; তাই তিনি সময়ের সম্বৃদ্ধার করতে পারেন। যে সকল দার্শনিক, বিজ্ঞানী, লেখক ও শিল্পী পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছেন, ধারণা করা যায়, তাদের আরো অনেক গুণের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা একটি।

ছাত্রজীবনে সময়ানুবর্তিতা: একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে, তার অনেকখানি নির্ভর করে ছাত্রজীবনের উপর। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ ফসলের বীজ বগনের কাল। এ সময়ে সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পড়াশোনা, খেলাখুলাসহ যাবতীয় কাজ গুরুত্ব অনুযায়ী সময় মতো করার অভ্যাস ছাত্রজীবনেই গড়ে তুলতে হয়। সময়ের সম্বৃদ্ধার যে করতে জানে না, সে কোনো কিছুতে কৃতকার্য হয় না। ব্যর্থতা তার পিছু ছাড়ে না।

জাতীয় জীবনে সময়ের মূল্য: জাতীয় জীবনে সময়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারকে প্রতি বছর জুন মাসে পরবর্তী বছরের করণীয় ঠিক করে বাজেট ঘোষণা করতে হয়। এই বাজেটে উল্লিখিত কর্মসূচি ও প্রকল্প যথাসময়ে শেষ করতে না পারলে সরকারকে চাপের মধ্যে পড়তে হয়। আবার যাবতীয় অঙ্গীকার যথাসময়ে শেষ করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের সুনাম হয়। আসলে একটি দেশের মানুষ সময় সম্পর্কে কতটা সচেতন, এর উপর নির্ভর করে সে দেশের অগ্রগতি। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি সময়নিষ্ঠ, সে জাতি তত বেশি উন্নত। আবার পরিশ্রমী হতে হলেও সময়নিষ্ঠ হওয়া দরকার।

সময়কে কাজে লাগানোর উপায়: কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখলে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত, লক্ষ্য স্থির করা। লক্ষ্যহীন মানুষ সময়ের অপচয় করে। দ্বিতীয়ত, করণীয়গুলোকে প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ করা এবং ত্রামাদ্বয়ে সম্পর্ক করা। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে কাজটি সবচেয়ে জরুরি, সেই কাজটিই করা উচিত। তৃতীয়ত, প্রতিটি কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারণ করা। এতে সময়ের অপচয় করার প্রবণতা কমে যায়। চতুর্থত, কী পরিমাণ সময় হাতে আছে, তা বুঝে কাজ করা। পঞ্চমত, আলস্য ও উদাসীনতা পরিহার করা।

সময়ানুবর্তিতা ও সাফল্য: যে ব্যক্তি সময়কে মূল্যায়ন করতে জানে না, সে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে না। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পৌঁছাতে চাইলে সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে। পৃথিবীর সকল সফল মানুষের সাফল্যের রহস্য সময়ানুবর্তিতা। কোনো মানুষই গুণের আধার হয়ে জন্ম নেয় না। ত্রামাগত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। শৈশব থেকেই সময়ানুবর্তিতার চৰ্চা করা উচিত। সময়ের মূল্য বোঝাতে গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখেছেন –

আজ করব না করব কালি
এই ভাবে দিন গেল খালি।
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি ঢায়।
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়।

উপসংহার: জীবন ছোটো, কিন্তু কাজের পরিধি ব্যাপক। তাই কম সময়ের মধ্যে মানুষকে নিজের চৃড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করতে হলে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে কৃষক যথাসময়ে বীজ বপন করে না, সে কেমন করে পাকা ফসল ঘরে তুলবে? যে ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা করে না, সে কী করে কৃতকার্য হবে? কাজেই একথা মানতেই হবে যে, সময়কে অবহেলা করা ঠিক নয়। বরং উপযুক্ত পরিশ্রম ও সময়ানুবর্তিতা মেনে চললে জীবনের চলার পথ সুগম হবে, তা নির্দিষ্যায় বলা যায়।

ক্রিকেটে বাংলাদেশ

ভূমিকা: ইংল্যান্ডের সীমা পেরিয়ে ক্রিকেট বহু আগেই বিশ্বের একটি জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনার শেষ নেই। দেশের সর্বাত্মক ক্রিকেট এখন জনপ্রিয় খেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি মর্যাদাপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে।

বাংলাদেশে ক্রিকেট: উপমহাদেশে ক্রিকেটের আগমন হয় ইংরেজদের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক কালে। তখন ক্রিকেট ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ১৯৪৭-এর পর থেকে ঢাকা অঞ্চলেও ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুনভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড' (বিসিবি), বর্তমানে যা 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড' (বিসিবি) নামে পরিচিত।

বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ: বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থার সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয় বাংলাদেশ। ১৯৮৬ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে। এরপর ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয় এবং ফাইনালে কেনিয়াকে হারিয়ে জয়লাভ করে। জয়ের আনন্দ সমস্ত বাংলাদেশকে ছুঁয়ে যায়। কারণ, এই জয় বাংলাদেশের জন্য আরেকটি প্রাপ্তি এনে দেয় – বাংলাদেশের জাতীয় দল বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

বাংলাদেশ দল ১৯৯৮ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে কেনিয়াকে হারিয়ে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে জয়লাভ করে। দীরে দীরে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। ২০০৫ সালে ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়েকে ৩-২ ম্যাচে হারিয়ে সিরিজ জয়লাভ করে। ২০১০ সালে নিউজিল্যান্ডকে ৪-০ ম্যাচে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করে। ২০১৫ সালে ভারতের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে, পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় করে। এই অভূতপূর্ব বিজয়ে বিশ্ব একটি নতুন ক্রিকেট পরামর্শিক আবির্ভাব লক্ষ করে। বাংলাদেশ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় বিশ্বের প্রতিটি ক্রিকেট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে জয়লাভ করেছে।

আইসিসি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ: ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ৬টি আসরে অংশ নেয়। আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নেয় দলটি। প্রথম বিশ্বকাপেই ফটল্যান্ড ও পাকিস্তানকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করে বাংলাদেশ দল। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে সেরা আট-এ এবং ২০১৫ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে আশানুরূপ ফল না পেলেও এই খেলায় বড়ো বড়ো দলকে হারিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ দল নিজেদের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়।

টেস্ট খেলার মর্যাদা অর্জন: বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টেস্ট খেলুড়ে দলের মর্যাদা লাভ করে ২০০০ সালে। ওই বছর ১৩ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিযান হয় বাংলাদেশ দলের। অভিযানে টেস্টেই আমিনুল ইসলাম বুলবুল ১৪৫ রান করেন, আর নাইমুর রহমান দুর্জয় পান ৬ উইকেট। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে হেরে যায় বাংলাদেশ। পরের বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিযানে টেস্টে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সেখুরি করেন মোহাম্মদ আশরাফুল। ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে গ্রথম টেস্টে জয় পায় বাংলাদেশ।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশ: ২০০৫ সালে ৫০ ওভারের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও পাঁচ দিনের টেস্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয় ২০ ওভারের খেলা টি-টোয়েন্টি। এতে একটি দল সর্বোচ্চ ২০ ওভার ব্যাট করতে পারে। বাংলাদেশ ২০০৬ সাল থেকে টি-টোয়েন্টি খেলে আসছে।

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট: ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই ঢাকা ও চট্টগ্রামে ক্রিকেট লিগ শুরু হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চালু হয়। এ সময় থেকে জেলা পর্যায়েও ক্রিকেট লিগ চলতে থাকে। ১৯৯৯ সালে দেশে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা চালু হয়। তবে ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যাত্রা করে, যা বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে একটি চমৎকার সংযোজন। ঘরোয়া ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা নতুন খেলোয়াড় তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ: একাধিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে সুনাম অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ টেস্ট খেলার যোগ্যতা অর্জনের আগেই আইসিসি নকআউট বিশ্বকাপ ১৯৯৮ আয়োজনের দায়িত্ব পায়। ২০১১ সালে বিশ্বকাপের দশম আসরের অন্যতম আয়োজকের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের ভার পড়ে বাংলাদেশের উপর। বাংলাদেশের সরকার, জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ক্রিকেট-বিশ্বে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জ্ঞান বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় থান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়াম ও জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, বগুড়ার শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম, খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, সিলেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেট অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আরো কিছু স্টেডিয়াম রয়েছে।

বাংলাদেশে ক্রিকেটের প্রভাব: পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ক্রিকেট নিয়ে ব্যাপক উদ্বৃত্তি বিরাজ করে। ক্রিকেট মানুষের দেশপ্রেমকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই যখনই বাংলাদেশ দল অন্য কোনো দলের বিপক্ষে খেলতে নামে, সমস্ত বাংলাদেশ উন্মুখ হয়ে থাকে। ক্রিকেটের কারণে বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার বাংলাদেশের মানুষও পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে পারছে। ক্রিকেট একটিসঙ্গে বিজ্ঞাপন-বাণিজ্য ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের জন্য ক্রিকেট আরেকটি সুফল বয়ে এলেছে, তা হলো – পর্যটনের বিকাশ। বিশ্বের নানা দেশ থেকে আগত খেলোয়াড়, ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যবৃন্দ এবং ভক্তবৃন্দ বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং পর্যটন এলাকাসমূহে ভ্রমণ করছে। এতে একদিকে বিশ্বময় বাংলাদেশের পর্যটন-স্থানের নাম ছড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি।

বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তাবোধের বিকাশেও ক্রিকেট খেলা ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খেলা শুরুর আগে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজতে শুল্লে এ দেশীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের সংগ্রাম হয়। তখন নিজের দেশের প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা জাগে। বিশেষভাবে বাংলাদেশের খেলোয়াড়গণ যখন বিশ্বখ্যাত কোনো দলকে পরাজিত করে, তখন যে আনন্দ হয়, তা দেশপ্রেমেরই আনন্দ।

উপসংহার: বাংলাদেশের মানুষ ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে। ক্রিকেটের সঙ্গে এ দেশের কোটি কোটি মানুষের আবেগ জড়িত। তাই বাংলাদেশের বিজয়ে গোটা দেশ যেমন বাঁধভাঙ্গ উল্লাসে ফেটে পড়ে, আবার পরাজয়ে মুশড়ে পড়ে। তবে কোনো পরাজয়েই দেশবাসী খেলোয়াড়দের প্রতি আস্থা হারায় না। তাদের সমর্থন ও উৎসাহ দিয়ে যায়, যাতে পরবর্তী খেলায় খেলোয়াড়ো সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। ক্রিকেটের উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের উচিত নতুন খেলোয়াড় তৈরিতে ভূমিকা রাখা, উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রতি আরো যত্নবান হওয়া এবং ক্রিকেটবাদ্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের ফুটবল

ভূমিকা: ফুটবল বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় খেলা। কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশের গ্রাম, গঞ্জ, শহরে সর্বত্র ফুটবল প্রতিযোগিতা অবৃষ্টি হতো। এর প্রতি মানুষের আগ্রহের মাত্রা বোঝা যায় বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হলে। তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত দেশগুলোর প্রতাক্ত উড়তে দেখা যায়। অনেকের গায়ে দেখা যায় পছন্দের দলের জারি। ফুটবলের প্রতি এ দেশের মানুষের ভালোবাসা ক্রমে এই খেলার প্রতি তাদের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তুলছে।

আধুনিক ফুটবলের ইতিহাস: প্রতি দলে এগারো জন করে দুটি দলে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলতে হয়। একটি বায়ুপূর্ণ চামড়ার বলকে হাত ও বাহু ছাড়া শরীরের যে-কোনো অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের মধ্যে প্রবেশ করাতে হয়। পৃথিবীতে ফুটবল ধরনের বেশ কয়েকটি খেলা প্রচলিত আছে। যেমন, রাগবি অনেকটা ফুটবল খেলার মতো। তবে এখন ফুটবলের যে রূপটি দেখা যায়, তা ১৮৬৩ সালে প্রবর্তিত। মূলত এ সময়ে ইংল্যান্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং তারা ফুটবল খেলার কতগুলো নিয়ম জারি করে। এই নতুন নিয়মের ফুটবল খেলা দ্রুত অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য ইংল্যান্ডকে আধুনিক ফুটবলের জনক বলা হয়। ইংল্যান্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রবর্তিত হওয়ায় ফুটবলের আরেক নাম ‘এসোসিয়েশন ফুটবল’। আমেরিকায় একে বলা হয় ‘সসার’ বা ‘সকার’। এটিকে এসোসিয়েশন শব্দের বিকৃত রূপ বলে মনে করা হয়। রাগবি ফুটবল কেবল রাগবি নামে অধিক পরিচিত হওয়ায় এসোসিয়েশন ফুটবল শুধু ‘ফুটবল’ নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলাদেশে ফুটবল বলতে এসোসিয়েশন ফুটবলকেই বোঝায়।

ফুটবল বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে প্যারিসে গঠিত হয় ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ফিফা)। সংজ্ঞাটি প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বকাপ আসরে শিরোপা অর্জন করে উরুগুয়ে। বর্তমানে ফিফার সদস্য সংখ্যা ২১১।

বাংলাদেশে ফুটবলের যাত্রা: ভারতীয় উপমহাদেশে ফুটবলের আগমন হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। ইংরেজ বণিক, খেলোয়াড় ও সৈনিকরা ফুটবল খেলত। মূলত তাদের মাধ্যমেই উপমহাদেশে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ফুটবল জনপ্রিয় হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ১৯৪৮ সাল থেকে সমগ্র পাকিস্তানে ফুটবলের মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় ‘ঢাকা লিগ’। ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, ঢাকা ওয়াকারার্স ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ারি ক্লাব, আবাহনী ক্লিডাচক্র, শেখ রাসেল ক্লিডাচক্র প্রভৃতি ক্লাব বাংলাদেশে লিগ খেলাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘূর্নের সময়ে বাংলাদেশে ফুটবল একটি নতুন মাত্রায় আবির্ভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বিশ্বকে অবগত করাতে তখন গঠিত হয়েছিল ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’। তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ১৬টি ম্যাচ খেলেছিল।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সালে ঢাকায় ফুটবল লিগ শুরু করে। ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হয় জাতীয় ফুটবল। এক বছর পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল থেকে যুব ফুটবল যাত্রা শুরু করে। ফেডারেশন কাপ শুরু হয় ১৯৮০ সাল থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলো চালু রয়েছে:

১. বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ: এটি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) কর্তৃক আয়োজিত একটি টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ শুরু হয় ২০০৭ সালে।
২. বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স লীগ: এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেণির ফুটবল লিগ। ২০১২ সালে এটি যাত্রা করে।
৩. ফেডারেশন কাপ: এটি বাংলাদেশের প্রিমিয়ার নকআউট প্রতিযোগিতা। ১৯৮০ সাল থেকে এটি আয়োজিত হয়।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন: বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজন, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও পরিচার্যা, জাতীয় দল গঠন ও নিয়ন্ত্রণ তথ্য ফুটবলের যাবতীয় উন্নয়নে কাজ করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। বাফুফে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দল ও বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলকে তত্ত্বাবধান করে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ফুটবল: বাফুফে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এএফসি (এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন), ১৯৭৬ সালে ফিফা (ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনালি ডি ফুটবল আসোসিয়েশন) ও ১৯৯৭ সালে সাফ (সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন) বাংলাদেশকে সদস্য করে। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ১৯৭৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। ১৯৮০ সালে ‘এএফসি এশিয়া কাপ’ টুর্নামেন্টে এবং ১৯৮৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অংশ নেয়। ফুটবলে বাংলাদেশের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয় ২০০৩ সালে। ওই বছরই বাংলাদেশ প্রথম সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া ২০১৯ সালে চাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন গোল্ডকাপ-এ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল কমিটি। বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সদস্য। ২০১০ সালের ২৯শে জানুয়ারি দলটি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন গেমস-এ নেপালের বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে। বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল ২০১০ সালের সাফ ডাইমেস চ্যাম্পিয়নশিপে কর্মবাজারে ভূটানের বিপক্ষে ৯-০ ব্যবধানে এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জয়লাভ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক নারী ফুটবল দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহের ধোবাটড়া উপজেলার কলসিন্দুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের মেয়েরা বড়ো ভূমিকা রাখছে। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মেয়েরা।

ফুটবল খেলার মাঠ: ছানীয় মাঠ ছাড়াও বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উন্নত মানের ফুটবল মাঠ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ও বীর শ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, সিলেট জেলা স্টেডিয়াম, ঘৰোৱের শামসুল হুদা স্টেডিয়াম, রাজশাহী জেলা স্টেডিয়াম, শহিদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়াম, গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়াম, ফেনৌর শহিদ সালাম স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ স্টেডিয়াম উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার: ফুটবল বিশ্বের জনপ্রিয়তম খেলা। বাংলাদেশের অভীড়াসনেও ফুটবলের জনপ্রিয়তা কম নয়। তবে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য জাতীয় ফুটবল দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিয়ে আসতে পারেনি। এক সময়ে ঘরোয়া ফুটবল সারা বাংলাদেশে যে উচ্চাস সৃষ্টি করতে পারতো, তা ও এখন আবেদন হারিয়েছে। বয়সভিত্তিক ফুটবল দলগুলো মাঝে মাঝে যে সাফল্য দেখাচ্ছে, তা আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ফুটবলে গৌরব ফিরিয়ে আনতে দরকার কার্যকর নীতিমালা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায়ও সভাবনাময় খেলোয়াড়ের সক্ষান অব্যাহত রাখা উচিত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান

ভূমিকা: বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উজ্জবল মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে বৈপ্লাবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের নাম প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে আরামদায়ক। কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের জয়বাটা লক্ষণীয়। অসংখ্য কৃষি প্রযুক্তি কৃষিকাজকে করে তুলেছে সহজসাধ্য। অজন্ত উচ্চফলনশীল জাতের ফসল আবিকারের মধ্য দিয়ে কৃষিপণ্যও হয়েছে সহজলভ।

কৃষির অতীত-কথা: কৃষি হলো মানব সভ্যতার আদিম পেশা। জীবন ধারণের তাগিদে আদিম মানুষ থাক্তিকভাবে উৎপন্ন ফলমূল গৃহায় নিয়ে আসতো এবং বনজঙ্গলের পশ্চ-পাথি শিকার করতো। প্রকৃতির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীলতার কারণে প্রায়ই তাদের খাদ্য-সংকটে পড়তে হতো। বছরের কিছু সময়ে তাদের কোনো খাবার জুটত না। ফলে খাদ্যের সক্ষান্তি তাদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আদিম মানুষ এক পর্যায়ে পশ্চপালন ও বীজ বপন করতে শেখে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয় এবং জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিশ্চিত। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লাবিক পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত কৃষিকাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

কৃষি ও বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের অবদানে ধীরে ধীরে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। কৃষিকাজকে সহজ ও কম শ্রমসাধ্য করতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করছেন। ফলে একদিকে যেমন চাষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে, ফসল নির্বাচন ও নতুন নতুন ফসল তৈরির কাজেও অগ্রগতি হচ্ছে। কৃষি-বিজ্ঞানের এসব গবেষণা পৃথিবীকে আজ শস্যে ও ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পৃথিবীর মানুষের জন্য এখন যতটা ফসল দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল পৃথিবীতে ফলাছে। জমিকে উর্বর করতে আবিস্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সার। পুরানো প্রযুক্তির লাঙল-মই প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্রাক্টর। উন্নতিতে হয়েছে উন্নত জাতের বীজ ও উচ্চ ফলশীল ফসলের জাত। এতে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফসল ও বীজ উৎপাদন এবং তা সংরক্ষণেও বিজ্ঞান সহযোগিতা করছে। সেচ ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। পশু-পাখি ও মাছের রোগজনিত মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে কৃষি-চিকিৎসার অগ্রগতির কারণে। এভাবে কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষিকাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে।

উন্নত বিশ্বে কৃষি: উন্নত দেশগুলোর কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন মোয়ার (শস্য ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), প্রেশিং মেশিন (মাড়াই যন্ত্র), ফিড গ্রাইন্ডার (পেষক যন্ত্র), মানিউল স্লেডার (সার বিস্তারণ যন্ত্র), মিক্সার (বৈদ্যুতিক দোহন যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে ট্রাক্টরের মাধ্যমে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ করা সম্ভব হয়। একই ট্রাক্টরের আবার একসঙ্গে ফসল কাটার যন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশও কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছে।

কৃষি ও বাংলাদেশ: কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৮ শতাংশ আসে কৃষি থেকে এবং রঞ্জনি বাণিজ্যের প্রায় ১৪ শতাংশ আসে কৃষিজাত দ্রব্য রঞ্জনি থেকে। এছাড়া কর্মসংঘান ও শিল্পের ভিত্তি হিসেবেও বাংলাদেশে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু কৃষিকাজের জন্য খুবই অনুকূল। এদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক জল-ভাগীর। আধুনিক প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলোর মাটির অনুরূপতাকে এবং পানির দুর্ভিতাকে যেভাবে দূর করেছে, তাতে আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি সুবিধা নিয়ে আসবে, তা আভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। ফলে বন্যা, খরা, জলোচ্ছাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্বোগে এখানে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়, আবার অনেক সময়ে প্রত্যাশার তুলনায় কম ফসল ফলে। কৃষকের কাছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৃষি-বিজ্ঞানের জ্ঞান সঠিকভাবে পৌছে না দিতে পারাই এর প্রধান কারণ। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব বাধা দূর করা যায় এবং উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশকেও খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায়।

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা: কৃষির উন্নতির উপরেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তি বিদ্যাক গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইতিমধ্যে বহু নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ফসল উদ্ভাবন করেছে, বহু কৃষিবান্ধব প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে এবং বহু ধরনের কৃষিপণ্যকে বাজারজাত করণের ব্যাপারে নতুন নতুন কৌশল বের করেছে। অর্থাৎ কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ কোনোভাবে পিছিয়ে নেই। তবে এখন প্রয়োজন এসব উদ্ভাবনকে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করে তোলা এবং কৃষককে এসব উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। শিক্ষিত জনবলকে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারলে এবং কৃষিকাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে পারলে এই কাজ অনেকটা সহজ হয়। তাতে আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ দণ্ডের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কৃষকদেরকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

উৎপাদন্ত্বার: কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতি দিন দিন মজবুত হচ্ছে। বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে টেকসই করতে প্রয়োজন কৃষি সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহজলভ্য করা। এছাড়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্ঘোগে যাতে ফসলহানির আশঙ্কা তৈরি না হয় অথবা উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যান্য শাখাকেও কৃষির স্থার্থে এগিয়ে আসা দরকার। তবে সবার আগে দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিপেশায় আকৃষ্ট করা এবং শিক্ষিত জনশক্তিকে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত করা। কেননা শিক্ষিত জনশক্তি কৃষিকাজে এগিয়ে এলে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তির সর্বোন্ম ব্যবহার সম্ভব হবে। এজন্য সরকারের উচিত কৃষিপেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, বিশেষভাবে কৃষিকাজে সফল হওয়া ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা ও সম্মানিত করা। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাঢ়বে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোক কৃষিপেশায় আকৃষ্ট হবে। কৃষিকাজের সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্পর্ক মজবুত করতে এমন পরিবেশই জরুরি।

মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার

ভূমিকা: বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি এক ভয়বাহ বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। অপার সন্তাননাময় তরঙ্গ সমাজের জন্য মাদকাসক্তি এখন এক মরণফান্দ। এই ঘাতক ব্যাধিতে আসক্ত হবার ফলে সমাজ হচ্ছে কল্পিত এবং দেশ, জাতি ও পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক পরিণতি। তাই একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য, আলোকিত আগামীর জন্য মাদকাসক্তির মতো মরণথাবা থেকে তরঙ্গ ও যুব সমাজকে রক্ষা করা একটি অবশ্যিক বিষয়।

মাদক ও মাদকাসঙ্গি: মাদকদ্রব্য হলো প্রাকৃতিকভাবে অথবা রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন পদার্থ যা নেশা তৈরি করে। এসব পদার্থ যারা সেবন করে তাদেরকে মাদকাসঙ্গ বলা হয়। মাদক সেবনের উৎ আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় মাদকাসঙ্গি। মাদকাসঙ্গ এমন এক নেশা যাতে একবার জড়িয়ে পড়লে, তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। এর পরিণতি অকালমৃত্যু। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য রয়েছে। কিছু কিছু মাদকদ্রব্য ব্যাথানাশক ও চেতনানাশক হিসেবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মাদকই নেশাকারী পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিগারেট, মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন, কোকেন, চরস, পপি, মারিজুয়ানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মাদক। এগুলোর বেচা-কেনা বাংলাদেশে অবৈধ। তা সত্ত্বেও গোপনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর কেনা-বেচা চলে। তরুণ সমাজের বड়ো একটি অংশ এসব মাদক গ্রহণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ধৰ্ম করার খেলায় মেতে ওঠে।

মাদকের উৎস: মাদকের উৎস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদক উৎপাদিত হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি অসাধু মূল্যায়নলোভী বিশাল চক্র। মাদকের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, চোরাচালানও হয় অনেক দেশে। থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস (গোড়েন ট্রায়াঙ্গেল), আফগানিস্তান-ইরান-পাকিস্তান (গোড়েন ত্রিসেন্ট) মাদক চোরাচালানের প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। মাদকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো আফিম। পপি নামক উচ্চিদ থেকে আফিম তৈরি হয়। আফিম থেকে তৈরি হয় 'মরফিন বেস'। মরফিন বেস থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হেরোইন। ব্রাজিল, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডোর প্রান্তি দেশে মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের বড়ো একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মাদকাসঙ্গির কারণ: জীবনের হতাশা ও দুঃখবোধ থেকে সাময়িক স্বষ্টি লাভের আশায় মানুষ প্রথমবার মাদক গ্রহণ করতে অগ্রহী হয়। অনেকে অন্যের প্ররোচনায় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। অনেকে কৌতৃহলবশতও প্রথমবার মাদক গ্রহণ করে থাকে। তবে যেভাবেই হোক, কেউ একবার মাদক গ্রহণ করলে সেই আসঙ্গি থেকে বের হওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়। সেই সুযোগে বিপথগামী কিছু মানুষ এবং বহুজাতিক মাদক সংস্থাগুলো অবৈধ অর্থের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

পাশ্চাত্যের মাদক উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে ব্যবসা করতে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। করিডোর হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য অনেকটা সহজলভ্য। এই সুযোগে কিছু অসাধু লোক এখানেও একটি মাদকের বাজার সৃষ্টি করেছে। এইসব খারাপ লোকের চেষ্টায় বর্তমান বাংলাদেশে মাদকাসঙ্গ লোকের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে।

মাদকাসক্তির কুফল: মাদকে আসক্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, ক্ষুধা-ত্বষ্ণার অনুভূতি করে যায়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, দেহের ওজন কমাতে থাকে, হাসি-কান্নার বোধ ও বিচারবুদ্ধি থাকে না; এক পর্যায়ে সে জীবন্ত অবস্থায় পৌছে যায়। মাদকের মূল্য বেশি হওয়ায় খুব অল্প দিনেই মাদকাসক্তির সংখিত অর্থ ফুরিয়ে যায়। তখন তারা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ক্রমে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা এভাবে নিজেদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের সুস্থিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এদের নৈতিক অধঃপতন সমাজের অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে গোটা সমাজেই পচন ধরতে শুরু করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক ও দাস্ত্য কলাহের কারণ হয়। অশান্তির জের ধরে বহু মাদকাসক্ত এক পর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পরিবার ও সমাজের জন্য সেই ক্ষতি অপূরণীয়। এছাড়া সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো, মাদকাসক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী লোক বেশি। অথচ দেশের উচ্চয়নমূলক কাজের জন্য এই বয়সী লোক সবচেয়ে উপযুক্ত। আবার এই বয়সের নারী-পুরুষ মাদকাসক্ত হওয়ার অর্থ হলো, একদিকে দেশের উচ্চয়নকে বাধাইত্ব করা, অন্যদিকে সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অঙ্গুরে বিনষ্ট করা।

মাদকাসক্তির প্রতিকার: মাদকাসক্তির সর্বনাশা প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সকলেই ভাবছেন, কেমন করে এর করাল গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়। ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করছে। বাংলাদেশও মাদকবিরোধী একাধিক সংগঠন কাজ করছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে মাদক গ্রহণ ও বিত্তার প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা লক্ষ করা যায়। সরকারের সমাজসেবা কর্মসূচিতে মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু আছে এবং এদেরকে বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাদকের হাত থেকে দেশের যুবসমাজকে বাঁচাতে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো প্রচুর কর্মসংহারণ সৃষ্টি করা এবং সেখানে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা। অন্তত বেকারদের হতাশা থেকে যেসব মাদকাসক্তির ঘটনা ঘটে, এর ফলে তা দূর হবে। তবে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানকে নির্মূল করা। এজন্য দরকার দৃষ্টান্তমূলক শান্তির ব্যবস্থা রেখে কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং তা প্রয়োগ করে দেখানো।

উপসংহার: মাদকাসক্তির কারণে সমাজের কোনো এক জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি হলে, সেই অশান্তি গোটা সমাজকে গ্রাস করতে পারে। তাই মাদকাসক্তিকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় মনে করলে চলবে না। যে তরুণ সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ, তারা যদি সুস্থিতার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়, তাহলেই তারা সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে, অন্যথায় নয়। তাই মাদকের করালগ্রাস থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ভূমিকা: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে এমন কিছু দুষ্টিনা বা বিপর্যয়কে বোঝায়, যা প্রকৃতির স্থানাবিক নিয়মে ঘটে এবং যার পিছনে মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের নিয়সন্তো। প্রতি বছর এখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, যার মধ্যে আছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিবাড়, জলচাপ্পাস, নদীভাঙ্গ, ভূমিষস, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা হচ্ছে।

বন্যা: বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি চলের কারণে নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলোতে মানুষের স্থানাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং ফসলের ক্ষতি হয়। বন্যার ফলে জনপদের ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নষ্ট হয়। বহু গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায়। ১৯৫৫ ও ১৯৬৪ সালের বন্যায় বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৭০ ও ১৯৭৪ সালের বন্যার বিভীষিকাও মানুষের মনে দাগ কেটে আছে। ১৯৮৮ সালের বন্যা রাজধানী ঢাকাসহ পুরো দেশের মানুষকে বন্দী করে দেয়। ১৯৯৮ সালের বন্যাও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। এ সময়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় পাঁচ মাস পানিবন্দী জীবন যাপন করেছে লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষ। ২০০১, ২০০২ ও ২০০৭ সালের বন্যাতেও মানুষ, গবাদিপশু ও ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিবাড় ও জলচাপ্পাস: বছরের প্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে বাংলাদেশে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের ঘূর্ণিবাড় আঘাত হানে। ঘূর্ণিবাড়ে বাতাসের তীব্রতা থাকে খুব বেশি। এর ফলে কখনো কখনো সমুদ্রে জলচাপ্পাসের সৃষ্টি হয়। এ-ধরনের দুর্যোগ প্রায় প্রতিবছরই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নেয়াখালী, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি উপকূলবর্তী এলাকায় ও দ্বীপসমূহে আঘাত হানে। এর নিষ্ঠুর আঘাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আশ্রয়হীন হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিপন্ন হয় মানুষ, নিসর্গ, ও জীববৈচিত্র্য; বিপর্যস্ত হয় লোকালয়। মানুষ পতিত হয় অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায়। লবণাক্ততার জন্য প্রাবিত এলাকার ভূমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফসলের ক্ষয়ক্ষতির কারণে কৃষি-উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৭০ সালে মেঘনা নদীর মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিবাড় ও জলচাপ্পাসে প্রায় তিনি লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচও ঘূর্ণিবাড় ও জলচাপ্পাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিবাড় ‘সিন্ডু’। ২০০৯ সালের ঘূর্ণিবাড় ‘আইলা’ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন এই দুই ঘূর্ণিবাড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ঘূর্ণিবাড়ের প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরেও অগ্রণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়।

খরা: দেশের উত্তরাঞ্চলে খরা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অনাবৃষ্টি এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফসলের ক্ষেত্র, এমনকি গাছপালাও পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। বরেন্দ্র বহুমুখী উদ্যান প্রকল্প গ্রহণ করার পরে রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের কিছু অঞ্চলে খরাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনো উত্তরাঞ্চলের বহু জেলায় খরা পরিষ্ঠিতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষ্ফ করে তোলে। অত্যধিক তাপদাহে নানা রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে মানুষের ও পশুপাখির কষ্ট হয়।

নদী-ভাঙ্গন: নদীমাত্রক বাংলাদেশের বুকে ছোটো-বড়ো বহু নদী প্রবহমান। নদীর ধর্মই হলো এক কূল ভাঙা আর অন্য কূল গড়া। নদীর এই ভাঙা-গড়ার খেলায় এ দেশের কত মানুষকে যে বাস্তুচ্যুত হতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। নদীর তীরে বাস-করা মানুষের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্প্রদায় নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই দুর্যোগের কবলে পড়ে মানুষ উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করে এবং কিছু কালের জন্য হলেও হয়ে পড়ে ঠিকানাবিহীন।

ভূমিধস ও ভূমিক্ষয়: ভূমিধস বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট প্রভৃতি পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ের গায়ে অপরিকল্পিতভাবে গৃহ নির্মাণের কারণে ভূমিধসে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। প্রবল বায়ুপ্রবাহ, অধিক বৃষ্টিপাত, নির্বিচারে পাহাড় কাটা ভূমিধসের মূল কারণ। এই ধরনের আর একটি দুর্যোগের নাম ভূমিক্ষয়। ভূমিক্ষয়ের কারণে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি হয় না বটে, তবে তা দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের ক্ষতির কারণ হয়। ভূমিক্ষয়ের মূল কারণ অপরিকল্পিতভাবে বনের গাছ কেটে ফেলা। মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচায় গাছ; এই গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রবল বর্ষণে মাটির উপরের স্তর ক্ষয়ে যায়। এতে ভূমির উচ্চতাই শুধু কমে, তাই নয়, জমির উর্বরতাও নষ্ট হয়।

ভূমিকম্প: অন্যান্য দুর্যোগের মতো ভূমিকম্পও বাংলাদেশে মাঝে মাঝে আঘাত হানে। ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়ে গেলে ঘরবাড়ি, রাস্তাধাট ভেঙে পড়ে। তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। গত একশো বছরে বাংলাদেশে মারাত্মক কোনো ভূমিকম্প হয়নি। তবে অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে যে কোনো সাধারণ ভূমিকম্পেও ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বড়ো বড়ো শহর মারাত্মক ক্ষতির মুখ্যমুখ্য হতে পারে।

দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রতিকার: দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার সব সময়েই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যৱে নামে সরকারের একটি সংস্থা রয়েছে। প্রচার মাধ্যমগুলোও দুর্যোগকালের পূর্বপ্রস্তুতি ও সম্ভাব্য মোকাবিলার বিষয়টি দেশের প্রাচীক পর্যায় পর্যন্ত প্রচারের ব্যবস্থা করে। দুর্যোগের আগে ও পরে সরকারের সবগুলো সংস্থা সতর্ক থাকে, যাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথাসাধ্য কমিয়ে রাখা যায়।

উপসংহার: এক সময়ে মানুষ প্রকৃতির খোলালখুশির উপর নিজেদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো। কিন্তু মানুষ এখন ক্রমাগামী প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ভূমিকম্পের আগামবার্তা এখনে আবিষ্কার করা সম্ভব না হলেও ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে মানুষ এখন ঘূর্ণিঝড়, জলচ্ছাসের মতো দুর্ঘটনার আগাম খবর পায়। অচিরে হয়তো ভূমিকম্পের আগাম বার্তাও পেয়ে যাবে। হয়তো সেদিন আর দূরে নয়, যখন প্রকৃতির ঘাবতীয় দুর্ঘটনাকে মানুষ তার প্রযুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

বিশ্বকোষ

ভূমিকা: বিশ্বকোষ হলো কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থালাল, যেখানে জ্ঞানের সকল শাখার নানাবিধি বিষয়ে লেখা সংকলিত থাকে। লেখাগুলো নিবন্ধ আকারে সংক্ষিপ্ত ভাষার বর্ণনাক্রমে কিংবা বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত থাকে। পৃথিবীর সকল জ্ঞানশাখা বা শৃঙ্খলার বিষয়াবলি এতে ছান পায়। তবে এমন বিশ্বকোষও রয়েছে যাতে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখার বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত নিবন্ধ সজ্জিত থাকে। যেমন – আইনকোষ, অর্থনীতিকোষ ইত্যাদি। বাংলায় বিশ্বকোষ শব্দটি ইংরেজি 'энসাইক্লোপিডিয়া' শব্দের প্রতিশব্দ। একটি বিশ্বকোষ সংকলনে যুক্ত থাকেন নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের রচিত নিবন্ধগুলো তাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। বিশ্বকোষে সংকলিত নিবন্ধগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও সেগুলো একেকটি বিষয়ের উপর গভীর ধারণা দেয়। বর্তমানে বিশ্বকোষের মুদ্রিত রূপ ছাড়াও কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য রূপও পাওয়া যায়।

বিশ্বকোষের বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি বিশ্বকোষের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অথবত, বিশ্বকোষের ভূক্তিগুলো সুবিল্পস্ত হতে হয়, যাতে পাঠক দ্রুত এবং অল্প আয়াসে কোনো বিষয়ের তথ্য খুঁজে পায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় সংজ্ঞাবেশের কারণে এটি আবাসনে বৃহৎ হয়ে থাকে। কখনো অনেকগুলো খণ্ডে প্রকশিত হয়। তৃতীয়ত, বিশ্বকোষের তথ্যাদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কারণ, নির্ভরযোগ্যতা বিশ্বকোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। চতুর্থত, পরিবর্তিত তথ্যের আলোকে বিশ্বকোষকে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হয়। তাই বিশ্বকোষের কাজকে কখনো সমাপ্ত বলে ভাবা যায় না।

বিশ্বকোষের প্রকারভেদ: বেশ কয়েক রকমের বিশ্বকোষ দেখা যায়। বিষয়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে বিশ্বকোষ দুই ধরনের: ১. সাধারণ বিশ্বকোষ। ২. বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ। প্রকাশের মাধ্যম বিবেচনায় বিশ্বকোষ দুই ধরনের: ১. মুদ্রিত ও ২. ডিজিটাল। প্রতিষ্ঠানের অধীনে নির্ধারিত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ছাড়াও এক ধরনের বিশ্বকোষ রয়েছে যা ব্রেচচাসেবী লেখকরা সংকলন করেন। নিচে কয়েক ধরনের বিশ্বকোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

- ক. সাধারণ বিশ্বকোষ: এ ধরনের বিশ্বকোষে বিষয়ের ব্যাপকতা দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এই বিশ্বকোষের ভূমিতে কাজ করেন। তাঁদের লেখা নাতিদীর্ঘ নিবন্ধের মাধ্যমে একেকটি বিষয়ের আলোচনা বা তথ্য তুলে ধরা হয়। ‘এনসাইক্লোপিডিয়া বিটানিক’ এ ধরনের বিশ্বকোষ।
- খ. বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণ বিশ্বকোষে প্রদত্ত বর্ণনা ছাড়াও আরো গভীর ধারণা পেতে বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ ব্যবহার করতে হয়। বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষগুলো কেবল ওই বিষয়সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। ‘আইনকোষ’, ‘এনসাইক্লোপিডিয়া অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকস’ এ ধরনের বিশ্বকোষ।
- গ. বৈদ্যুতিন বিশ্বকোষ বা ডিজিটাল বিশ্বকোষ: প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে অনেকেই মুদ্রিত বিশ্বকোষের পরিবর্তে কম্পিউটার বা মুঠোফোনে বিশ্বকোষ ব্যবহার করছে। এগুলোকে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল বিশ্বকোষ বলা হয়। এ ধরনের বিশ্বকোষ হালনাগাদ রাখা সহজ।
- ঘ. ষেচ্ছাসেবী লেখকদের বিশ্বকোষ: ইনটারনেটে কিছু বিশ্বকোষ রয়েছে যা ষেচ্ছাশ্রমে সংকলিত হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্ত হতে ষেচ্ছাসেবী লেখকগণ অনলাইনে বিশ্বকোষকে সমৃদ্ধ করেন। ‘উইকিপিডিয়া’ এ ধরনের বিশ্বকোষ।

বিশ্বকোষের ভূমি: বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলোকে বলা হয় ভূমি। অভিধানের চেয়ে বিশ্বকোষের ভূমি আলাদা হয়ে থাকে। সাধারণ অভিধানে একটি শব্দের ব্যৃত্পত্তি, উচ্চারণ, সংজ্ঞা, বাক্যে প্রয়োগ ইত্যাদি থাকে। কিন্তু বিশ্বকোষের ভূমিগুলো হয় দীর্ঘ। বর্ণনা এবং ভাবগত বিবেচনায় এর ব্যাপ্তি অভিধানের চেয়ে বেশি। বিষয়ের শিরোনাম সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে রচিত নিবন্ধই বিশ্বকোষের ভূমি। ভূমির মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী মানচিত্র, সারণি, ছবি, পরিসংখ্যান কিংবা গ্রহণশীল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অধিকাংশ বিশ্বকোষে ভূমি রচয়িতার নাম ভূমির নিচে সংযুক্ত থাকে।

ভূমির মধ্যে কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। এর অর্থ, এই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে আলাদা ভূমি রয়েছে। পাঠক প্রয়োজনে সেসব ভূমি পাঠ করে নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারেন। অনলাইন বিশ্বকোষে এগুলো আলাদা রঙের হয় এবং তাতে ক্লিক করলে সেই বিষয়ের আলোচনা সামনে চলে আসে।

পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু বিশ্বকোষ: আয় দুই হাজার বছর ধরে বিশ্বকোষের চর্চা হচ্ছে। তবে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন ফরাসি পণ্ডিত Encyclopedia নামে গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন। পৃথিবীময় যে জ্ঞান রয়েছে তা সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করে সমকালীন পাঠক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌছে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এর পর ১৭৬৮-১৭৭১ সালে ইংরেজি বিশ্বকোষ ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’ প্রকাশিত হয়। এটি এখন ৩২ খণ্ডের মুদ্রিত বইয়ে এবং অনলাইনে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া ‘এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা’, ‘কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া’, ‘চেম্পার্স এনসাইক্লোপিডিয়া’, ‘অ্যারিম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া’ ইত্যাদি বিশ্বকোষ অনুসন্ধানী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ: বাংলা ভাষায় জ্ঞানকোষ রচনার প্রথম পদক্ষেপ মেন উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিপ্প কেরি। তিনি ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’ অবলম্বনে ‘বিদ্যাহারাবলী’ নামক জ্ঞানকোষ রচনার কাজ শুরু করেন। তবে বাংলা ভাষায় যথৰ্থ বিশ্বকোষ হলো নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ‘বিশ্বকোষ’। এর প্রথম খণ্ড সংকলন করেন রঞ্জলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ড থেকে ২২তম খণ্ড পর্যন্ত সংকলন করেন নগেন্দ্রনাথ বসু। এই বিশ্বকোষের কাজ শুরু হয় ১৮৮৬ সালে এবং শেষ হয় ১৯১১ সালে। এছাড়া ‘ভারতকোষ’ বাংলা ভাষায় সংকলিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষ। এটি ১৮৮১ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে রাজকৃত্ব রায় ও শরচন্দ্র দেব কর্তৃক সংকলিত হয়।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ’-এর নাম উল্লেখযোগ্য। আয়তন, ভুক্তিসমূহের বিন্যাস ও ব্যবহার-যোগ্যতার বিবেচনায় এটি একটি সফল প্রয়াস বলা যায়। নওরোজ কিতাবিস্তার ও মুক্তধারা প্রকাশিত চার খণ্ডে সংকলিত ‘বাংলা বিশ্বকোষ’ (১৯৭২ থেকে ১৯৭৪) একটি সুপরিকল্পিত বিশ্বকোষ, যদিও এটি ‘কলাচিয়া ভাইকিং ডেক্স এনসাইক্লোপিডিয়া’ অবলম্বনে রচিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আরো কিছু বাংলা কোষগুহ্য প্রকাশিত হয়েছে। তবে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ‘বাংলাপিডিয়া’ বাংলাদেশে বিশ্বকোষ চর্চায় এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ। ‘বাংলাপিডিয়া’ বর্তমানে ১৪ খণ্ডে পাওয়া যায়। এর কম্পিউটারে ব্যবহারের সংক্রমণ এবং অনলাইন সংস্করণও রয়েছে।

উপসংহার: বিশ্বের সব শৃঙ্খলার ধারণাসমূহ কোনো ব্যক্তির একার পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়। এমনকি একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখার সব বিষয়ও কারো একার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের লক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে এক জায়গায় বিন্যস্ত করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া বিশ্বকোষের প্রধান লক্ষ্য। কোষগুহ্যসমূহের মধ্যে বিশ্বকোষ শুধু আরাতনেই বড়ো নয়, জ্ঞানচর্চার এক বিপুল ভাণ্ডারও বটে। তাই প্রতিটি ভাষায় বিশ্বকোষ ধাকা জরুরি।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল নবম ও দশম : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

কারও মনে কষ্ট দিও না।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।